অনুসন্ধান

বিবিধ প্রবন্ধ

প্রথম খণ্ড

মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির সম্পাদক

শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ বি, এল্, কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

এজেণ্টস্

চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং

১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মূল্য ১৲

ইণ্ডিয়া প্রেস।

২৪ নং মিডিল রোড, ইটালি, কলিকাতা।

শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু দ্বারা মুদ্রিত।

নিবেদন

অনুসন্ধান' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহার মধ্যে যে কল প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহার সকল গুলিই পূর্ব্বে মাসিক পত্রে কাশিত হইয়াছিল। সূচী পত্রে পত্রিকাগুলির নাম উল্লিখিত হইল।

প্রবন্ধলেখকগণের মধ্যে অনেকেই বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। তবে কয়েক জনের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামবাসী। সংস্কৃত ও পালি সাহিত্য এবং বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে তাঁহার পাণ্ডিত্য ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতি তাহার সহায়তা পাইয়া গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সরকার ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত মহাশয়-গণ মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির শিক্ষাবিস্তার ও সাহিত্যপ্রচার বিষয়ক কর্ম্মে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ইহাঁরা আমেরিকার দুইটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে (Harvard University, এবং Wiscon-sin University) অধ্যয়ন করিতেছেন; এবং বিদ্যানুরাগ ও অধ্যবসায় দেখাইয়া সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ ও অধ্যাপকগণের প্রশংসালাভ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ লাহিড়ী মহাশয় একজন সুকবি। মাসিক পত্রিকা সমূহে তাঁহার কবিতা প্রায়ই প্রকাশিত হয়। বিবিধ প্রবন্ধ রচনা দ্বারাও ইনি বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়াছেন, এবং কিছুকাল হইতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমালোচনা কার্য্যে প্রবৃত্ত আছেন। এই প্রয়াসের ফল বাঙ্গালা ভাষায় শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে আশা করা যাইতে পারে।

৺ ত্রৈলোক্যনাথ সেন গুপ্ত মহাশয় মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতি অবৈতনিক কর্ম্মচারী ছিলেন। ইহাঁর চরিত্রবত্তা ও পরিশ্রমের গুণে ছাত্রদিগের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষা বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। ইহাঁর অকাল মৃত্যুতে আমরা সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। বাঙ্গালাদেশও ইহাঁর ন্যায় স্বার্থত্যাগী যুবক হারাইয়া কথঞ্চিৎ দরিদ্র হইল।

আষাঢ়, ১৩১৯ — শ্রীবিপিন বিহারী ঘোষ
সম্পাদক, জাতীয় শিক্ষাসমিতি, মালদহ

সূচীপত্র

প্রবন্ধ	লেখক	পত্রিকা	পৃষ্ঠা
ভারতীয় নাস্তিকদর্শনের ইতিবৃত্ত ...	বিধুশেখর ...	বঙ্গদর্শন	১—৪৯
মীমাংসাদর্শনে ঈশ্বরবাদ	ঐ ...	ঐ	৫০—৬৮
কার্য্যকরী শিক্ষা ...	বিজয়কুমার ...	ভারতী	৬৯—৭৬
প্রাচীন গ্রীসে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চ্চা ...	বীরেন্দ্রনাথ ...	ঐতিহাসিক চিত্র	৭৭—৯৫
জনশ্রুতি সংগ্রহ ...	বিপিনবিহারী	সাহিত্য	৯৬—১০০
কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের উদ্দেশ্য ...	কুমুদনাথ ...	নব্যভারত	১০১—১১৩
মালদহের শিল্প-ইতিহাসের উপাদান ...	৺রাধেশচন্দ্র ...	,,	১১৪—১৪০
গৌড়ীয় নৌশিল্প ...	হরিদাস ...	সাহিত্য	১৪১—১৬৪
রসায়নবিজ্ঞানের ইতিহাস ...	৺ত্রৈলোক্যনাথ	প্রতিভা	১৬৫—১৮০
অন্ন-সংস্থান ...	রাধাকুমুদ ...	ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন	১৮১—১৯৭
সাহিত্যসেবী ...	বিনয়কুমার ...	প্রবাসী	১৯৮—২১৪

ভারতীয় নাস্তিকদর্শনের ইতিবৃত্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাস্তিকপর্য্যায় শব্দের আলোচনা

আলোক ও অন্ধকার পাশাপাশি; একটি থাকিলে অপরটি থাকিবেই থাকিবে। ইহারা পরস্পর পরস্পরের প্রকাশ করিয়া থাকে; অন্ধকার না থাকিলে আলোক প্রকাশ পাইত না, এবং আলোক আছে বলিয়াই আমরা অন্ধকার অনুভব করিয়া থাকি। আস্তিক-নাস্তিকও এইরূপ; যে দেশে আস্তিক-মতের সদ্ভাব আছে, নাস্তিক-মতেরও সেখানে অসদ্ভাব নাই। সর্ব্বদেশেই এবং সর্ব্বকালেই ইহার অন্যথা হয় নাই। আস্তিক-নাস্তিক এই শব্দ দুইটি না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার দ্বারা আমরা যাহা বুঝি, তাহার অসদ্ভাব কখনই ছিল না। মানবের বিচিত্র চিন্তাশক্তির প্রভাবই এইরূপ।

ভারতবর্ষে কিরূপে কোন সময়ে নাস্তিকবাদ উৎপন্ন হইয়া ক্রমশ বিস্তার লাভ করিয়াছে, আজ আমরা তাহাই আলোচনা করিয়া দেখিব। এ সম্বন্ধে অন্যান্য অংশ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে দেখা যাউক মূল নাস্তিক শব্দটি কি অর্থ প্রকাশ করিতেছে।[১]

১। অতি প্রাচীন বৈদিকসাহিত্যে নাস্তিক-পদের প্রয়োগ দেখিতে পাই নাই। মৈত্র্যুপনিষদে (৩.৫) আছে—"অথান্যত্রাপ্যুক্তং সম্মোহো ভয়ং···নাস্তিক্যমজ্ঞানং··· তামসানি।" এই উপনিষৎখানি অনতিপ্রাচীন, ইহাতে ঈশা, প্রশ্ন, কঠ, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, অমৃতবিন্দু ও মনুসংহিতার শ্লোক উদ্ধৃত আছে। ভাষার রচনাও ইহার প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করে না। মুক্তিকোপনিষদে (১.৪৮) নাস্তিক-শব্দ আছে, কিন্তু তৎসম্বন্ধেও ঐ কথা।

পাণিনি বলিয়াছেন :—"অস্তি" ("আছে") এই মতি যাহার, সে আ স্তি ক; এবং "নাস্তি" ("নাই") এই মতি যাহার সে না স্তি ক।[২]

নাস্তিক

কিন্তু ইহাতে কিছু পরিষ্কার হইল না; কি আছে-বা কি নাই-বুদ্ধি থাকিলে আস্তিক বা নাস্তিক জানা যাইবে? এজন্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন— যে-কোন বুদ্ধি থাকিলে, আস্তিক বা নাস্তিক বলা চলে না। তবে কি? পরলোক আছে,—এই বুদ্ধি যাহার, সে আস্তিক; এবং পরলোক নাই,—এই বুদ্ধি যাহার, সে নাস্তিক।[৩]

অতএব পাণিনিসম্প্রদায়কে অবলম্বন করিলে ইহাই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, যে পরলোক স্বীকার করে না, সেই নাস্তিক।

মনু বলেন—যে বেদের নিন্দা করে, সেই নাস্তিক।[৪] কেহ কেহ বলেন—যে ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করে না, সেই নাস্তিক। আবার কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত মতের কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিয়া, বা কিঞ্চিৎ যোগ করিয়া বলিয়া থাকেন—পরলোক নাই, পরলোকের সাধন অদৃষ্ট নাই, বা তাহার সাক্ষী ঈশ্বর নাই,—ইহা যাহার বুদ্ধি, সেই নাস্তিক।

বৈদিক কালের প্রথমাবস্থায় কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান প্রবলবেগে চলিতেছিল। যাগযজ্ঞের অধিকাংশই পরলোকে ফলপ্রসব করে বলিয়া ইহলোকে সাধারণ দৃষ্টিতে তাহার ফল দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব সেই

২। "অস্তিনাস্তিদিষ্টং মতিঃ।" পাণিনি, ৪.৪.৬০।

৩। "ন চ মতিসত্তামাত্রে প্রত্যয় ইষ্যতে। কিং তর্হি? পরলোকোঽস্তীতি যস্য মতিরস্তি স আস্তিকঃ। তদ্বিপরীতো নাস্তিকঃ। ...তদেতদভিধানশক্তিস্বভাবাল্লভ্যতে।" —কাশিকা, ৪.৪.৬০।

৪। "যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্ দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥" মনু, ২.১১।

মনুসংহিতায় ৩.১৫০, ৮.২২, ৩০৯ প্রভৃতি বহুস্থানে নাস্তিক-শব্দের উল্লেখ আছে।

সময়ে সামাজিকগণের পরলোকের উপর বিশ্বাস স্থাপন নিতান্তই আবশ্যক ছিল। পরলোকে দৃঢ়বিশ্বাস না থাকিলে পারলৌকিকফলপ্রদ কর্ম্মসমূহে কাহারো প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। কালক্রমে বহু-বহু কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলেও ইহলোকে বস্তুত তাহার কোন ফলপ্রাপ্তি প্রকাশ না পাওয়ায় যে সকল লোকের কর্ম্মবিধির উপর শ্রদ্ধার হ্রাস হইতে লাগিল, তাহাদের সম্বন্ধে ইহা খুবই সম্ভব যে, কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তিস্থান পরলোকেও (যাহা এ জন্মে কখনো দেখিতে পাওয়া যায় না) ক্রমশ তাহাদের শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়া থাকিবে। লোক কোন বহুল-আয়াস-সাধ্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া বর্ত্তমান সংসারেই তাহার ফল দর্শন করিবার জন্য সাধারণত উৎসুক হইয়া উঠে। কিন্তু সাধারণত বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানে তাহার কোন আশা নাই। কর্ম্মফল দেখিবার জন্য কেহ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলে, কর্ম্মবিধিশ্রদ্ধালুগণ পরলোকের উল্লেখ করিয়া কর্ম্মের প্রামাণ্য রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন; পরলোক ছাড়িয়া দিলে কর্ম্মবিধির কোন সার্থক্যই থাকে না। যখন এইরূপে কর্ম্মশ্রদ্ধালু একদল পরলোকের দোহাই দিয়া কর্ম্মবিধিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াস করিতেন, তখন কর্ম্মবিধির ইহলোকে ফল-দর্শনের অভাব হেতু আর একদল পূর্ব্বদলের মতখণ্ডনের জন্য পরলোক-কেই অস্বীকার করিয়া ফেলেন।[৫] পরলোকের অস্তিত্বপ্রতিপাদনের প্রধান অস্ত্র বেদ বা মন্ত্রসমূহ; কালক্রমে পরবর্ত্তী দল ইহাকেও অপ্রমাণ বলিয়া ঘোষণা করেন। না স্তি ক বা দে র সূ চ না পরিচ্ছেদে এ বিষয় আরো বিশেষরূপে আলোচিত হইবে।

৫। ইহা সমর্থনের জন্য মীমাংসাদর্শনের (১.১.৫) শবরস্বামীর ভাষ্য হইতে এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। শব্দের (বেদের) অপ্রামাণ্যবাদী বলিতেছেন :—

"প্রত্যক্ষাদি আর-আর প্রমাণ হয় হউক, কিন্তু শব্দ প্রমাণ নহে। কেন?...যে উপলব্ধিবিষয়ের উপলব্ধি হয় না তাহা নাই, যেমন শশবিষাণ। ইন্দ্রিয়সমূহ পশু-

অতএব নাস্তিকের লক্ষণসম্বন্ধে মনু ও পাণিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা উভয়ই সঙ্গত বোধ হয়।[৬]

কিন্তু পরবর্ত্তী হিন্দু দার্শনিকগণ মনুর মতকেই বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন দেখা যায়; বেদের অপ্রামাণ্যবাদীকেই তাঁহারা নাস্তিক বলেন। এইজন্য পরলোক স্বীকার করিলেও বৌদ্ধগণকে হিন্দু দার্শনিকেরা নাস্তিকশ্রেণীতে স্থান দিয়াছেন। বৌদ্ধদর্শন যদি নামমাত্র বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিত, তবে তাহাকে আমরা আস্তিকসমাজে দেখিতে পাইতাম, এবং তাহার প্রভাব আরো অধিকতর ভাবে চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইত। ঈশ্বরের অভাববাদী নাস্তিক,—নাস্তিকের এ লক্ষণও নিতান্ত নূতন নহে; মহাভারতে ইহার মূল পাওয়া যায়।[৭]

প্রভৃতিকে উপলব্ধি করিতে পারে, কিন্তু পশুকাম ব্যক্তির (পশু-উদ্দেশে) ইষ্টি অর্থাৎ যাগ করার পর পশু দেখা যায় না। অতএব ইষ্টির ফল পশু নহে। যখন কর্ম্ম করা যায়, তখনই ফল হইবে; যখন শরীরকে মর্দ্দন করা হয়, তখনই সুখ হইয়া থাকে। কালান্তরে ফল হইবে? তাহা হইতে পারে না। কি প্রকারে? যখন ইষ্টি বিদ্যমান থাকে, তখন তাহা ফল দেয় নাই; আবার যখন ফল উৎপন্ন হয় তখন তাহা নাই—অসৎ। অসৎ হইয়া কিরূপে ফল দিতে পারে? আরও, আমরা ফলপ্রাপ্তির অপর কারণ স্পষ্টই দেখিতে পাই, দৃষ্ট কারণ পাওয়া গেলে অদৃষ্ট কল্পনা করিতে পারা যায় না, কেননা তাহার কোন প্রমাণ নাই। অতএব যখন বেদের এইরূপ অপচার দেখা যাইতেছে, তখন আমরা মনে করি স্বর্গাদি ফলও নাই... ।"

যদিও ইহা বিরুদ্ধবাদী পূর্ব্বপক্ষের কথা, এবং যদিও শবরস্বামী ইহা খণ্ডন করিয়াছেন, তথাপি ইহার দ্বারা সেই সময়ের কতকগুলি লোকের বেদ ও পরলোক-স্বর্গাদি বিষয়ে কিরূপ ধারণা ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

৬। তুলনীয়—মৈত্র্যুপনিষৎ, ৭.১০;

"বক্ষ্যামি জাজলে বৃত্তিং নাস্মি ব্রাহ্মণ নাস্তিকঃ।
ন যজ্ঞঞ্চ বিনিন্দামি যজ্ঞবিৎ তু সুদুর্লভঃ॥" মহাভারত, ১২.২৬২.৪।

৭। "অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্"—গীতা, ১৬.৮।

কিন্তু পরবর্ত্তী হিন্দু দার্শনিকগণ ইহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই; এবং সেইজন্যই ঈশ্বরকে স্বীকার না করিলেও সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শন নাস্তিক-দর্শনশ্রেণীতে পরিগণিত না হইয়া আস্তিকদর্শন বলিয়া গৃহীত হইতেছে। বোধ হয়, এই লক্ষণানুসারে মীমাংসাদর্শনকে নাস্তিকতার কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য পরবর্ত্তী মীমাংসকগণ নিরীশ্বর কর্ম্মমীমাংসার মধ্যেও ঈশ্বরকে আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন।[৮]

আবার কালক্রমে এক-এক ধর্ম্মসম্প্রদায় অপর ধর্ম্মসম্প্রদায়কে নাস্তিক-শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। যথা, মাধ্বগণ শৈবগণকে বলিয়া থাকেন—

"লিঙ্গার্চ্চনপরাঃ শৈবা নাস্তিকাঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

আবার শৈবগণও পালটায় বলেন—

"তপ্তমুদ্রাঙ্কিততনুর্নাস্তিকং ধর্ম্মমাশ্রিতঃ।
পশুতুল্যঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বকর্ম্মসু গর্হিতঃ॥"

এইরূপ অনেকে অনেক-অনেক বলিয়া থাকেন; কিন্তু এ সমস্তই যে বিদ্বেষপ্রসূত তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

লৌকায়তিক; লোকায়তিক ও লোকায়ত

নাস্তিকের অপর নাম লৌ কা য় তি ক। যে ব্যক্তি লো কা য় ত অধ্যয়ন করে বা জানে, সে লৌ কা য় তি ক। যদ্যপি পাণিনি নিজের কথায় এই শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেন নাই, তথাপি "ক্রতূকৃথাদি" গণে[৯] লো কা য় ত শব্দ পাঠ করায় পূর্ব্বপ্রদর্শিত ব্যুৎপত্তিই যে তাঁহার অভিপ্রেত, তাহা মনে করা যাইতে পারে।

৮। মীমাংসার্থসংগ্রহে লোগাক্ষি ও মীমাংসার্থপ্রকাশে আপোদেব লিখিয়াছেন যে, ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম মুক্তির জন্য হয়। তাঁহারা ইহার সমর্থনের জন্য গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। মীমাংসাদর্শন যে বস্তুত ঈশ্বর স্বীকার করে না, তাহা অন্যত্র মী মাং সা দ র্শ নে ঈ শ্ব র বা দ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

৯। "ক্রতূকথাদিসূত্রান্তাট্ঠক্" ॥ ৪.২.৬০।

কোথাও কোথাও লৌ কা য় তি ক স্থানে লো কা য় তি ক দেখা যায়। শঙ্করাচার্য্যের শারীরকভাষ্য ও গীতাভাষ্যে লো কা য় তি ক পদই দৃষ্ট হয়।[১০] রামায়ণ ও মহাভারতেও এইরূপ প্রয়োগ আছে।[১১]

আবার কোনো কোনো স্থানে ঐ অর্থেই লো কা য় ত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।[১২]

যাহা লো কে র মধ্যে আ য় ত অর্থাৎ বিস্তৃত—যে দর্শন বা মত সাধারণ লোকের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছে, অর্থাৎ বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছে, তাহার নাম লো কা য় ত। মাধবাচার্য্য তাঁহার সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে বলিয়াছেন :—

"প্রায় সমস্ত লোকেই—

'যাবজ্জীবং সুখং জীবেন্নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥'

১০। "লো কা য় তি কা না মপি চেতন এব দেহ ইতি," "লো কা য় তি কা দেহব্যতিরিক্তস্যাত্মনোঽভাবং মন্যমানাঃ"—ইতি বেদান্তদর্শন, শা.ভা. ২.২.২; ৩.৩.৫৩ (আনন্দাশ্রম ও কালীবরবেদান্তবাগীশ উভয় সংস্করণেই এই পাঠ আছে); "লো কা-য় তি ক দৃষ্টিরিয়ম্"—গীতাভাষ্য ১৬.৮।

১১। "কচ্চিন্ন লো কা য় তি কা ন্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।" রামায়ণ, ২.১০০.৩৮।
"নানাশাস্ত্রেষু মুখ্যৈশ্চ শুশ্রাব স্বনমীরিতং।
লো কা য় তি ক মুখ্যৈশ্চ সমন্তাদনুনাদিতং॥" মহাভারত, ১.৭০.৪৬
(প্রতাপ রায়ের সংস্করণ)।

১২। বেদান্তসারের টীকাকার রামতীর্থ লিখিয়াছেন— "লো কা য় তা নাং চার্ব্বাকবিশেষাণাং মতভেদমাহ"—১৪১ পৃঃ (Colonel G. A. Jacobএর সংস্করণ); আর্হতপ্রবর শ্রীহরিভদ্রসূরি স্ববিরচিত ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ে বলিয়াছেন :— 'লো কা য় তা বদন্ত্যেবং নাস্তি দেবা ন নির্বৃতিঃ"—৮০ শ্লোক; ঐ গ্রন্থের টীকাকার মণিভদ্রও ঐরূপ উল্লেখ করিয়াছেন (৮০ ও ৮৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য); নৈষধচরিতে (১৭.৬৪) শ্রীহর্ষও ঐ অর্থে লো কা য় ত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

অর্থাৎ যতকাল বাঁচিবে, সুখে বাঁচিবে, মৃত্যুর অবিষয় নাই, ভস্মীভূত দেহের আবার কোথা হইতে আগমন হইবে!—এই লোকগাথার অনুরোধে নীতি ও কাম শাস্ত্রের অনুসরণে অর্থ ও কামকেই পুরুষার্থ মনে করিয়া, ও পারলৌকিক (স্বর্গাদি) অর্থকে অপলাপ করিয়া চার্ব্বাকের মতের অনুবর্ত্তন করে বলিয়া বোধ হয়। এই জন্যই চার্ব্বাক-মতের লো কা য় ত এই নামটি সার্থক।"

অমরকোষের টীকাকারগণ বলেন যে, লোকায়ত-শব্দে চার্ব্বাক-শাস্ত্র বুঝায়।

লোকায়ত-শব্দের ব্যুৎপত্তি ও মাধবাচার্য্যের উক্তি আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, এক সময়ে চার্ব্বাকের নাস্তিক-মত সাধারণ লোকের মধ্যে অত্যন্ত প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই সময়েই ঐ মতের নাম লো কা য় ত হইয়াছিল। এই লো কা য় ত মত অনুসরণ করেন বলিয়া তন্মতাবলম্বিগণও লো কা য় ত, লো কা য় তি ক, বা লৌ কা য় তি ক নামে অভিহিত হইয়াছে।

রামায়ণের একস্থানে রাম ভরতকে বলিতেছেন :—

"বৎস, তুমি ত লো কা য় তি ক ব্রাহ্মণকে সেবা করিতেছ না? ইহারা মূঢ়, পণ্ডিতাভিমানী ও অনর্থকুশল। মুখ্য ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ বিদ্যমান থাকিলেও সেই কুপণ্ডিতগণ আন্বীক্ষিকী বুদ্ধি (তর্কবিদ্যা) লাভ করিয়া নিরর্থক বাদ করেন।"[১৩]

ইহা আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, রাম এখানে হেতুবাদের অবলম্বনকারী হৈতুকগণের কথাই বলিতেছেন। মহাভারতেও এতাদৃশ

১৩। "কচ্চিন্ন লো কা য় তি কা ন্ ব্রাহ্মণান্ তাত সেবসে।
অনর্থকুশলা হ্যেতে বালাঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু মুখ্যেষু বিদ্যমানেষু দুর্বুধাঃ।
বুদ্ধিমান্বীক্ষিকীং প্রাপ্য নিরর্থং প্রবদন্তি তে॥" রামায়ণ, ২.১০০.৩৮-৩৯।

অনেক-অনেক কথা আছে; তাহার সহিত তুলনা করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিবে না।[১৪] রামায়ণের টীকাকারগণের মধ্যে কেহ কেহ ঐ লো কা য় তি ক শব্দের অর্থ করিয়াছেন "প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদী চার্ব্বাক-মতানুচারী;" আবার কেহ কেহ বলেন "শুষ্কতর্কবাবদূক।" শুষ্ক-তর্ক শব্দ হেতুবাদের নামান্তর।

বৌদ্ধসাহিত্যে লো কা য় ত শব্দে বিতণ্ডাশাস্ত্রকে বুঝায়।[১৫] এই বিতণ্ডা বস্তুত শুষ্কতর্ক বা হেতুবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে।[১৬] বৈতণ্ডিক বলিলে ঠিক নাস্তিকবাদীকেই বুঝা যায় না, যে-কোন শুষ্কতার্কিক হেতুবাদীকেই সাধারণত আমরা বুঝিয়া থাকি।

শুষ্কতর্ক, বিতণ্ডা বা হেতুবাদকে লো কা য় ত শব্দে অভিহিত করিবার কারণ পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই বলিতে হয় যে, নাস্তিকবাদের ন্যায় ইহাও সাধারণ লোকে বিস্তার লাভ করিয়াছিল; অথবা লো কা-য় ত নামে প্রসিদ্ধ নাস্তিকবাদে ইহার অত্যন্ত প্রভাব থাকায়, ইহারও ঐ নাম হইয়াছে; অথবা ইহাও হইতে পারে যে, প্রথমে হেতুবাদই লোকমধ্যে বিস্তার লাভ করায় তাহার নাম লো কা য় ত হয়, পরে হেতু-বাদে অভ্যুত্থিত নাস্তিকবাদও ঐ নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে।

নাস্তিকবাদ যে হেতুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। মনুতে তাহা স্পষ্টরূপেই দেখা যায়। তিনি বলিয়াছেন:—

"যে দ্বিজ হেতুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের মূলস্বরূপ শ্রুতি ও স্মৃতিকে অবমাননা করিবে, সেই বেদনিন্দক নাস্তিককে সাধুগণ বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন।"[১৭]

১৪। মহাভারত, ১৩.১৭.১১-১৫। হে তু বা দ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৫। "বিতণ্ডানথং বিঞ্ঞেয্যং যন্তং লো কা য় তং"—অভিধানপ্পদীপিকা, ১২২

১৬। তুলঃ—ন্যায়দর্শন, ১.২.২-৩।

১৭। "যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্ দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥" মনু, ২.১১।

এ স্থানে ইহাও জানা গেল যে, নাস্তিক ও হৈতুক বস্তুত অভিন্ন।[১৮]

মনুর ন্যায় অন্যান্য গ্রন্থেও হৈতুকগণের নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়।[১৯] কিন্তু আবার মনুতেই ধর্ম্মমীমাংসায় তাহারও স্থান প্রদর্শিত হইয়াছে।[২০] পণ্ডিতেরা (কুল্লূকভট্টপ্রভৃতি) বলেন—সে স্থানে হৈতুক-শব্দে শ্রুতিস্মৃতির অবিরুদ্ধ-ন্যায়-শাস্ত্রবিৎকে বুঝিতে হইবে।

বার্হস্পত্য

নাস্তিকেরা বার্হস্পত্য নামেও পরিচিত।[২১] বৃহস্পতির মত অনুসরণ করায় নাস্তিকগণের বার্হস্পত্য নাম হইয়াছে। প্রসিদ্ধি আছে যে, বৃহস্পতি নাস্তিকদর্শনের উদ্ভাবন করেন। মাধবাচার্য্য তাঁহার সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে "নাস্তিকশিরোমণি" চার্ব্বাককে বৃহস্পতির মতানুসারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য দার্শনিকগণও নাস্তিকবাদপ্রসঙ্গে বৃহস্পতির মত বা বচন উদাহৃত করিয়া থাকেন। বৃহস্পতিই যে নাস্তিক বাদের প্রচারকর্ত্তা তাহা আমরা মৈত্র্যুপনিষদে (৭.৯) দেখিতে পাই। সেখানে উক্ত হইয়াছে:—

"বৃহস্পতি শুক্রের রূপ ধারণ করিয়া[২২] ইন্দ্রের অভয় ও অসুর-গণের ক্ষয়ের জন্য এই (পূর্ব্বোক্ত নৈরাত্ম্যবাদরূপ) অবিদ্যাকে সৃষ্টি করেন। তাহার দ্বারা অসুরেরা মঙ্গলকে (শিব) অমঙ্গল, ও অমঙ্গলকে

১৮। হেতুবাদ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৯। "হৈতুকান্ বকবৃত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ॥" বিষ্ণুপুরাণ, ৩.১৮.৯৯
"সন্দেহকৃদ্ হেতুভির্যঃ সৎকর্ম্মসু স হৈতুকঃ।" ঐ টীকায় শ্রীধর।

২০। "ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।"
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্ব্বে পরিষৎ স্যাদ্দশাবরা॥" মনু, ১২.১১১।

২১। 'বার্হস্পত্যস্তু নাস্তিকঃ"—হেমচন্দ্র।

২২। মূল—"শুক্রো ভূত্বা;" দীপিকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন—"শুক্ররূপমাস্থায়।"

মঙ্গল বলিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিল, এবং বলিল—'বেদাদি শাস্ত্রের বিনাশক ধর্ম্মের অভিচিন্তন করা হউক!' অতএব ইহাকে অধ্যয়ন করিবে না। এই বিদ্যা বিপরীত, এবং বন্ধ্য; আচারভ্রষ্ট লোকের ন্যায় কেবল রতিই ইহার ফল।"

এ স্থানে জানিতে পারা গেল যে, ইন্দ্রের অভয় ও অসুরগণের ক্ষয়ের জন্য বৃ হ স্প তি নাস্তিকবাদের প্রচার করেন।

আবার ঐ উপনিষদেরই অন্যত্র (৭.১০) উক্ত হইয়াছে যে, কোন সময়ে দেব ও অসুরগণ আত্মতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছায় ব্র হ্মা র নিকট গমন করেন, ও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলেন :—'ভগবন্, আমরা আত্মতত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু, আপনি তাহা আমাদিগকে বলুন!' ব্রহ্মা কিয়ৎক্ষণ ধ্যান করিয়া দেখিলেন যে, সেই অসুরগণের মতি (প্রকৃত আত্মা হইতে) অন্যত্র। এজন্য তিনি তাহাদিগকে (প্রকৃত আত্মা হইতে) অন্য আত্মা বলিয়া দিলেন। সেই মূঢ়গণ তাহাই গ্রহণ করিয়া আসক্তিপরায়ণ হইয়া উঠিল; (সংসারসমুদ্র-) তরণের উপায়কে অভিহত করিতে লাগিল; মিথ্যা কহিতে লাগিল; এবং ইন্দ্রজালের ন্যায় অনৃতকে সত্যরূপে দেখিতে আরম্ভ করিল। অতএব যাহা বেদসমূহে উক্ত হইয়াছে, তাহা সত্য। যাহা বেদসমূহে উক্ত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ তাহাই গ্রহণ করেন। সেই জন্য (অসুরগণের ন্যায়) ফল হইবে মনে করিয়া ব্রাহ্মণ অবৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে না।"

পূর্ব্বে জানা গিয়াছিল যে, বৃ হ স্প তি নাস্তিকবাদ প্রচার করেন, এখন জানা গেল যে, ব্র হ্মা তাহা করিয়াছিলেন।

অসুরগণের দেহাত্মবাদের কথা ছান্দোগ্য উপনিষদেও (৮.৭-৮) দেখা যায়; কিন্তু সেখানে তাহার প্রচারক প্র জা প তি, বৃ হ স্প তি নহেন। সে স্থলে এ প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, দেবগণের ইন্দ্র ও অসুরগণের

বিরোচন আত্মতত্ত্ব-অন্বেষণের জন্য সমিৎ-হস্তে প্রজাপতির নিকট আগমন করিয়া দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ ব্রহ্মচর্য্য করেন। অনন্তর প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বলিলেন—"এই যে চক্ষুর মধ্যে পুরুষ দেখা যাইতেছে, এই আত্মা।" শিষ্যদ্বয় সন্দেহনিরাসের জন্য আবার প্রশ্ন করিলে, তিনি তাহাই বলিয়া উপদেশ দিলেন—"জলপূর্ণ শরাবে নিজেকে দেখিয়া যদি তোমরা আত্মাকে জানিতে না পার, তবে আমাকে বলিও।" তাঁহারা সেইরূপ করিলে প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি দেখিতেছ?" তাঁহারা বলিলেন—"নখলোমপর্য্যন্ত নিজেরই প্রতিরূপ দেখিতেছি।" প্রজাপতি বলিলেন—"তোমরা ভালরূপে অলঙ্কৃত হইয়া, সুন্দর বসন পরিধান করিয়া, ও পরিষ্কৃত হইয়া জলপূর্ণ শরাবে দর্শন কর।" তাঁহারা সেইরূপ করিলে প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি দেখিতেছ?" তাঁহারা উত্তর করিলেন—"ভগবন্, আমরা যেমন ভালরূপে অলঙ্কৃত হইয়াছি, সুন্দর বসন পরিধান করিয়াছি, ও পরিষ্কৃত হইয়াছি, এই প্রতিবিম্বও সেইরূপ হইয়াছে।" প্রজাপতি বলিলেন—"এই আত্মা, এই অমৃত অভয়, এই ব্রহ্ম।" শিষ্যদ্বয় ইহা শুনিয়া শান্তহৃদয়ে চলিয়া গেলেন।

এ দিকে প্রজাপতি তাঁহাদিগকে যাইতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—"ইহারা আত্মাকে লাভ না করিয়া, আত্মাকে জানিতে না পারিয়া যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে দেব বা অসুর, যাহারা এই নিশ্চয় করিয়া থাকিবে, তাহারা পরাভূত হইবে।"

বিরোচন শান্তহৃদয়ে অসুরগণের নিকট গমন করিলেন, ও তাঁহাদিগকে এই উপনিষৎ বলিলেন—"লোকে আত্মাই (দেহই) পূজনীয়; আত্মাকেই পূজা করিয়া ইহলোক ও পরলোক উভয়কেই লাভ করা যায়।" উপনিষৎ ইহার পরেই বলিতেছেন—"সেই জন্য আজিও যে

ব্যক্তি দান করে না, যে শ্রদ্ধাহীন, ও যে যাগ করে না, লোকেরা তাহাকে বলিয়া থাকে—'অহো! এ ব্যক্তি আসুর!' কেননা, ইহা আসুর উপনিষৎ। তাহারা মৃত ব্যক্তির শরীরকে ভিক্ষালব্ধ (গন্ধমাল্যাদি ও) বসনের দ্বারা অলঙ্কৃত ও সংস্কৃত করে। তাহারা মনে করে যে, ইহার দ্বারাই পরলোক জয় করিবে!"

ইন্দ্র কিন্তু দেবগণের নিকট না গিয়াই এই ভয় দেখিলেন—"যেমন এই শরীরকে ভালরূপে অলঙ্কৃত করিলে ইহাও (প্রতিবিম্ব) ভালরূপে অলঙ্কৃত হয়, উত্তম বসন পরিধান করিলে ইহাও উত্তম বসন পরিধান করে, এবং পরিষ্কৃত হইলে ইহাও পরিষ্কৃত হয়, এইরূপই ইহা (শরীর) অন্ধ হইলে ইহাও (প্রতিবিম্ব) অন্ধ হয়, কাল হইলে ইহাও কাল হয়, ও ছিন্ন হইলে ইহাও ছিন্ন হয়; এবং শরীরের নাশ হইলে ইহাও নষ্ট হয়। অতএব আমি ইহাতে ভোগার্হ কিছু দেখিতেছি না।"

ইন্দ্র এই মনে করিয়া পুনর্ব্বার সমিৎ-হস্তে আগমন করিলে প্রজাপতি তাঁহাকে বলিলেন—"মঘবন্, তুমি যে বিরোচনের মত শান্ত হৃদয়ে চলিয়া গিয়াছিলে! আবার কি ইচ্ছা করিয়া আগমন হইয়াছে?" তিনি বলিলেন —"যেমন এই শরীরকে ভালরূপে অলঙ্কৃত করিলে ইহাও ভালরূপ অলঙ্কৃত হয়, উত্তম বসন পরিধান করিলে ইহাও উত্তম বসন পরিধান করে, পরিষ্কৃত হইলে ইহাও পরিষ্কৃত হয়, এইরূপই ইহা অন্ধ হইলে ইহাও অন্ধ হয়, কাণ হইলে ইহাও কাণ হয়, ছিন্ন হইলে ইহাও ছিন্ন হয়, এবং শরীরের নাশ হইলে ইহাও নষ্ট হয়। অতএব আমি ইহাতে কিছু ভোগার্হ দেখিতেছি না।"

প্রজাপতি বলিলেন—"মঘবন্, ইহা এইরূপই; আমি তোমার নিকটে ইহারই ব্যাখ্যা করিব। আরও দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ এখানে (ব্রহ্মচর্য্যে) বাস কর।"

অনন্তর ইন্দ্র পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া প্র জা প তি র নিকটে যথার্থ আত্মতত্ত্ব জানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং দেবগণও ইন্দ্রের নিকট হইতে তাহা জানিয়াছিলেন।[২৩]

ছান্দোগ্য আলোচনা করিয়া জানা গেল যে, আ সু র উ প-নি ষ ৎ বা দে হা ত্ম বা দ বলিয়া যে মত অসুরগণের মধ্যে প্রচার লাভ করিয়াছিল, তাহার উদ্ভাবনের মূলে প্র জা প তি। শতপথব্রাহ্মণেও (২.৩.৪.৫) এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, প্র জা প তি অসুরগণকে তমঃ ও মায়া প্রদান করিয়াছিলেন।[২৪] মৈত্র্যুপনিষদে প্র জা প তি র স্থানে ব্র হ্মা ও বৃ হ স্প তি এই উভয়কেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্র জা প তি ও ব্র হ্মা একই বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু মৈত্র্যুপনিষদে আবার বৃ হ স্প তি র অবতারণা কেন? মোক্ষমূলর মনে করেন. পরবর্ত্তী সময়ে ঋষিগণ ভাবিয়া থাকিবেন যে, প্রজাপতির ন্যায় উচ্চতম দেবতার পক্ষে অসুরগণকেও বিপথে লইয়া যাওয়া ঠিক দেখায় না। তাই তাঁহারা অর্ব্বাচীন উপনিষদে তাঁহার স্থান বৃ হ স্প তি কে দিয়া গ্রহণ করাইয়াছেন।[২৫]

এখন কথা হইতেছে—কোন বৃহস্পতি এই নাস্তিকবাদ প্রচার করিয়াছেন? অনেক বৃহস্পতির নাম পাওয়া যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রকার বলিয়া এক বৃহস্পতি প্রসিদ্ধ আছেন। ইঁহার প্রণীত বৃহস্পতিসংহিতা আজো আমরা

২৩। ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮.৯—১২।

২৪। " (প্রজাপতিঃ) তেভ্যস্তমশ্চ মায়াঞ্চ প্রদদৌ।"

২৫। 'It is not unlikely that Brihaspati was introduced in the latter Upanishads in order to take the place of Prajāpati, because it was felt wrong that this highest deity should ever mislead any body, even the demons."—Six Systems of Indian Philosophy, p. 126.

দেখিতে পাই। আর এক বৃহস্পতি দেবগণের পুরোহিত; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (২.৭.১.২) ইঁহার উল্লেখ দেখিয়াছি। আর এক বৃহস্পতিকে মহাভারতে পাওয়া যায়; ইনি সেখানে অহিংসাশ্রিত ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন।[২৬] মহাভারতেই অপর এক বৃহস্পতিকে পাওয়া যায়; ইনি উশনা অর্থাৎ শুক্রাচার্য্যের সহিত বঞ্চনাশাস্ত্রকার বলিয়া সেখানে উল্লিখিত হইয়াছেন।[২৭] ঋগ্বেদে বৃহস্পতি নামে দুইজন ঋষি প্রসিদ্ধ আছেন। ইঁহাদের একজন আঙ্গিরস (১০.৭১), অপর জন লৌক্য অর্থাৎ লোক-

---

২৬। যুধিষ্ঠির বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, অহিংসা, বৈদিক কর্ম্ম, ধ্যান, ইন্দ্রিয়সংযম, তপ, ও গুরুশুশ্রূষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? বৃহস্পতি ইহার উত্তরে অহিংসাশ্রিত ধর্ম্মকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে বলিয়াছেন।—মহাভারত, ১৩.১১২.১-৩। এ স্থানের পঞ্চম শ্লোকের সহিত ধম্মপদের ১৩১শ শ্লোকের অক্ষরগতও অনেক মিল আছে; যথা—

"অহিংসকানি ভূতানি দণ্ডেন বিনিহন্তি যঃ।
আত্মনঃ সুখমন্বিচ্ছন্ স প্রেত্য ন সুখী ভবেৎ॥" মহাভারত।
"সুখকামানি ভূতানি যো দণ্ডেন বিহিংসতি।
অত্তনো সুখমেসানো পেচ্চ সো ন সুখী ভবে॥" ধম্মপদ দণ্ড. ৪।

বৃহস্পতি শান্তিপর্ব্বেও (২১.১১) ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন, ঐ উপদেশকেও অদ্রোহপ্রধান দেখা যায়।

২৭। "শম্বরস্য চ যা মায়া মায়া যা নমুচেরপি।
বলেঃ কুম্ভীনসেশ্চৈব সর্ব্বাস্তা যোষিতো বিদুঃ॥
উশনা বেদ যচ্ছাস্ত্রং যচ্চ বেদ বৃহস্পতিঃ।
স্ত্রীবুদ্ধ্যা ন বিশিষ্যেতে, তাস্তু রক্ষ্যাঃ কথং নরৈঃ॥
অনৃতং সত্যমিত্যাহুঃ সত্যঞ্চাপি তথানৃতং।
ইতি যাস্তাঃ কথং বীর, সংরক্ষ্যাঃ পুরুষৈরিহ॥
স্ত্রীণাং বুদ্ধ্যর্থনিষ্কর্ষাদর্থশাস্ত্রাণি শত্রুহন্।
বৃহস্পতিপ্রভৃতিভির্মন্যে সদ্ভিঃ কৃতানি বৈ॥"
মহাভারত, ১৩.৩৯.৬, ৮—১০।

সূক্ত (১০.৭২)। এই লৌক্য বৃহস্পতির সহিত লোকায়ত মত বা নাস্তিকদর্শনের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করিবার কোনো কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। লৌক্য বৃহস্পতি-রচিত সূক্তটিতে নাস্তিকবাদের কোনো আভাসই নাই। ইহা ভিন্ন আরও বৃহস্পতি পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কে নাস্তিকদর্শনের প্রবর্ত্তক তাহা বলিতে পারা যায় না। মহাভারতে পূর্ব্বোক্ত (১৩.৩৯.৬,৮-১০) যে বৃহস্পতিকে বঞ্চনাশাস্ত্রকার বলা হইয়াছে, তাঁহার সহিত মৈত্র্যুপনিষদের (৭.৯) নৈরাত্ম্যবাদপ্রকাশক বৃহস্পতিকে অভিন্ন বলিয়া (অন্তত মতসম্বন্ধে) মনে করা যাইতে পারে। অতএব এই বৃহস্পতিই নাস্তিকবাদের উদ্ভাবনকর্ত্তা হইতে পারেন। ইহা ভিন্ন আর কিছু বিশেষরূপ বলা চলে না।

চার্ব্বাক

সকলেই জানেন নাস্তিকদর্শন চার্ব্বাক দর্শন নামেও প্রসিদ্ধ আছে। মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে লিখিয়াছেন—"বৃহস্পতি-মতের অনুসরণকারী নাস্তিকশিরোমণি চার্ব্বাক।" অতএব ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, চার্ব্বাক নাস্তিক দর্শনের উদ্ভাবক নহেন, তাহার একজন প্রধান অনুসরণকারী।

পণ্ডিতগণ চার্ব্বাক-শব্দটির এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া থাকেন—চারু অর্থাৎ আপাতমনোরম লোকচিত্তাকর্ষক বাক্ অর্থাৎ বাক্য যাহার, সে চার্ব্বাক; অর্থাৎ চারু বাক্ শব্দ হইতে চার্ব্বাক হইয়াছে।[২৮]

২৮। মোক্ষমুলর এস্থানে বলিয়াছেন:—"The name of Chārvāka is clearly connected with that of Chārva, and this is given as synonym of Buddha by Bāla Sāstrin, in the preface to his edition of Kāshika"—The Six Systems of Indian Philosophy p.130. কিন্তু বালশাস্ত্রী সেখানে তাহা বলেন নাই; তিনি বলিয়াছেন:—"চার্ব্বী বুদ্ধিঃ, তৎসম্বন্ধাদাচার্য্যোঽপি চার্ব্বা (চার্ব্বী বা চার্ব্বঃ নহে)।" শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার বিজ্ঞাপনে

নাস্তিকশিরোমণি চার্ব্বাক কে, তাহা বিশেষ জানা যায় না। মহাভারতে এক চার্ব্বাকের সহিত আমরা পরিচিত আছি। তিনি রাক্ষস, এবং দুর্য্যোধনের সখা; দুর্য্যোধনের কথায় ভিক্ষুব্রাহ্মণের বেশে যুধিষ্ঠিরকে বঞ্চিত করিবার জন্য ইনি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ দ্বারা নিহত হন।[২৯]

ইহার পূর্ব্বজন্মসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে:—চার্ব্বাক সত্যযুগে বহু বর্ষ ধরিয়া বদরিকাশ্রমে তপশ্চর্য্যা করেন, ও তাহা দ্বারা ব্রহ্মার নিকটে সর্ব্বভূত হইতে নিজের অভয় বর প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা "ব্রাহ্মণের অবমাননা করিবে না" বলিয়া তাঁহাকে সেই বরই প্রদান করেন। বর লাভ করিয়া চার্ব্বাক দেবগণকেও পীড়া দিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ ব্রহ্মার নিকটে আসিয়া তাহার বধের উপায়ের কথা বলিলেন। ব্রহ্মাও তাহা উদ্ভাবন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—চার্ব্বাক মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়া দুর্য্যোধনের সখা হইবেন, এবং ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা করিবেন; তাহাতেই ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।[৩০]

এই উপাখ্যানে চার্ব্বাকের নাস্তিকবাদিতার কোনো পরিচয় না পাওয়া গেলেও, ব্রাহ্মণগণের যে তাঁহার প্রতি ক্রোধ ছিল, এবং সেই ক্রোধের কারণ যে, তাঁহার দ্বারা তাঁহাদের অবমাননা, তাহা বেশ বুঝা যায়।

কাশিকারই পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাশিকার পাঠ এই—"নয়তে চার্ব্বী লোকায়তে। চার্ব্বী বুদ্ধিঃ তৎসম্বন্ধাদাচার্য্যোঽপি চার্ব্বী, স লোকায়তশাস্ত্রে পদার্থান্ নয়তে- উপপত্তিভিঃ স্থিরীকৃত্য শিষ্যেভ্যঃ প্রাপয়তি"—(১.৩.৩৬)। ইহাতে বুঝা যাইবে যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের বিজ্ঞাপনে ধৃত পাঠ মূল হইতে ভিন্ন, এবং মোক্ষমূলর তাহা আরও ভিন্ন করিয়া পাঠ করিয়াছেন।

২৯। মহাভারত ১২.৩৮.২২-৩৫।

৩০। মহাভারত ১২.৩৯.৩-১৯

ভারতে অনেক স্থলে নাস্তিকবাদের কথা আছে,[৩১] কিন্তু তৎপ্রসঙ্গে র্বাকের নাম দেখা যায় না। মহাভারতের উপাখ্যানে চার্ব্বাককে হ্মণগণের প্রতিপক্ষ বলা হইয়াছে; অতএব ব্রাহ্মণগণের নিকট হার রাক্ষস বলিয়া পরিচিত হওয়া খুবই সম্ভব। হইতে পারে পর-ী ব্রাহ্মণগণ নিজেদের অবমাননাকারী নাস্তিকগণকে মহাভারতের র্বাকের নাম মনে করিয়া চার্ব্বাক-শব্দেই অভিহিত করিয়া থাকিবেন।

উদয়নাচার্য্য তাঁহার ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতে ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধগণকে র্বা ক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৩২] কুসুমাঞ্জলির প্রকাশটীকাকার মানও তাহাই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুত চার্ব্বাক বৌদ্ধ হ, কেননা, উভয় মতের পার্থক্য অনেক।

নাস্তিকগণকে বহু স্থানে পা ষ ণ্ড শব্দে, এবং কখন কখন পা ষ ণ্ডী, ণ্ড ক, অথবা পা ষ ণ্ডি ক শব্দে উল্লেখ করা হয়।[৩৩] পণ্ডিতগণ কষ্টকল্পনা করিয়া পা ষ ণ্ড শব্দের এইরূপ অর্থ করেন:—"যে ব্যক্তি দর্শন ও সংসর্গ প্রভৃতি দ্বারা পাপ দান করে, সে পা ষ ণ্ড;[৩৩] অথবা যে দুষ্কৃত রক্ষা করে, তাহার নাম পা (√পা + কিপ্), অর্থাৎ বেদধর্ম;

পাষণ্ডী, পাষণ্ডক, পাষণ্ডিক

৩১। ১২.১৩৩.১৪ ইত্যাদি; See Hopking's The Great Epic of India, pp. 86-90.

৩২। "স্যাদেতৎ—মাভূদধ্যক্ষমনুমানং বা ক্ষণিকত্বে, তথাপি সন্দেহোঽস্তু, এতা-বতাপি সিদ্ধং সমীহিতং চা র্ব্বা ক স্যে তি।" ১ম স্তবক, ১৯২ পৃঃ (সোসাইটি)।

৩৩। বিষ্ণু পুরাণাদিতে (৩.১৮.৫৬,) পা ষ ণ্ডী, শব্দরত্নাবলীতে পা ষ ণ্ড ক, ও ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ের (২ শ্লোক) মণিভদ্রের টীকায় পা ষ ণ্ডি ক দেখা যায়।

৩৪। "পাপং সনোতি দর্শনসঙ্গাদিনা দদাতীতি (ষণুঞ্ দানে ঞমন্তাৎ ডঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ) পা ষ ণ্ডঃ"—শব্দকল্পদ্রুম। দ্রষ্টব্য:—বিষ্ণুপুরাণ ৩.১৮।

সেই পা-কে যে খণ্ডন করে, সে পা ষ ণ্ড।"[৩৫] আধুনিক অনু-সন্ধিৎসু কোন-কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, পা ষ ণ্ড শব্দটি বৈদেশিক বা প্রাদেশিকভাষাজাত।[৩৬]

সংস্কৃতসাহিত্যে কেবল নাস্তিকেরাই যে, পা ষ ণ্ড বলিয়া অবজ্ঞাত হইয়াছে, তাহা নহে; বৌদ্ধ ও জৈনগণও তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই।[৩৭] অধিক কি, শেষে নাস্তিক-শব্দের ন্যায় এ শব্দটিও পরস্পরবিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়।[৩৮]

বৌদ্ধসাহিত্যে পা ষ ণ্ড শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে। বলা বাহুল্য বৌদ্ধগণ নিজেকেই বুঝাইবার জন্য ঐ পদ প্রয়োগ করেন নাই; হিন্দু-দিগের ন্যায় তাঁহারাও নিজের বিরুদ্ধবাদী প্রতিপক্ষগণকে,—যাঁহাদিগকে তাঁহারা না স্তি ক বলিয়া গণ্য করিতেন,—ঐ পদে সম্বোধন করিতেন।

বৌদ্ধসাহিত্যে ৯৬ জন পাষণ্ডের উল্লেখ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে কুটীশক-প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ ৩৪ জন, এবং অপর ৬২ জন।[৩৯] দীঘনিকায়ের অন্তর্গত ব্রহ্মজালসুত্তে ইহাদের মধ্যে কতকগুলির মত বর্ণিত আছে।[৪০]

৩৫। "পালনাচ্চ ত্রয়ীধর্ম্মঃ পা-শব্দেন নিগদ্যতে। তং ষ (খ) ণ্ডয়ন্তি তে যস্মা পাষণ্ডাস্তেন হেতুনা।"

৩৬। The Great Epic of India, p.89, foot note.

৩৭। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি. ২২০, ৩৩০ পৃঃ, (সোসাইটি); বিষ্ণুপুরাণ, ৩.১৮।

৩৮। পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড ৪২ অধ্যায়।

৩৯। "কুটীসকাদিকচতুত্তিংস দ্বাসট্‌ঠি দিট্‌ঠিয়ো।
ইতি ছন্নবতী এতে পাসণ্ডা সম্পকাসিতা॥"—অভিধানপ্পদীপিকা, ৪৪১।

৪০। ইহাদের অন্তর্গত শাশ্বতবাদ ও উচ্ছেদবাদ মহাভারতেও দেখা যায়, যথা—
"এবং সতি ক উচ্ছেদঃ শাশ্বতো বা কথং ভবেৎ।
স্বভাববর্ত্তমানেষু সর্ব্বভূতেষু হেতুতঃ॥" ১২.২১৯.৪১; দ্রষ্টব্য ৩,৬।

জৈনগণ তাঁহাদের শাস্ত্রে ৩৬৩ জন পাষণ্ডের উল্লেখ করেন। ইহাদের মধ্যে ক্রিয়াবাদী ১৮০ জন, অক্রিয়াবাদী ৮৪ জন, অজ্ঞানিক ৬৭ জন, এবং বৈনয়িক ৩২ জন।[৪১] বলা বাহুল্য জৈনগণও নিজের বিরুদ্ধবাদীকে পাষণ্ড বলিয়া থাকেন।

বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে উক্ত যে সকল পাষণ্ডের কেবল সংখ্যামাত্র উল্লিখিত হইল, তাঁহাদের মত একত্র সংগৃহীত করিতে পারিলে প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র-আলোচনার অনেক উপকার হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাস্তিকবাদের সূচনা

এখন আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে, কোথায় ও কোন সময় নাস্তিকবাদের প্রথম সূত্রপাত দেখা যায়।

নাস্তিক-শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া পাণিনি (৪.৪.৬০) নিজের পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্বের সূচনা করিয়াছেন। মহাভারতে নাস্তিকবাদের বহু কথা পাওয়া যায়।[১] রামায়ণে রামের নিকট জাবালির নাস্তিকবাদপ্রসঙ্গ সুপ্রসিদ্ধ।[২] ঐ স্থানে বহুবার নাস্তিকশব্দের প্রয়োগ আছে।

পাণিনি হইতে ব্রাহ্মণ-পর্য্যন্ত সময়ে নাস্তিক-বাদের উল্লেখ

৪১। ষড়্দর্শনসমুচ্চয়, ২ শ্লোকটীকা। সূত্রকৃতাঙ্গ-নামক গ্রন্থে এই সকল মতের অনেকগুলি সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে; দ্রঃ—১.৫. ৮.৯, ১১-১৩; ১.১৩; ১.১৫-৩৩; ২.২।

১। "নায়ং লোকোঽস্তি ন পর ইতি ব্যবসিতো জনঃ।
নালং গন্তুং হি বিশ্বাসং না স্তি কে ভয়শঙ্কিতে॥" শান্তি, ১৩৩.১৪।

২। রামায়ণ, অযোধ্যা, ১০৮; জাবালি বলিতেছেন—
"স চাপি কালোঽয়মুপাগতঃ শনৈঃ।
যথা ময়া না স্তি ক বাগুদীরিতা॥" অযোধ্যা, ১০৯.৩৯।

মৈত্র্যুপনিষদে (৩.৫) নাস্তিক-শব্দ ও দেহাত্মবাদের কথা পাওয়া গিয়াছে। ছান্দোগ্য-উপনিষদেও তাহা দেখা গিয়াছে; এবং কঠোপনিষদেও দেখিতে পাই:—

"মনুষ্য মৃত হইলে এই যে সংশয় আছে—কেহ কেহ বলেন 'এ থাকে,' আবার কেহ কেহ বলেন 'এ থাকে না,' ইহা আমি আপনার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া জানিব।"[৩]

আরও সেখানে উক্ত হইয়াছে:—

"অবিবেকী, প্রমত্ত ও বিত্তমোহে মূঢ় ব্যক্তির নিকট পরলোক প্রতিভাত হয় না। যে মনে করে—'এই (বর্ত্তমান) লোক আছে, পর-লোক নাই,' সে পুনঃ পুনঃ আমার (যমের) বশে আগমন করে।"[৪]

প্রজাপতি অসুরগণকে যে মায়া প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা শতপথ-ব্রাহ্মণেও দেখা গিয়েছে।

এই সমস্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই বলিতে হইবে, উপনিষৎ- বা ব্রাহ্মণ-সময়ে নাস্তিকবাদ বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। এখন মন্ত্রভাগে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হইবে যে, তাহার মধ্যে এ সম্বন্ধে কিছু পাওয়া যায় কি না।

মন্ত্রসমূহের মধ্যে তাহার অস্তিত্ব

বেদের স্তোত্ররূপ মন্ত্রসমূহে দেখা যায়, ঋষিগণ দেবতার নিকট নানাবিধ দ্রব্যের প্রার্থনা করিতেছেন। যে-কোন রূপেই হউক মনো-

৩। "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহম্॥" কঠ.১.১.২০।

৪। "ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতিবালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতিমানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে॥" ১.২.৬

তুলনীয়:—
"যদিদং মন্যসে রাজন্নায়মস্তি কুতঃ পরঃ।
প্রতিস্মারয়িতারস্ত্বাং যমদূতা যমক্ষয়ে॥" মহাভারত, শান্তি, ১৫০.১৯

রথ পূর্ণ হইলে সেই স্তোত্র- বা মন্ত্র-সমূহের উপর তাঁহাদের যে একটা শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইতেছিল, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। মন্ত্রের প্রতি এই শ্রদ্ধাই দৃঢ়তর হইয়া কালক্রমে মন্ত্রসমূহাত্মক বেদের প্রামাণ্যস্থাপনের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

একদিকে বেদের প্রামাণ্য যেমন শনৈঃ শনৈঃ দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল, তদ্বিষয়ক সন্দেহও সেইরূপ অপর দিকে আত্মপ্রকাশ করিতে বিরত ছিল না।

বেদের প্রামাণ্য ও দেবতার অস্তিত্বে সন্দেহ

দেবতার স্তুতি করিয়াও যে সকল ঋষি নিজের অভিলষিত দ্রব্য লাভ করিতে পারেন নাই, সেই স্তুতিসমূহের উপর তাঁহাদের ক্রমশঃ সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। কালক্রমে সেই সন্দেহই প্রবলরূপে পরিণত হইয়া কেবল স্তুতিরই প্রামাণ্য নষ্ট করে নাই, স্তুতিভাজন দেবতাগণেরও অস্তিত্বসম্বন্ধে সন্দেহ জন্মাইয়া দিয়াছিল। এই জন্যই ঋগ্বেদে (৮.১০০.৩) একজন ঋষি বলিতেছেন:—

"হে সংগ্রামেচ্ছুগণ, তোমরা ইন্দ্রের সত্য ভাবে স্তুতি কর, যদি ইন্দ্র সত্য থাকে। (ভার্গব) নেম বলেন—ইন্দ্র নামে কেহ নাই। কে ইন্দ্রকে দেখিয়াছে? কাহাকে আমরা স্তব করিব?"[৫]

ইন্দ্র ইহা শুনিয়া নিজেই বলিতেছেন:—"হে স্তুতিকারিন্, এই আমি রহিয়াছি, এই তোমার নিকটে স্থিত আমাকে দেখ। আমি মহত্ত্বে সমস্ত ভুবনকে অভিভব করি। সত্য-উপদেশক বিদ্বানেরা স্তোত্র দ্বারা আমাকে বর্দ্ধিত করেন। আমি বিদারণশীল, আমি ভুবনসমূহকে নিরতিশয় বিদীর্ণ করি।"[৬]

৫। "প্র সু স্তোমং ভরত বাজয়ন্ত ইন্দ্রায় সত্যং যদি সত্যমস্তি।
নেন্দ্রোহস্তীতি নেম উ ত্ব আহ ক ঈং দদর্শ কমভিষ্টবাম ॥"

৬। ঋগ্বেদ, ৮. ১০০.৪।

আবার অন্যত্র (২.১২.৫) উক্ত হইয়াছে :—

"যে ভয়ানকের সম্বন্ধে লোকেরা জিজ্ঞাসা করে,—'সেই ইন্দ্র কোথায় ?' তাঁহার সম্বন্ধে অন্যেরা বলিয়া থাকেন—'তিনি নাই।' তিনি উদ্বেজক হইয়া অরিগণের ধনসমূহ বিনষ্ট করেন ; হে জনগণ, তিনিই ইন্দ্র, তোমরা ইঁহাতে বিশ্বাস কর !"

আর একজন বলিতেছেন (১.৫৫.৫)—

"ইন্দ্র যখন (মেঘসমূহের প্রতি) হননসাধন বজ্র নিক্ষেপ করেন, তখন তাহার পরেই দীপ্তিমান্ তাঁহাতে সকলে শ্রদ্ধা করে।"[৭]

এই সকল আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে, মন্ত্রসময়েই কাহারো কাহারো দেবতাবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, কেহ কেহ তাহা একবারেই অস্বীকার করিয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ বা অপরের দেবতাবিশ্বাস উৎপাদনের জন্য চেষ্টাও করিতেছিলেন।

দেবতার উপর বিশ্বাস নষ্ট হইবার পর কালক্রমে দেবতাপ্রকাশক মন্ত্রসমূহেও অর্থাৎ বেদেও অবিশ্বাস আসিয়া পড়িল।[৮] একদল স্পষ্টতই ঘোষণা করিয়া ফেলিলেন যে, মন্ত্রসমূহের কোন অর্থ নাই ; এবং অপর আর একদল তাহার অর্থবত্ত্বপ্রতিপাদন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন। এইরূপেই বেদের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য, লইয়া তুমুল বিচারের অবতারণা শেষে দর্শনশাস্ত্রে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

তৎসম্বন্ধে কৌৎসের মত

অতিপ্রাচীনকালে যাঁহারা বেদের নিরর্থকত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম আমরা জানিতে পারি, ইঁহার নাম কৌৎস।

৭। দ্রষ্টব্য—ঋগ্বেদ, ১.১০৩.৫ ; ১০.৪-৬ ; Max Muiiller's Lectures on the Origin of Religion, pp. 140-143 ; 307-310.

৮। বেদে অবিশ্বাস হইবার আরও একটি কারণ ছিল, তাহা প্রথম পরিচ্ছেদে (২-৩ পৃঃ) বিবৃত হইয়াছে।

কৌৎস বলেন—মন্ত্রসমূহের কোন অর্থ থাকিতে পারে না; কেননা, যে সকল লৌকিক বাক্য অর্থপ্রকাশ করে, তাহার সহিত বৈদিক মন্ত্রসমূহের মিল নাই। আমরা যদি বলি—'পাত্রমাহর' (পাত্র আনয়ন কর), তবে অর্থ বুঝা যায়; আবার যদি বলি—'আহর পাত্রম্', তবুও অর্থ বুঝা যায়। কিন্তু মন্ত্রসমূহে তাহা হইবার উপায় নাই, তাহার পাঠ করিবার যে পৌর্ব্বাপর্য্য নিয়ম আছে, তাহার ব্যতিক্রম হইলে সে আর ঐ অর্থ প্রকাশ করিবে না। "অগ্ন আয়াহি বীতয়ে (হে অগ্নি, পানের জন্য আগমন করুন!)"[৯]—এই না বলিয়া, যদি বলি—"বীতয় আয়াহি অগ্নে," তবে তাহা ঠিক হইবে না! তবেই অর্থযুক্ত বাক্যের সহিত বৈদিক মন্ত্রসমূহের যখন বৈধর্ম্ম্য দেখা যাইতেছে, তখন কি করিয়া বলা যাইবে যে, তাহাদের অর্থ আছে? আবার তাহাদের প্রকাশিত অর্থও নিতান্ত অনুপপন্ন। দেখ, কুশচ্ছেদন করিবার জন্য ক্ষুরসংযোগ করিয়া[১০] বলা হইতেছে "হে ওষধি, ইহাকে রক্ষা কর!"[১১] যে অচেতন ওষধি নিজেকেই রক্ষা করিতে পারে না, সে অন্যকে কিরূপে রক্ষা করিবে? আবার ঐ স্থানেই কুশ ছেদন করিতে করিতেই বলা হইতেছে—"হে ক্ষুর, ইহাকে হিংসা করিও না!"[১২] কোন লোক যদি এক বলিয়া আর এক করে, তবে তাহাকে আমরা পাগল বলি। মন্ত্রসমূহে পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থও অনেক দেখা যায়। এক স্থানে বলিতেছে "একই রুদ্র, দ্বিতীয় নাই।"[১৩] অন্য স্থানে বলিতেছে "অসংখ্য সহস্র রুদ্র!"[১৪]

৯। সামবেদ, ১.১.১.১।

১০। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র, ৭.২.১১।

১১,১২। "ওষধে ত্রায়স্ব, স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ"—বাজসনেয়িসংহিতা—৪.১.৬।

১৩। "এক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থে"—তৈত্তিরীয়সংহিতা, ১.৮.৬ ১।

১৪। বাজসনেয়িসংহিতা, ১৬.৫৪।

এক স্থানে বলিতেছে "ইন্দ্র শত্রুহীন,"[১৫] আর এক স্থানে বলিতেছে "ইন্দ্র শত সেনাকে জয় করিয়াছেন!"[১৬] আর এক মন্ত্র বলিতেছে "অদিতি দ্যৌ, অদিতি অন্তরিক্ষ।"[১৭] যেই অদিতি, সেই অন্তরিক্ষ, ইহা কে বুঝিবে? আবার এমনও কতকগুলি কথা আছে, যাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায় না, যেমন "অম্যক্," "কাণুকা," ইত্যাদি, ইত্যাদি। অতএব মন্ত্রসমূহের কোন অর্থ নাই!

যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে[১৮] কৌৎসের আপত্তিসমূহ খণ্ডন করিয়া মন্ত্রের অর্থবত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। জৈমিনিও তাঁহার মীমাংসাদর্শনে (১.২.৩২-৫৩) কৌৎসের মতকে পূর্ব্বপক্ষরূপে উত্থাপিত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে এস্থানে যাস্ক ও জৈমিনির প্রত্যুত্তর উদাহৃত হইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হেতুবাদ

পূর্ব্বে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, এইরূপে মন্ত্রসমূহাত্মক বেদের প্রামাণ্য আক্ষেপ হইতেই ভারতে হেতুবাদ (rationalism) জন্মগ্রহণ করে। এই হেতুবাদ এক সময়ে এতদূর প্রবল হইয়া উঠে যে, প্রচলিত বৈদিক পথকে নিতান্ত ব্যাকুল হইতে হইয়াছিল। হেতুবাদে আকৃষ্ট হইয়া সেই সময়ের প্রধান-প্রধান ব্যক্তিগণ নূতন-নূতন পথের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

হেতুবাদের উৎপত্তি

১৫। ঋগ্বেদ, ৮.৭.২১.২।

১৬। ঋগ্বেদ, ৮.৫.২২.১।

১৭। ঋগ্বেদ ১.৬.১৬.৫।

১৮। নিরুক্ত, ১.৫.১।

এবং ইহারই ফলে সাঙ্খ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের অভ্যুত্থান আমরা দেখিতে পাই; এই তিন ধর্ম্মই বৈদিক কর্ম্মপথের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান।

সাঙ্খ্যদর্শন

সাঙ্খ্যশাস্ত্রকার যদি মনে করিতেন যে, বৈদিক কর্ম্মে চরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, তবে তাঁহাকে নূতন শাস্ত্র লিখিতে হইত না। তিনি বলিয়াছেন যে, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডও লৌকিক উপায়ের ন্যায় হিংসাদি দোষে অবিশুদ্ধ, এবং তাহার ফল নশ্বর ও তারতম্যযুক্ত; ইহাতে সর্ব্বতোভাবে দুঃখ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারা যায় না।[১] ইহাকে হেতুবাদ ভিন্ন কি বলা যাইবে? ইহাতে কি মনে করা যায় না যে, সাঙ্খ্যকার বেদের কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি আস্থাবান্ ছিলেন না? আজ কালকার দিনে কেহ অনায়াসে এ কথা বলিতে পারেন, কিন্তু বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মের প্রভাবপূর্ণ সময়ে কপিলের মত ব্যক্তিকে কত দূর সাহস করিয়া তাহা বলিতে হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

সাঙ্খ্যদর্শনকার যদিও এইরূপে বৈদিক কর্ম্মকে অবিশুদ্ধ বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি সম্পূর্ণভাবে বেদকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই। কতক-কতক বিষয়ে তিনি বেদ অনুসরণ করিয়াই নিজের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করিয়াছেন। স্থূলত বলিতে গেলে বলিতে পারা যায় যে, কপিল বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে স্পষ্টত অগ্রাহ্য করিয়া জ্ঞানকাণ্ডকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।[২] এইরূপে বেদের এক অংশে প্রামাণ্য অস্বীকার করিলেও, কপিল অপর অংশে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। এবং সেই জন্যই বর্ত্তমান সাঙ্খ্যসূত্রে (৫.৪০-৫০) বেদের প্রামাণ্যপ্রতিপাদন দেখা যায়। কপিল অংশত বেদের প্রামাণ্য স্বীকার

১। "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।" সাঙ্খ্যকারিকা, ২।

২। "যদ্যপি চানুশ্রবিক ইতি সামান্যেনাভিহিতং, তথাপি কর্ম্মকলাপাভিপ্রায়ো দ্রষ্টব্যঃ, বিবেকজ্ঞানস্যাপ্যানুশ্রবিকত্বাৎ।" বাচস্পতিমিশ্র, সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী, ২।

করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার "তন্ত্র মহাজনপরিগৃহীত" হইয়াছিল,[৩]—যদিও তাহা শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে "আত্মভেদকল্পনা ও স্বতন্ত্র প্রকৃতির কল্পনা হেতু বেদবিরুদ্ধ ও বেদানুসারী মনুবচনের বিরুদ্ধ।"[৪] পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রাদিতে সাঙ্খ্যমত যেরূপ বহুলভাবে গৃহীত হইয়াছে, অপর মত সেরূপ নহে; ইহার প্রধান কারণ এই যে, কপিল আংশিকরূপেও বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। চিরপরম্পরাক্রমে সমাগত বেদ-প্রামাণ্যের বিরুদ্ধে প্রথম অভ্যুত্থান এইরূপ আংশিক হওয়াই খুব সম্ভব।

অংশত প্রত্যক্ষ বেদবিরোধ থাকিলেও কপিলের তন্ত্র যে মহাজন-গৃহীত হইয়াছিল, তাহার আরও একটি কারণ আছে। কপিল যে সময় উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই কর্ম্মবিধির উপর লোকের শ্রদ্ধাহ্রাস দেখিতে পাওয়া যায়। ভূয়োভূয় কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও বস্তুত তাহাতে পরম পুরুষার্থের আশা না দেখিয়া লোকেরা কর্ম্মানুষ্ঠানের উপর কতকটা বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। উপনিষদে ইহার উজ্জ্বল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে উক্ত হইয়াছে:—

"যাহাদিগের মধ্যে নিকৃষ্ট কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, সেই অষ্টাদশ-জন-যুক্ত[৫] যজ্ঞরূপ প্লব-(ভেলা) সমূহ অদৃঢ়। যে সকল মূঢ় ইহাকে শ্রেয়ঃ বলিয়া অভিনন্দন করে, তাহারা পুনর্ব্বার জরা-মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।"

"মূঢ়গণ বহুপ্রকার অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া মনে ভাবে যে, আমরা কৃতার্থ হইয়াছি; যে হেতু কর্ম্মিগণ আসক্তিবশতঃ (ভালরূপে)

৩। "মহাজনপরিগৃহীতানি মহান্তি সাঙ্খ্যাদিতন্ত্রাণি সম্যগ্‌দর্শনাপদেশেন প্রবৃত্তানীতি।" শাঙ্করভাষ্য, বেদান্তদর্শন, ২.২.১।

৪। "অতশ্চ সিদ্ধম্—আত্মভেদকল্পনয়াপি কপিলস্য তন্ত্রং বেদবিরুদ্ধং বেদানুসারি-মনুবচনবিরুদ্ধং চ, ন কেবলং স্বতন্ত্রপ্রকৃতি কল্পনয়ৈব"—শাঙ্করভাষ্য, বেদান্ত দর্শন ২.১.২।

৫। ষোড়শ ঋত্বিক্‌, যজমান ও যজমানপত্নী।

জানিতে পারে না, সেই জন্যই কর্ম্মফলক্ষয়ে তাহারা আবার (স্বর্গলোক হইতে) চ্যুত হয়।"

"প্রমূঢ়গণ যাগ ও পূর্ত্ত কার্য্যকেই প্রধান মনে করিয়া অপর শ্রেয়কে জানে না; অতএব তাহারা সুকৃত স্বর্গপৃষ্ঠে (কর্ম্মফল) ভোগ করিয়া এই হীনতর (মর্ত্ত্য) লোকে প্রবেশ করে।"[৬]

তদানীন্তন লোকেরা এইরূপে কর্ম্মের নিন্দাবাদ শুনিতে শুনিতে কতকটা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাই কপিল যখন বৈদিক ক্রিয়াকে স্পষ্টত 'অবিশুদ্ধ' বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তখন সাধারণেরা তাহা শুনিয়া তত বিচলিত হয় নাই; বরং আকৃষ্ট হইয়া তাহা গ্রহণই করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে কপিলের নূতনত্ব এইটুকু যে, তিনি হিংসাশ্রিত দেখিয়া বৈদিক কর্ম্মকে 'অবিশুদ্ধ' বলিয়াছেন; নতুবা কর্ম্মফল যে ক্ষয়শীল ও তারতম্যযুক্ত তাহা তাঁহার নিজের উদ্ভাবন নহে, বহুপূর্ব্ব হইতেই তাহা প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল।

অন্যত্র পশুবধ করিলে পাপ হইবে, কিন্তু যজ্ঞে পশুবধ করিলে পাপ হইবে না;—"আম্নায়বচনাদ্ অহিংসা প্রতীয়েত (নিরুক্ত, ১.৫.২)"—অর্থাৎ তাদৃশ স্থানে বেদের কথাতেই বুঝিতে হইবে যে, হিংসা করা হয় না। কর্ম্মবাদিগণের এই সমস্ত কথার দিকে কপিল কোন দৃক্‌পাত না করিয়া কেবল হেতু- বা যুক্তি-বলে স্থাপন করেন যে, হিংসাশ্রিত বলিয়া বৈদিক কর্ম্মকেও অবিশুদ্ধ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

৬। "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥"
"অবিদ্যায়াং বহুধা বর্ত্তমানা বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ।
যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥"
"ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং চাবিশন্তি ॥"
মুণ্ডক-উপনিষৎ, ১. ২. ৭, ৯, ১০।

দ্রষ্টব্য—"তদ্ যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে—" ছান্দোগ্য-উপনিষৎ ৮. ১. ৬।

বেদান্তদর্শনও জ্ঞানপ্রধান সত্য; কিন্তু কপিল যে ভাবে কর্ম্মকাণ্ডকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, বেদান্তদর্শন সেরূপ পারে নাই। জ্ঞানকে প্রধান আসন দিলেও বেদান্তদর্শন কর্ম্মকে একবারে অবজ্ঞা করিতে পারে নাই, তাহাকে টানিয়া লইতে হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কাপিলদর্শন অপেক্ষা বেদান্ত দর্শনের ইহাই বিশেষত্ব।

বৌদ্ধদর্শন

হেতুবাদ-অবলম্বনে কপিল বেদের অর্দ্ধেক প্রামাণ্য উড়াইয়া দিয়াছিলেন, অর্দ্ধেক অবশিষ্ট ছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম অভ্যুদিত হইয়া ঐ অবশিষ্ট অর্দ্ধেকও উড়াইয়া দেয়। বুদ্ধদেব এক স্থানে বলিয়াছেন:—

"হে (কেশপুত্র-নগরীর) কালামগণ, আগমন কর, অনুশ্রুতি বলিয়া নহে, পরম্পরা বলিয়া নহে, ঐতিহাসিক বলিয়া নহে, কোন (প্রাচীন) পেটক হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে বলিয়া নহে, তর্কহেতু নহে, নয় (পদ্ধতি) হেতু নহে, আকারচিন্তা হেতু (?) নহে, মতবিশেষের আলোচনায় ক্ষতি হেতু নহে, ভব্যরূপ বলিয়া নহে, শ্রমণ আমাদের গুরু এই বলিয়া নহে, কিন্তু হে কালামগণ, যখন তোমরা নিজেই জানিতে পারিবে যে, এই ধর্ম্মসমূহ কুশল, এই ধর্ম্মসমূহ অনবদ্য, এই ধর্ম্মসমূহ বিজ্ঞজনপ্রশংসিত, এই ধর্ম্মসমূহ সম্পূর্ণ, এবং গৃহীত হইলে ইহারা সুখ ও হিতের জন্য হইবে, হে কালামগণ, তোমরা তখনই তাহা গ্রহণ করিয়া বিহরণ করিবে।"[৭]

৭। "এথ তুম্হে কালামা, মা অনুস্সবেন মা পরম্পরায় মা ইতিকিরায় মা মা পিটকসম্পদানেন ম' তক্কহেতু মা নয়হেতু আকারপরিবিতক্কেন মা দিট্‌ঠিনিজ্‌ঝানক্খন্তিয়া মা ভব্যরূপতায় মা সমনো নো গরূতি, যদা তুম্হে কালামা অত্তনাব জানেয্যাথ—ইমে ধম্মা কুসলা ইমে ধম্মা অনবজ্জা ইমে ধম্মা বিঞ্ঞুপসত্থা ইমে ধম্মা সমত্তা সমাদিন্না হিতায় সুখায় সংবত্তন্তীতি—অথ তুম্হে কালামা উপসম্পজ্জ বিহরেয্যাথাতি।" অঙ্গুত্তরনিকায়, ৩.৬৫.১৫।

বুদ্ধদেব কিরূপ যুক্তি অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তাহা এই কথার দ্বারাই সুস্পষ্ট জানা যাইবে।

জৈনদর্শন সম্বন্ধেও এইরূপ যুক্তিপ্রধান উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। জৈন দার্শনিকগণ বলেন—"'পুরাণ, মানবধর্ম্ম, সাঙ্গবেদ ও চিকিৎসাশাস্ত্র, এই চারিটি আজ্ঞাসিদ্ধ (আজ্ঞা বা আদেশ দ্বারাই ইহাদের প্রামাণ্য সিদ্ধ আছে), হেতুসমূহের দ্বারা ইহাদের উচ্ছেদ করা উচিত নহে।' ইত্যাদি বাক্য উল্লেখ করিয়া অন্যান্য দর্শনসমূহ বিচারপদবীকে আদর করে না। তাহারা স্বস্ব মতে দোষসম্ভাবনা দেখিয়াই বিচার করিতে চাহে না; কেননা, স্বর্ণ যদি নির্দ্দোষ হয়, তাহা হইলে কি কেহ তাহার পরীক্ষা প্রদান করিতে ভীত হয়? কিন্তু জিনমত সেরূপ নহে; জৈনগণ যুক্তিযুক্ত বিচার পথের পথিক, ইঁহারা যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া চলেন। এই জন্যই তাঁহারা বলিয়া থাকেন—'মহাবীরের প্রতি আমার পক্ষপাত নাই, এবং কপিল প্রভৃতির ও উপর দ্বেষ নাই। যাঁহার উক্তি যুক্তিযুক্ত, তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে।'"[৮] ফলত জৈনদর্শন এই উক্তি কতদূর রক্ষা করিতে পারিয়াছে তাহার বিচার স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু তাহা যে যুক্তিবাদ অবলম্বন করিয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা ইহা দ্বারাই বুঝা যাইবে।

জৈনদর্শন

হেতুবাদ-অবলম্বনে বেদের প্রামাণ্য অগ্রাহ্য করিয়া কেবল যে সাঙ্খ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মই অভ্যুত্থান লাভ করিয়াছে, তাহা নহে; ইহাদের পূর্ব্বে ও পরেও অনেক হেতুবাদী বা হৈতুক ছিল। মহাভারতের বহুস্থানে ইহাদের উল্লেখ দেখা যায়। একস্থানে লিখিত

হৈতুক

৮। "যুক্তিযুক্তবিচারপরম্পরাপরিচয়পথপথিকত্বেন জৈনো যুক্তিমার্গমবগাহতে। নচ পারম্পর্য্যাদিপক্ষপাতেন যুক্তিমুল্লঙ্ঘয়তি পরমার্হতঃ। উক্তঞ্চ—

পক্ষপাতো ন মে বীরে ন দ্বেষঃ কপিলাদিষু।
যুক্তিমদ্বচনং যস্য কার্য্যস্তস্য পরিগ্রহঃ॥"

ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়, মণিভদ্রটীকা. ৪৪; অত্রত্য গুণরত্নটীকাও দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে "বেদসমূহের অপ্রামাণ্য, শাস্ত্রসমূহের অতিক্রম ও সর্ব্বত্র অব্যবস্থা, এই সমুদয় নিজের (পাত্রতার, যোগ্যতার) বিনাশক। যে পণ্ডিতাভিমানী ব্রাহ্মণ নিরর্থক আন্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যায় অনুরক্ত হইয়া বেদের নিন্দা করে, যে হেতুবাদী বিজেতা সাধুগণের নিকট হেতুবাদসমূহ বলিয়া সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণকে কঠোর বাক্য বলে ও তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া বাক্য বলে, এবং যে মূঢ় সর্ব্ববিষয়ে শঙ্কাযুক্ত; মূর্খ ও কটুভাষী, তাহাকে রোধ করা উচিত, লোকেরা তাহাকে কুক্কুরের ন্যায় মনে করিয়া থাকে।"[১]

আর এক স্থানে লিখিত হইয়াছে, যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে বলিতেছেন:— "এমনও কতকগুলি হেতুবাদী পণ্ডিত আছেন, যাঁহাদিগকে সহজে কোন সিদ্ধান্ত বুঝাইতে পারা যায় না। ইঁহাদের পূর্ব্বপক্ষ দৃঢ়। এই মূঢ়গণ বলিয়া থাকেন যে,—'এই কিছুই নাই।' ইঁহারা অনৃত চিন্তা

১। "অপ্রমাণ্যঞ্চ বেদানাং শাস্ত্রাণাঞ্চাতিলঙ্ঘনম্।
অব্যবস্থা চ সর্ব্বত্র এতন্নাশনমাত্মনঃ॥
ভবেৎ পণ্ডিতমানী যো ব্রাহ্মণো বেদনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাম্॥
হেতুবাদান্ বদন্ সৎসু বিজেতা হেতুবাদিকঃ।
আক্রোষ্টা চাতিবক্তা চ ব্রাহ্মণানাং সদৈব হি॥
সর্ব্বাভিশঙ্কী মূঢ়শ্চ বালঃ কটুকবাগপি।
বোদ্ধব্যস্তাদৃশস্তাত, নরং শ্বানং হি তং বিদুঃ॥"

মহাভারত, ১৩.৩৭.১১—১৪।

দ্রষ্টব্য:—

"তস্মিন্ যজ্ঞে প্রবৃত্তে তু বাগ্মিনো হেতুবাদিনঃ।
হেতুবাদান্ বহূনাহুঃ পরস্পরজিগীষবঃ॥"

মহাভারত, ১৪.৮৫.২৭।

করেন, এবং জনসমাজে বক্তৃতা করেন। এই বহুশ্রুত বাবদূকগণ সমস্ত পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে।"[১০]

মহাভারতেই অপর এক স্থানে একজন নিজের শৃগালযোনিপ্রাপ্তির কারণ বলিতেছেন :—

"আমি নিরর্থক আন্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যায় অনুরক্ত, বেদনিন্দক, হৈতুক পণ্ডিত ছিলাম। আমি হেতুবাদসমূহ বলিতাম, সভাসমূহেও আমি হেতুযুক্ত বাক্যই বলিতাম। বেদবাক্যের বিচারে আমি দ্বিজগণকে পরুষবাক্য বলিতাম ও আক্রমণ করিয়া বলিতাম। আমি নাস্তিক ও সর্ব্বত্র সন্দেহযুক্ত, এবং মূর্খ হইলেও পণ্ডিতাভিমানী ছিলাম। তাহারই ফলস্বরূপ আমার এই শৃগালত্ব জাত হইয়াছে।"[১১]

এই হৈতুকগণ কিরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা মহাভারতের উল্লিখিত কথাতেই বুঝিতে পারা যাইবে। সেই বহুশ্রুত বাবদূকগণ

১০। "ভবন্তি সুচুরাবর্ত্তা হেতুমন্তোঽপি পণ্ডিতাঃ।
দৃঢ়পূর্ব্বে স্মৃতা মূঢ়া নৈতদস্তীতিবাদিনিঃ ॥
অনৃতস্যাবমন্তারো বক্তারো জনসংসদি।
চরন্তি বসুধাং কৃৎস্নাং বাবদূকা বহুশ্রুতাঃ ॥"

মহাভারত, ১২.১৯.২৩-২৪।

১১। "অহমাসং পণ্ডিতকো হৈতুকো বেদনিন্দকঃ।
আন্বিক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাম্ ॥
হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সংসৎসু হেতুমৎ।
আক্রোষ্টা চাভিযোক্তা চ ব্রহ্মবাক্যেষু চ দ্বিজান্ ॥
নাস্তিকঃ সর্ব্বশঙ্কী চ মূর্খঃ পণ্ডিতমানিকঃ।
তস্যেয়ং ফলনির্বৃত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ ॥"

মহাভারত, ১২.১৮০.৩৭-৩৯।

সমস্ত বসুধাতে বিচরণ করিতেছিল—"চরন্তি বসুধাং কৃৎস্নাং বাবদূকা বহুশ্রুতাঃ!"[১২]

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হেতুবাদের ফল

হেতুবাদের উৎপত্তিতে বেদের প্রামাণ্যসম্বন্ধে অনেক ক্ষতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা দ্বারা উপকারও কম হয় নাই। হেতুবাদের দ্বারাই মধ্যযুগে ভারতের বুদ্ধিবৃত্তি পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। হেতুবাদ অবলম্বনেই বহু প্রতিদ্বন্দ্বী উত্থিত হইয়া বৈদিকগণকে আক্রমণ করেন। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিগণ পরস্পরকে জয় করিবার জন্য সে সময়ে বুদ্ধিবৃত্তিপরিচালনায় যে বিশেষ ভাবে অভিনিবিষ্ট ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারা যায় না। তাঁহাদের এই পরিশ্রমের ফলেই দর্শনশাস্ত্রগুলি ক্রমে ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; সেই পরিশ্রমের ফলেই বৌদ্ধ ও জৈনগণের সময়ে বিবিধ দার্শনিক মত অভ্যুদয় লাভ করিয়াছিল; এবং সেই পরিশ্রমের ফলেই আমাদের পরম গৌরবের বিষয় প্রাচীন ও নব্য এই উভয়বিধ ন্যায়শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

বিবিধ দার্শনিক মতের অভ্যুদয়

১২। তুলনীয়ঃ—

"নৈরাত্ম্যবাদকুহকৈর্মিথ্যাদৃষ্টান্তহেতুভিঃ।
ভ্রাম্যল্লোকো ন জানাতি বেদবিদ্যান্তরং তু যৎ॥"

মৈত্র্যুপনিষৎ, ৭.৮।

অন্যান্য দর্শনের মত ন্যায়দর্শন যদিও নিঃশ্রেয়সলাভের উপায়স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া দাবী করে, এবং যদিও তাহা বর্ত্তমান আকারে সেই উক্তির কতকটা সার্থক্য রক্ষা করিতেছে, তথাপি, তাহার মূলে যে হেতুবাদ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পূর্ব্বে রামায়ণ ও মহাভারত হইতে যে সকল বচন উদ্ধৃত হইয়াছে,[১] তাহা দ্বারাই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে; আরও বুঝা যাইবে যে, সেই সময়ে আন্বীক্ষিকী-নামে প্রসিদ্ধ ন্যায়দর্শন নিরর্থক বলিয়া গণ্য হইত। বেদবাদিগণ তাহা অনুসরণ করিতেন না। ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহাদের এতদূরপর্য্যন্ত অশ্রদ্ধা হইয়াছিল যে, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন—ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে পরজন্মে শৃগালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়!

ন্যায়দর্শন

আজকাল ন্যায়দর্শন যে আকারে দেখা যায়, তাহার সম্বন্ধে ও কথা ঠিক খাটে না; ইহা ঐ পূর্ব্বপ্রচলিত হেতুবাদের ব্রাহ্মণসংস্করণ। হেতুবাদিগণ নিরর্থক আন্বীক্ষিকী অবলম্বন করিয়া যেমন বেদের প্রামাণ্য খণ্ডন করিতেন, বেদবাদিগণও সেই প্রকার আন্বীক্ষিকীই অবলম্বন করিয়া বেদের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন; যে হেতুবাদে বেদের প্রামাণ্য খণ্ডিত, সেই হেতুবাদের দ্বারাই তাহার স্থাপন করা হইয়াছে। বর্ত্তমানন্যায়দর্শনকার বুঝিয়াছিলেন যে, হেতুবাদ অবলম্বন না করিলে উপায় নাই; তাই তিনি জল্প, বিতণ্ডা ও ছলাদির তত্ত্বজ্ঞানেও নিঃশ্রেয়স-অধিগম হইবে, এই অদ্ভুত কথা প্রচার করিতে কোন সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। এ কথা তাঁহার নিজের মনেই জাগিয়াছিল, এবং সেই জন্যই বলিয়াছেন—"যেমন বীজের অঙ্কুরকে সংরক্ষণ করিবার জন্য তাহাকে কণ্টকশাখা দ্বারা আবরণ করা হয়, সেইরূপ তত্ত্বনিশ্চয়কে সংরক্ষণ করিবার জন্য জল্প ও বিতণ্ডার প্রয়োজন। বিজিগীষাপ্রবৃত্ত হইয়া জল্প ও বিতণ্ডার দ্বারা বিচার করিতে হয়।"[২]

১। রামায়ণ, ২.১০০.৩৯; মহাভারত, ১২.১৮০.৪৭; ১৩.৩৭.১২।

২। "তত্ত্বাধ্যবসায়সংরক্ষার্থং জল্পবিতণ্ডে বীজপ্ররোহরক্ষণার্থং কণ্টকাবরণবৎ ॥

তাঁহার পরে ভাষ্যকার পক্ষিলস্বামী ও বার্ত্তিককার উদ্যোতকর জল্প-বিতণ্ডার দ্বারা নিঃশ্রেয়সসিদ্ধি না দেখিয়া বলিয়াছেন—জল্প-বিতণ্ডা "বিদ্যার পরিচালনের জন্য, লাভখ্যাতির জন্য নহে।"[৩] বাচস্পতি মিশ্র ইহাই সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"কুদর্শনবলে যাহার মিথ্যা জ্ঞান উৎপাদিত হইয়াছে, এতাদৃশ কোন ব্যক্তি যদি দুর্বিদগ্ধতা হেতু বা সদ্বিদ্যায় বৈরাগ্যহেতু লাভ ও খ্যাতির প্রার্থী হইয়া জনসমূহের আধারভূত রাজগণের সম্মুখে বেদ, ব্রাহ্মণ ও পরলোকাদির দূষণে প্রবৃত্ত হয়; আর বাদী যদি অপ্রতিভতা হেতু তাহার সমীচীন দূষণ দেখিতে না পান, তবে তিনি জল্প ও বিতণ্ডার অবতারণা করিয়া জিগীষাপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার সহিত তত্ত্ববিচার করিবেন—বিদ্যার পরিপালনের জন্য। রাজাদের মতিভ্রম হেতু তদনুযায়ী প্রজাগণের যেন ধর্ম্মবিপ্লব না হয়—ইহাও জল্প ও বিতণ্ডার প্রয়োজন; দৃষ্ট ফল লাভ ও খ্যাতি তাহার প্রয়োজন নহে; কেননা, পরহিতপ্রবৃত্ত পরমকারুণিক মুনি (গৌতম) পরদোষসাধক উপায়কে উপদেশ দিতে পারেন না।"[৪]

তাভ্যাং বিগৃহ্য কথনম্ ॥—ন্যায়দর্শন, ৪.২.৫০-৫১।

"বীজপ্ররোহরক্ষায় বৃতিঃ কণ্টকিনী যথা:
বেদার্থতত্ত্বরক্ষার্থং তথা তর্কময়ী বৃতিঃ ॥"

সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ, নৈয়ায়িকপক্ষ, ২৪।

৩। বাৎস্যায়নভাষ্য ও ন্যায়বার্ত্তিক, ৪.২.৫১।

৪। বাচস্পতিমিশ্রের তাৎপর্য্যটীকা, ৪.২.৫১। তুলনীয়:—

"দুঃশিক্ষিতকুতর্কাংশলেশবাচালিতাননাঃ।
শক্যাঃ কিমন্যথা জেতুং বিতণ্ডাদোষমণ্ডিতাঃ ॥
গতানুগতিকো লোকঃ কুমার্গং তৎপ্রতারিতঃ।
মা গাদিতি চ্ছলাদীনি প্রাহ কারুণিকো মুনিঃ ॥"

ষড়্দর্শনসমুচ্চয়-টীকা, ৩০

এই ত প্রাচীন ন্যায়ের কথা। নব্য ন্যায়ের সম্বন্ধেও ইহাই; নব-ন্যায়ের মূলেও এই হেতুবাদ। পূর্ব্বে আমাদের দেশের ধারণা ছিল, সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্বচিন্তামণিকার মৈথিলপণ্ডিত শ্রীগঙ্গেশ উপাধ্যায়ই (১৪শ শতাব্দী) নব্য ন্যায়ের উদ্ভাবনকর্ত্তা। কিন্তু যখন ধর্ম্মকীর্ত্তির (৭ম শতাব্দী) ন্যায়বিন্দু আমাদের হস্তগত হইল, তখন বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইল নব্যন্যায়-উদ্ভাবনের গৌরব ব্রাহ্মণগণের প্রাপ্য নহে, তাহা বৌদ্ধগণের প্রাপ্য। ধর্ম্মকীর্ত্তি বৌদ্ধ ছিলেন। তাহার পর তিব্বত-অভিযানের কল্যাণে দিঙ্নাগাচার্য্যের প্রমাণসমুচ্চয় প্রভৃতি কতক-গুলি তর্কশাস্ত্রের তিব্বতীয় অনুবাদের কথা প্রচারিত হইলে জানিতে পারা গেল নব্য ন্যায় ষষ্ঠ শতাব্দীর অর্ব্বাচীন নহে, এবং তাহার উদ্ভাবনকর্ত্তা বৌদ্ধ ভিন্ন অপর নহে।

নব্য ন্যায়

বৌদ্ধগণ এতাদৃশ তর্কশাস্ত্রের উদ্ভাবনে কি জন্য পরিশ্রম করিয়া-ছিলেন? তাহার একমাত্র উত্তর—যে জন্য প্রাচীন ন্যায় বা আন্বীক্ষিকীর সৃষ্টি, নব্যন্যায়েরও সৃষ্টির তাহাই কারণ, এবং তাহা হেতুবাদের প্রভাব হইতে নিজ নিজ ধর্ম্ম বা মতকে নির্ব্বিঘ্নে স্থাপন ও রক্ষণ করা।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হেতুবাদের আবির্ভাবেই আমাদের দর্শন-শাস্ত্রগুলি পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অভিজ্ঞগণ চিন্তা করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। জীব-আত্মা, ইহলোক-পরলোক, বেদ-ঈশ্বর প্রভৃতি যে বিষয় লইয়া হৈতুকগণ বিরোধ উপস্থিত করেন, দর্শনশাস্ত্রসমূহে প্রধানত সেইগুলিই আলোচিত হইয়াছে দেখা যায়। এ সম্বন্ধে এখানে আর বেশী সময় ব্যয় না করিয়া মীমাংসাদর্শনে হেতুবাদের প্রভাব-বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। মীমাংসাদর্শন শ্রুতি ও স্মৃতির পরম পক্ষপাতী, ইহা সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু কোন-কোন স্মৃতি-সম্বন্ধে ইহার মন্তব্য দেখিলে

হেতুবাদ ও দর্শনশাস্ত্র

মীমাংসাদর্শন

আজকালিকার হিন্দুসমাজকে স্তব্ধ হইতে হয়। জ্যোতিষ্টোম যাগে অগ্নীষোমীয় পশুর তন্ত্র আরব্ধ হইলে বৈসর্জ্জননামক একটি হোমের বিধান আছে। সেই সময়ে যজমান, এবং তাঁহার পত্নী, পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে নব বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ঐ বস্ত্রের শেষে স্রুক্-দণ্ড বন্ধনপূর্ব্বক হোম করিতে হয়। সেই নববস্ত্রখানির সম্বন্ধে এক জন স্মৃতিকার বলিয়াছেন—"বৈসর্জ্জনহোমীয়ং বাসোঽধ্বর্য্যুর্গৃহ্লাতি"—বৈসর্জ্জন হোমের কাপড়খানি অধ্বর্য্যু গ্রহণ করিবেন। এই স্মৃতিবচনের প্রামাণ্য আছে কি না—এই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া মীমাংসকগণ বলিয়াছেন[৫] যে, এ স্মৃতি প্রমাণ হইতে পারে না, কেননা, এ স্মৃতির মূল শ্রুতি নহে। তবে কি? লোভ! "লোভাদাচরিতবন্তঃ কেচিৎ তত এষা স্মৃতিঃ; উপপন্নতরঞ্চৈতদ্ বৈদিকবচনকল্পনাৎ"[৬]—লোভবশত কেহ কেহ ঐরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই ঐ স্মৃতির উৎপত্তি; এই স্মৃতির মূলভূত বৈদিকবচন কল্পনা করা অপেক্ষা ইহাই উপপন্নতর। মীমাংসাদর্শন কি সাহস দেখাইয়াছেন! ইহা কি হেতুবাদ নহে? এরূপ দৃষ্টান্ত তাহাতে বিরল নহে।[৭] অর্থবাদবাক্যের স্বার্থে প্রামাণ্যখণ্ডনও ইহার অপর উদাহরণ।

৫। মীমাংসাদর্শন, ১.৩.৩-৪।

৬। ঐ শাবরভাষ্য।

৭। দ্রষ্টব্য—মীমাংসাদর্শনের স্মৃতিপ্রমাণ্যাধিকরণ; "বঙ্গদর্শনে" (আষাঢ়, ১৩১২) আমার লিখিত "আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র"-শীর্ষক প্রবন্ধ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নাস্তিকবাদের গ্রন্থ

এই বার আমরা নাস্তিকবাদের গ্রন্থসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

নাস্তিকবাদের কোন পৃথক্ গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই; কিন্তু তাহা যে এককালে ছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যে-যে স্থানে নাস্তিকবাদের উল্লেখ আছে, তাহার অধিকাংশ স্থলে গ্রন্থান্তর হইতে উদ্ধৃত বচনাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সকল বচন কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত তাহার নির্দ্দেশ সব সময় পাওয়া যায় না। ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থসমূহের রীতিই এইরূপ ছিল যে, কোনো বচন উদ্ধৃত করিলেও, কোন গ্রন্থ হইতে তাহা উদ্ধৃত, গ্রন্থকারগণ তাহা লিখিতেন না। নাস্তিকবাদসম্বন্ধেও সেইরূপ; বহুস্থানে ইহা আলোচিত হইয়াছে, বচনও উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহা কোন গ্রন্থের তাহা প্রায়ই বলা হয় নাই। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে "তদুক্তং" বলিয়া গ্রন্থকার অনেক বচন তুলিয়াছেন, কিন্তু তাহার আকরস্থানের উল্লেখ নাই।

মূল গ্রন্থ দুর্লভ

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বৃহস্পতি নাস্তিকবাদ প্রচার করেন। এই বৃহস্পতির নামে একখানি সূত্রগ্রন্থ ছিল, এবং ইহা বৃহস্পতিসূত্র বা বার্হস্পত্যসূত্র বলিয়া অভিহিত হইত। বার্হস্পত্যসূত্রের কয়েকটিমাত্র সূত্র আমরা দেখিতে পাই। সদানন্দযতি তাঁহার অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতে বার্হস্পত্যসূত্র বলিয়া তিনটি সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।[১] বেদান্তদর্শনের অন্যতম ভাষ্যকার ভাস্করাচার্য্যও "বার্হস্পত্যসূত্র" নাম দিয়া কয়েকটি সূত্র গ্রহণ

বৃহস্পতিসূত্র, বা বার্হস্পত্য-সূত্র

১। "তথাচ বার্হস্পত্যসূত্রাণি—

করিয়াছেন।[২] শ্রীশঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে (বে. দ. ৩.৩.৫৩) "চৈতন্য-বিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ"—এই একটি বার্হস্পত্যসূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা যে বার্হস্পত্যসূত্র তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই, কারণ, সদানন্দযতি তাঁহার অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতে স্পষ্টত বার্হস্পত্যসূত্র বলিয়া ঐ সূত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের তত্রত্য বাক্যপঙ্‌ক্তি দেখিয়া বোধ হয় যে, ঐ সূত্রটির অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যটিও একটি সূত্র, বা অন্তত কোনো সূত্রের অক্ষরপঙ্‌ক্তি হইবে।[৩]

বৃহস্পতি উক্ত শ্লোক ও বিষ্ণু-পুরাণ

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে "তদেতৎ-সর্ব্বং বৃহস্পতিনাপ্যুক্তম্‌" বলিয়া কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, সেই শ্লোকগুলিও বৃহস্পতিরচিত, অথবা বৃহস্পতির মতানুসারে অপর কাহারো দ্বারা রচিত গ্রন্থ হইতে তাহাদিগকে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই সমস্ত শ্লোকের মধ্যে দুইটি বিষ্ণুপুরাণের মহামোহ-উপাখ্যানের শ্লোকদ্বয়ের সহিত অর্থে ও অক্ষরে অনেকাংশে সমান।[৪]

"চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ॥ কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ॥ মরণমেবাপবর্গঃ॥"
২য় মুদ্গার, ১২১ পৃঃ, (সোসাইটী সংস্করণ)।

২। বেদান্তদর্শন, ৩.৩.৫৩। ভাস্করাচার্য্যের ভাষ্য কাশীর "চৌখাম্বা সংস্কৃতগ্রন্থাবলীর" মধ্যে শ্রীযুক্ত বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী সম্পাদন করিতেছেন। সম্প্রতি একখণ্ড-মাত্র বাহির হইয়াছে; ইহাতে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ষোড়ষ সূত্র পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। See Essays on the Religion and Philosophy of the Hindus by H. T. Colbrooke, 1828, p. 260.

৩। "...তেভ্যশ্চৈতন্যং মদশক্তিবদ্‌ বিজ্ঞানং, চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষ ইতি চাহুঃ।"
বে.দ. ৩.৩.৫৩।

৪। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে—

"পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥

ইহা ছাড়াও যে নাস্তিকবাদের গ্রন্থ ছিল, তাহা অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি-প্রভৃতি আলোচনা করিলেই বুঝা যায়; কিন্তু তাহাদের নাম জানিবার উপায় নাই।

প্রবাদবাক্য

নাস্তিকবাদসম্বন্ধে জনমধ্যে লোকগাথা বা প্রবাদবাক্যেরও [৫] সৃষ্টি হইয়াছিল। এতাদৃশ একটি বাক্যের সহিত আমরা পরিচিত আছি। যথা —

"অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ॥" [৬]

আলোচ্য গ্রন্থাবলী

নাস্তিকবাদ অল্প-বিস্তর বহু দর্শনগ্রন্থেই আলোচিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ আলোচনা করিলে তৎসম্বন্ধে অনেকটা জানিতে পারা যায়ঃ—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ (চার্ব্বাক-দর্শন), ষড়্দর্শন সমুচ্চয় (লৌকায়তিক-দর্শন), অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি (২য় মুদ্গর), বেদান্তদর্শন-শারীরকভাষ্য (৩.৩.৫৩), মীমাংসাদর্শন-শাবরভাষ্য

মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেৎ তৃপ্তিকারণম্।
গচ্ছতামিহ জন্তূনাং ব্যর্থং পাথেয়কল্পনম্॥"

বিষ্ণুপুরাণে (৩.১৮.২৬-২৭) —

"নিহতস্য পশোর্যজ্ঞে স্বর্গপ্রাপ্তির্যদীষ্যতে।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হন্যতে॥
তৃপ্তয়ে জায়তে পুংসো ভুক্তমন্যেন চেৎ ততঃ।
দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধং শ্রদ্ধয়ান্নং ন বহেয়ুঃ প্রবাসিনঃ॥"

৫। সংস্কৃতে যাহা "আভাণক" বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

৬। অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতে ইহার পাঠান্তর এইরূপ—

"অগ্নিহোত্রঞ্চ পীতঞ্চ ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মগুণ্ঠনম্।
প্রজ্ঞাপৌরুষহীনানাং জীবো জল্পতি জীবিকাম্॥"

আবার নৈষধচরিতে (১৭-৩৯) এইরূপ উক্ত হইয়াছেঃ—

"অগ্নিহোত্রং ত্রয়ী তন্ত্রং ত্রিদণ্ডং ভস্মপুণ্ড্রকম্।
প্রজ্ঞাপৌরুষনিস্বানাং জীবো জল্পতি জীবিকাম্॥"

(১.১.৫), শাস্ত্রদীপিকা (৩য় পাদ, ৯৫ পৃঃ, কাশী), বৈশেষিক-সূত্রোপস্কার (৩. ২.৪), ন্যায়দর্শন (৩.২.৩৬-৪০), মৈত্র্যুপনিষৎ (৭.৮-৯), ও নৈষধচরিত (১৭ শ সর্গ)। নৈষধচরিতে নাস্তিকবাদ কৌতুকপ্রদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।[৭]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নাস্তিকদর্শনের মত

নাস্তিকদর্শনসম্বন্ধে আমরা নিতান্ত অনভিজ্ঞ, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কয়েকটি মোটামুটি মত ভিন্ন আমরা বিশেষ কিছুই জানি না, এবং জানিবারও কোন উপায় নাই। যে কয়টি মত সাধারণে প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে দুই-একটি ভিন্ন অপর গুলির সর্ব্বাঙ্গীন যুক্তি আমরা জানিতে পারি না। নাস্তিকবাদিগণ শেষে যে সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাহারই কিয়দংশমাত্র আজকাল প্রচলিত আছে। বেদানুসারিগণের গ্রন্থে যে নাস্তিকবাদ উদ্ধৃত দেখা যায়, তাহা দ্বারা সর্ব্বাংশে তাহা জানা যায় না, সাধারণতঃ তাহার দুর্ব্বল অংশগুলিই ঐ সকল গ্রন্থে খণ্ডন করিবার জন্য উদ্ধৃত হইয়াছে। যদি কোন দিন সম্পূর্ণ মূল বার্হস্পত্যসূত্র বা তজ্জাতীয় অপর কোন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়, তবেই নাস্তিকদর্শনের মতামতসমূহ বিশেষরূপে জানা যাইবে, নতুবা তাহার আর কোন আশা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।

সাধারণের অনভিজ্ঞতা

৭। ইংরাজীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

H. T. Colebrooke's Essays on the Religion and Phlosophy of the Hindus (1858, pp. 259-61) ; Max Müller's The Six Systems of Indian Philosophy (pp. 123-37.)

তথাপি সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ ও অন্যান্য কতকগুলি গ্রন্থে তদ্বিষয়ে যাহা জানিতে পারা যায়, নিম্নে তাহা সঙ্কলন করিবার চেষ্টা করিলাম।

রামায়ণ

রামায়ণে[১] জাবালি রামচন্দ্রকে নাস্তিকবাদ অবলম্বন করিয়া যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার একটি চিত্র প্রকাশ পায়, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"ভাল রাম, তুমি আর্য্যবুদ্ধি; সামান্য লোকের ন্যায় তোমার বুদ্ধি যেন অনর্থদর্শিনী না হয়। কে কাহার বন্ধু? কোন ব্যক্তিরই বা কোন সম্বন্ধে কি প্রাপ্য আছে? জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে ও একাকী বিনষ্ট হয়। অতএব যে ব্যক্তি মাতা-পিতা বলিয়া আসক্ত হয়, সে উন্মত্ত; কেননা, কেহ কাহারো নহে। যেমন কোনো লোক প্রবাসে গমন করিবার সময় গ্রামের বহির্দেশে বাস করে ও পরদিন সেই আবাস পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, পিতা-মাতা গৃহ-ধনও সেইরূপ আবাসমাত্র; হে কাকুৎস্থ, সজ্জনগণ ইহাতে আসক্ত হন না। অতএব তুমি পিতার অনুরোধে পৈতৃক রাজ্য ত্যাগ করিয়া বিষম বহুকণ্টকাবৃত দুঃখজনক কুপথে গমন করিবার যোগ্য নও। তুমি সমৃদ্ধ অযোধ্যায় নিজেকে অভিষিক্ত কর। সেই একবেণীধরা নগরী তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে। হে পার্থিবাত্মজ, তুমি অযোধ্যায় মহার্হ ভোগ সকল অনুভব করিয়া দেবলোকে শক্রের ন্যায় বিহরণ কর। দশরথ তোমার কেহ নহেন, এবং তুমিও তাঁহার কেহ নও; সেই রাজা অন্য, এবং তুমি অন্য। অতএব আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তাহা কর। জন্তুর জন্মবিষয়ে পিতা নিমিত্তমাত্র; ঋতুমতী মাতাতে যে শুক্রশোণিত সংযুক্ত হয়, তাহাতেই লোকের জন্ম হইয়া থাকে। সেই নৃপতি (দশরথ) যেখানে যাইবার গিয়াছেন। ইহাই মনুষ্যের (স্বাভাবিক) প্রবৃত্তি। কিন্তু তুমি বৃথা বিনষ্ট হইতেছ! যে

১। অযোধ্যা ২.১০৮।

ব্যক্তি অর্থের জন্য ধর্ম্মপরায়ণ হয়, আমি তাহাদের জন্য শোক করি তাহারা এখানে দুঃখ ভোগ করে ও মরিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে অষ্টকাশ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। দেখ, ইহাতে কেবল অনর্থক অন্ন নষ্ট করা হয়। যে মরিয়া গিয়াছে, সে আর কি খাইবে? যদি এখানে একজন ভোজন করিলে তাহা অন্যের শরীরে যায়, তবে প্রবাসী ব্যক্তির জন্য শ্রাদ্ধ করাই উচিত, এবং পথে তাহার কিছু ভোজন করা সঙ্গত নহে! যে সকল গ্রন্থ বলিয়া থাকে যে, 'যাগ কর, দান কর, দীক্ষিত হও, তপস্যা কর, ও ত্যাগ কর,' নিশ্চয়ই মেধাবিগণ লোককে দানকর্ম্মে বশীভূত করিবার জন্য সেই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। হে মহামতে, তুমি এই বুদ্ধি কর যে, পরে আর কিছুই নাই; যাহা প্রত্যক্ষ দেখ তাহা গ্রহণ কর, এবং পরোক্ষকে পশ্চাতে রাখ। অতএব, ভরত তোমাকে প্রসাদিত করিতেছে, তুমি সর্ব্বলোকের নিদর্শনস্বরূপ সজ্জনগণের বুদ্ধিকে পুরস্কৃত করিয়া রাজ্য গ্রহণ কর।"

সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ

মাধবাচার্য্যকৃত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে নাস্তিকমতের সংগ্রহস্বরূপ কতকগুলি কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে নাস্তিকমত এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

"স্বর্গ নাই, অপবর্গ নাই, পারলৌকিক আত্মা নাই, এবং বর্ণাশ্রমাদি-বিহিত ক্রিয়াসমূহও ফলদায়ক নহে।

"অগ্নিহোত্র, বেদত্রয়, ত্রিদণ্ড[২] ও ভস্মগুণ্ঠন এই সমুদয়কে বিধাতা বুদ্ধি ও পৌরুষ-হীন ব্যক্তিগণের জীবিকা করিয়া দিয়াছেন।

"পশু যদি জ্যোতিষ্টোমে নিহত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে, তবে যজমান সেখানে নিজের পিতাকে বধ করেন না কেন?

"শ্রাদ্ধ যদি মৃত পুরুষগণেরও তৃপ্তিদায়ক হয়, তবে যে সকল লোক

২। "ত্রয়ো দণ্ডা যত্র তৎ ত্রিদণ্ডং পাশুপতব্রতম্"—ইতি নৈষধটীকা, ১৭.৩১।

স্থানান্তরে গমন করে, তাহাদের পাথেয় গ্রহণ করা ব্যর্থ? দান করিলে স্বর্গস্থিত পুরুষেরাও যদি তৃপ্তিপ্রাপ্ত হয়, তবে যে সকল লোক প্রাসাদের উপরে থাকে, তাহাদের জন্য এখানে (অর্থাৎ নীচে) খাদ্য দেওয়া হয় না কেন?

"যতকাল বাঁচিবে, সুখে বাঁচিবে। ঋণ করিয়া ঘৃত পান করিবে, ভস্মীভূত দেহের আবার আগমন কোথায়?

"যদি এ (জীব) দেহ হইতে বহির্গত হইয়া পরলোকে গমন করে, তবে বন্ধুস্নেহে সমাকুল হইয়া আবার আগমন করে না কেন?

"অতএব ব্রহ্মণেরা ইহা জীবিকার উপায় করিয়াছেন যে, মৃত ব্যক্তিগণের প্রেতকার্য্য করিতে হইবে; নতুবা ইহার অপর কোন প্রয়োজন নাই।

"বেদের কর্ত্তা তিন জন—ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর; কেননা, 'জর্ভরী' 'তুর্ফরী' ইত্যাদি পণ্ডিতের কথা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।[৩] ইহাতে (বেদে) উক্ত হইয়াছে যে, (যজমান-) পত্নী * * * গ্রহণ করিবেন,[৪] (অতএব ইহা ধূর্ত্তের রচনা)। ভণ্ডেরাও সেইরূপ গ্রহণীয় উত্তম বস্তুসমূহকে (দেয় বলিয়া) পাঠ করিয়াছে, এবং নিশাচরগণকর্ত্তৃক মাংসভোজন উক্ত হইয়াছে।"

৩। অর্থাৎ যদি পণ্ডিতের কথা হইত তাহা হইলে ঐরূপ অপার্থক বাক্য বেদে প্রযুক্ত হইত না। শবরস্বামী বেদের অর্থবত্ত্বপ্রতিপাদনের সময় (মীমাংসাদর্শন, ১.২. ৩৮-৩৯) পূর্ব্বপক্ষের মধ্যে এই শব্দ দুইটির উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহার সমাধানও করিয়াছেন। 'জর্ভরী'-অর্থে 'ভর্ত্তারৌ', এবং 'তুর্ফরী'-অর্থে 'হন্তারৌ'। ইহা ঋগ্বেদে আছে।

৪। ইহা অতি-অশ্লীল। অশ্বমেধপ্রকরণে ইহার বিধান আছে। দ্রষ্টব্য—শতপথব্রাহ্মণ, ১৩. ৫. ২. ২ ইত্যাদি; তৈত্তিরীয়সংহিতা, ৭.৪.১৯; বাজসনেয়িসংহিতা, ২৩.১৮-৩২; কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র, ২০. ৬. ১৫ ইত্যাদি; আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র ২০.১৮।

নৈষধচরিতে (১৭শ সর্গে) এতাদৃশ বহু কথা আস্তিকবাদের বিরুদ্ধে বলা হইয়াছে।

উদ্ধৃত বাক্যাবলী হইতে নাস্তিকবাদের মত অনেকটা জানা গিয়াছে।

দার্শনিক মত

এখন নাস্তিকবাদের দর্শনাংশ লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য। এপর্য্যন্ত যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহাতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, নাস্তিকবাদে এই সমস্ত রহিয়াছে :—

১। (ক) বেদের প্রামাণ্য-অস্বীকার,
(খ) প্রচলিত অন্যান্য শাস্ত্রের ও
(গ) আশ্রমধর্ম্মের উল্লঙ্ঘন,
২। পরলোক-অস্বীকার,
৩। ঈশ্বর-অস্বীকার,
৪। দেহাত্মবাদ,
৫। সর্ব্বত্র সন্দিগ্ধতা, ও
৬। প্রত্যক্ষেরই একমাত্র প্রমাণতা।[৫]

দেখা যাউক এ বিষয়ে নাস্তিকবাদিগণের কিরূপ যুক্তি আমরা পাইয়া থাকি।

দেহাত্মবাদসম্বন্ধে তাঁহারা বলেন—চৈতন্যবিশিষ্ট এই দেহই আত্মা।

দেহাত্মবাদে যুক্তি

ইহা ভিন্ন অপর আত্মার অস্তিত্বে কোন প্রমাণ মানি না, এবং মানিবার কারণও দেখি না। পৃথিবী, জল, বায়ু ও অগ্নি এই চারি ভূত একত্র সংসৃষ্ট হইলে তাহাতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়। এক-একটি ভূতে পৃথক্-পৃথক্ চৈতন্য না থাকিলেও, তাহাদের সম্মিলনে চৈতন্য জন্মিতে পারে, যেমন মদ্যবীজ (কিণ্ব, যাহা হইতে মদ্য উৎপন্ন

৫। পূর্ব্বোক্ত রামায়ণ হইতে সঙ্কলিত অংশে—"প্রত্যক্ষং যৎ তদাতিষ্ঠ পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরু,"—অযোধ্যা, ১০৮.২৭।

হয়)-সমূহ পৃথক্-পৃথক্ থাকিলে তাহাতে মদশক্তি উৎপন্ন হয় না, কিন্তু তাহাদিগকে একত্র করিতে পারিলে মদশক্তি জন্মায়; ভূতসমূহ হইতে চৈতন্যের উৎপত্তিও সেইরূপ। দেহ আত্মা বলিয়াই আমরা বলিয়া থাকি—"আমি গৌর" বা "আমি কৃষ্ণ।" গৌর বা কৃষ্ণ কে? এই দেহই নহে কি? অতএব দেহই আত্মা।

বলিতে পারা যায় যে যদি দেহই আত্মা হয়, তবে "আমার দেহ" এই জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে? দেহই যদি "আমি" (আত্মা) হয়, তবে সে ওরূপ কথা বলিতে পারে না। ইহার উত্তর এই যে, সেখানে যদিও "আমি" ও "দেহে" বস্তুত কোন ভেদ নাই, তথাপি একটা কল্পিত ভেদ স্বীকার করিয়া ঐরূপ বলা হইয়া থাকে। যেমন রাহুর মস্তক; রাহু ত কেবল মস্তকমাত্র, সেখানে "রাহুর মস্তক" কিরূপে বলা চলে? আরও, তোমরা বলিয়া থাক "পুরুষের চৈতন্য;" বস্তুত যে পুরুষ সেই চৈতন্য, তবে কি প্রকারে তোমরা অভেদ স্থানেও এইরূপ ভেদ ব্যবহার করিয়া থাক? অতএব বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, তাদৃশ স্থলে ঔপচারিক বা কল্পিত ভেদ স্বীকার করিয়া ঐরূপ ব্যবহার করা হয়। "আমার শরীর" এই ব্যবহারও সেইরূপ ঔপচারিক।

নাস্তিকবাদীর পুরুষার্থ অর্থ ও কাম

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের বা পুরুষপ্রয়োজনের মধ্যে নাস্তিকবাদে অর্থ ও কামই পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য হয়। স্রক্‌চন্দন বনিতাদির সম্ভোগজনিত সুখের নামই কাম। যদিও এতাদৃশ সুখসম্ভোগে সময়ে সময়ে দুঃখসংযোগ আছে, তথাপি তাহা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। যেমন কেহ মৎস্য ভোজন করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার শল্ক (আঁস) কণ্টক-প্রভৃতি বর্জ্জনীয় অংশ বর্জ্জন করিয়া মাংসমাত্র গ্রহণ করে, অথবা যেমন কোন তণ্ডুলার্থী পলাল ও তুষ পরিহারপূর্ব্বক তণ্ডুল গ্রহণ করে,

সেইরূপ সুখার্থী ব্যক্তি সুখদুঃখমিশ্রিত বিষয় হইতে দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া সুখ গ্রহণ করিবে। দুঃখ আছে এই ভয়ে সুখকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ভিক্ষুক আসিতে পারে এই ভাবিয়া কি পাক করিবার জন্য হাঁড়ী চাপান হয় না? যদি কোন ভীরু দুঃখ দেখিয়া সুখকে পরিত্যাগ করে, তবে সে পশুর ন্যায় মূর্খ! দুঃখমিশ্রিত বলিয়া যে ব্যক্তি বিষয়সুখকে বর্জ্জনীয় মনে করে, তাহার তাহা মূর্খবিচার! কোন মঙ্গলার্থী ব্যক্তি তুষকণাচ্ছাদিত ধবলোত্তমতণ্ডুলশালী ব্রীহিসমূহকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে কি?

বেদের অপ্রামাণ্য

অগ্নিহোত্রাদি পারলৌকিক ফলপ্রদ কর্ম্মের কোন প্রামাণ্য নাই। ঐ সমস্তকর্ম্ম অনৃত, ব্যাঘাত ও পুনরুক্তাদি দোষে দুষ্ট। বিশেষত বৈদিকম্মন্য ধূর্ত্তবগণ পরস্পরই ঐ সমস্ত কার্য্যকে খণ্ডিত করিয়াছেন; জ্ঞানকাণ্ডবাদী কর্ম্মকাণ্ডকে, এবং কর্ম্ম-কাণ্ডবাদী জ্ঞানকাণ্ডকে নিন্দা করিয়াছেন। অতএব ঐ সকল শাস্ত্র সুন্দ-উপসুন্দ-নামক অসুরদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর যুদ্ধ করিয়া নিজেই পরাহত!

লৌকিক সুখ-দুঃখই স্বর্গ-নরক

অতএব শস্ত্র-ব্যাধি-কণ্টকবেধাদি-জন্য দুঃখই নরক; অপর কোন নরক নাই। সুমিষ্ট অন্নের ভোজন, সুন্দরী স্ত্রীর সম্ভোগ, সূক্ষ্মবস্ত্রের ধারণ ও সুগন্ধি স্রক্‌চন্দনাদির নিষেবণপ্রভৃতিই স্বর্গ।

ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও ঈশ্বরের অভাব, স্বভাববাদ

সুখ ও দুঃখ দেখিয়া তাহা দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম কল্পনা করিতে পারা যায় না। স্বভাববলেই লোক সুখী বা দুঃখী হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি ময়ূরকে চিত্রিত করে, কোন ব্যক্তিই বা কোকিলকে ঐরূপ মধুর কূজন করায়? স্বভাব ভিন্ন অপর কোন কারণ এখানে নাই।[৬] লোকপ্রসিদ্ধ রাজাই

৬। সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ, ২।

ঈশ্বর; অপর কোন ঈশ্বর নাই। এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? এবং কে বা এই জগৎকে এরূপ বিচিত্র করিল? ইহার মীমাংসার জন্যও ঈশ্বরকে স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই, কেননা, স্বভাবের দ্বারাই তাহা হইয়াছে। অগ্নি উষ্ণ, জল শীত, এবং বায়ুও শীতল, কে এই সমস্তকে বিচিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে? স্বভাব ভিন্ন আর কেহ নহে।

নাস্তিকগণ এইরূপে স্বকল্পিত ব্যবস্থার সমর্থনের জন্য প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুমান, শব্দ ইত্যাদি অন্যান্য প্রমাণকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বৈশেষিকদর্শন প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণ স্বীকার করে; সাঙ্খ্য প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি; ন্যায় প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ও উপমান এই চারিটি; এরূপ বিশেষ-বিশেষ দর্শনে অধিকাধিক প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। নাস্তিকবাদী দেখিলেন, তিনি যদি কোন প্রকারে অনুমানকে উড়াইয়া দিতে পারেন, তবে তাঁহার আর কণ্টক থাকিবে না, কেননা, আর আর প্রমাণের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তির প্রয়োজন হইবে, তাহা বৈশেষিকপ্রভৃতিই প্রদর্শন করিবেন; স্বয়ং তিনি কিছু না বলিলেও পারেন। এইজন্য নাস্তিকবাদিগণকে অনুমানেরই প্রামাণ্য খণ্ডন করিতে বিশেষ সচেষ্ট দেখা যায়। সংক্ষেপত এ সম্বন্ধে তাঁহারা এই বলেন যে, অনুমানে ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্যক, কিন্তু বস্তুত ঐ ব্যাপ্তিজ্ঞানই হইতে পারে না।

প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই

এ পর্য্যন্ত নাস্তিকবাদের যাহা আলোচনা করা গেল, তাহাতে ঐ মত অনুসরণ করিয়া চলিলে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতে হয়, এবং তাহা হইলে নাস্তিকের সুখের পথ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। বস্তুত একটা নিয়মের মধ্যে না থাকিলে অভীষ্ট বস্তু পাওয়া যাইতে পারে না। এই জন্য নাস্তিকবাদিগণ যদিও

নাস্তিকবাদে উচ্ছৃঙ্খলতা ও নীতিশাস্ত্র

বহুবিধ বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়াছেন, তথাপি একটি বন্ধন ছেদন করিতে পারেন নাই, তাহার নাম নীতিশাস্ত্র। নীতি অবলম্বন করিয়াই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা নাস্তিকের অভিমত।[৭]

গ্রীসেও এপিক্যুরসের প্রবর্ত্তিত নাস্তিকবাদের মধ্যে এই নীতিশাস্ত্রের স্থান বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এপিক্যুরস একস্থানে বলিয়াছেন—

"যে সর্ব্বসমক্ষে নিঃশঙ্কভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করে, সে সকলের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিবে। তাহাদের সহিত যাহাতে শত্রুতা না জন্মে এরূপ ভাবে যত্ন করিয়া চলিবে। যদি তাহাও সম্ভব না হয়, তবে অন্তত পক্ষে আত্মস্বার্থ বজায় রাখিয়া যতদূর সাধ্য তাহাদের সংস্রবে আসিবে না।" [৮]

কিন্তু এপিক্যুরস যতই কেন উপদেশ দিন না, তাহার পরবর্ত্তী আরিষ্টিপুস-প্রভৃতি নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভারতেও তাই; যদিও নাস্তিকবাদে নীতিশাস্ত্র অনুসরণীয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, তথাপি তাহার যে স্বাভাবিক উচ্ছৃঙ্খলতা, তাহা তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই, এবং করিতে পারে না।

'যতদিন বাঁচিবে সুখে বাঁচিবে'—ইহাই নাস্তিকের মূল উক্তি, এবং শারীরিক সুখকেই লক্ষ্য করিয়া ইহা উক্ত হয়। কেবল শারীরিক সুখকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য মনে করিলে যাহা হওয়া সম্ভব, এপিক্যুরসের তাহা

৭। "নীতিকামশাস্ত্রানুসারেণ অর্থকামাবেব পুরুষার্থৌ"—মাধবাচার্য্য।

৮। গ্রীক ও হিন্দু।

"কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যদণ্ডনীত্যাদিভির্বুধঃ।
দৃষ্টৈরেব সদোপায়ৈর্ভোগানমুভবেৎ ভুবি॥"

সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ, ২.১৫।

হইয়াছিল, এবং সেই জন্যই তিনি বলিতেন যে, যে-কোন উপায়ে সুখ বা প্রমোদ লাভ করাই পুরুষার্থ; এবং তাহা যদি কোন অপকৃষ্ট বা ঘৃণিত উপায়ে করিতে হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। তিনি আরও বলিতেন যে, শারীরিক সুখ মানসিক সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং শরীরিক দুঃখ মানসিক দুঃখ অপেক্ষা মন্দ। পৃথিবীতে সুখ ও দুঃখ, এই দ্বিবিধ পদার্থ আছে; যে-কোন দ্রব্য সুখজনক, লোকে তাহা আহরণ করিবে, এবং যাহা দুঃখজনক, তাহা পরিহার করিবে।

উচ্ছৃঙ্খলতা- ও যথেচ্ছাচারপ্রভৃতি-নিবারণের জন্যই নাস্তিকবাদিগণ নিয়ামকস্বরূপ নীতিশাস্ত্রকে অবলম্বনীয় করিয়াছেন; কিন্তু শারীরিকসুখ-লাভই যেখানে চরম পুরুষার্থ বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেখানে নীতিশাস্ত্র অধিকক্ষণ স্থান পাইতে পারে না। সুখার্থীকে নীতিশাস্ত্র মানিয়া সুখলাভ করিতে হইলে অবশ্য তাহাতে সুখলাভের কিছু ব্যাঘাত হইবে। একমাত্র শারীরিকসুখলাভই যখন পুরুষার্থ, এবং নীতিশাস্ত্র না মানিলেও যখন তাহা পাওয়া যাইতেছে, তখন তাদৃশসুখপ্রার্থীর নীতিশাস্ত্র অনুসরণ করিতে বোধ হয় প্রবৃত্তি হয় না, এবং তাহা না হইলে পশুস্বভাব প্রাপ্ত হইতে হয়। অতএব নীতিশাস্ত্রকে অনুসরণীয় বলিলেও নাস্তিক-বাদ বস্তুত তাহার অনুসরণ করিতে পারে না।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

ঈশ্বরবাদে পূর্ব্বমীমাংসা

বিভিন্ন বিভিন্ন দর্শনে ঈশ্বরের প্রয়োজন

আমাদের প্রসিদ্ধ ছয়টি দার্শনিকসম্প্রদায়ের মধ্যে বৈদান্তিক ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ের ঈশ্বর স্বীকার করিবার দুইটি প্রয়োজন দেখা যায়; প্রথম, জগতের উৎপত্তিসমর্থন; * দ্বিতীয়, বেদের প্রামাণ্যরক্ষা। † নৈয়ায়িকেরা বেদের প্রামাণ্যরক্ষার জন্য ঈশ্বর স্বীকার করেন না, জগৎ নির্ম্মাণ করিবার জন্য। ‡ পাতঞ্জলমতে পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজনদ্বয়ের একটিও নহে, কিন্তু সমাধিসাধনের জন্য। § কাপিল বা সাঙ্খ্যবিদ্‌গণের মতে ঈশ্বরসিদ্ধির প্রমাণই পাওয়া যায় না। ** পূর্ব্বমীমাংসকমতে ঈশ্বরের কোন প্রমাণ নাই, এবং তাঁহার কোন প্রয়োজনও নাই।

---

* "জন্মাদস্য যতঃ", বেদান্তদর্শন, ১. ১. ২; ও, বৈশেষিকদর্শনের প্রশস্তপাদকৃত ভাষ্যের সৃষ্টিসংহারপ্রক্রিয়া দ্রষ্টব্য।

† "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ", বেদান্তদর্শন, ১. ১. ৩; "তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্‌", বৈশেষিক-দর্শন, ১. ১. ৩।

‡ 'আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ", (ন্যায়দর্শন, ১. ১. ৭) এই সূত্র দ্বারা আপ্তোপ-দেশ হেতুই শব্দের প্রামাণ্য, ইহা বুঝা যাইতেছে; "মন্ত্রায়ুর্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্য-মাপ্তপ্রামাণ্যাৎ", (ন্যায়দর্শন ২. ১. ৬৮) এই সূত্র দ্বারাও ঐ কথা পাওয়া যাইতেছে। "আপ্তাঃ খলু সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণঃ"—বাৎস্যায়নের এই কথায় ঋষিরাই 'আপ্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। অতএব এই ঋষিরা উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া বেদের প্রামাণ্য। পূর্ব্বোক্ত সূত্রদ্বয়ের বাৎস্যায়নভাষ্য দ্রষ্টব্য।

"ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ", "তৎকারিতত্বাদহেতুঃ" ইত্যাদি (ন্যায়দর্শন, ৪. ১. ১৯—২১) সূত্রে ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

§ "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্‌ বা", পাতঞ্জলদর্শন, ১. ২৩; "শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণি-ধানানি নিয়মাঃ", ঐ ২. ৩২

** "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ", "মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ" ইত্যাদি (সাঙ্খ্যদর্শন ১. ৯২—৯৫) সূত্র দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বমীমাংসকগণ কোন যুক্তি- ও তর্ক-বলে ঈশ্বরের অপলাপ করিয়াছেন, দর্শনপ্রিয় পাঠকগণের কৌতূহলনিবারণ জন্য, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই নাতিবিস্তররূপে নিবদ্ধ হইবে।

মীমাংসাদর্শনে ঈশ্বরস্বীকার

ঐ সমস্ত যুক্তিতর্ক-প্রদর্শনের পূর্ব্বে আমাদিগকে সংক্ষেপে একটি কথার আলোচনা করিয়া লইতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, মীমাংসকেরা ঈশ্বর স্বীকারই করিয়া থাকেন, অস্বীকার করেন না।

লৌগাক্ষিভাস্করবিরচিত মীমাংসার্থসংগ্রহে লিখিত আছে—

"ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণস্তু (ধর্ম্মঃ) নিঃশ্রেয়সহেতুঃ।"

আপোদেবপ্রণীত মীমাংসান্যায়প্রকাশেও এই কথাই আছে—

"শ্রীগোবিন্দার্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণস্তু (ধর্ম্মঃ) নিঃশ্রেয়সহেতুঃ।"

পূর্ব্বস্থলীর স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় ইহাই অবলম্বন করিয়া এবং জৈমিনিসূত্রে ও শবরকৃত ভাষ্যে স্পষ্টবাক্যে ঈশ্বরপ্রত্যাখ্যান দেখিতে না পাইয়া স্বকৃত মীমাংসার্থন্যায়প্রকাশ-টীকায় মীমাংসকমতেও ঈশ্বর স্বীকৃত হয় বলিয়াছেন।

ঐ মতের খণ্ডন

অন্য পক্ষে আমরা বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাই, বাদরায়ণ প্রথমে "ফলমত উপপত্তেঃ" (২. ২৮.) এই সূত্রদ্বারা "ঈশ্বরই কর্ম্মফলদাতা"—নিজের এই মত সংস্থাপিত করিয়াছেন; তদনন্তর "কর্ম্মই কর্ম্মের ফলদান করে, ঈশ্বর নহেন"—জৈমিনির এই মত "ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব" (৩. ২. ৪০.) এই সূত্র দ্বারা উত্থাপিত করিয়া "পূর্ব্বং তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ" (৩. ২. ৪১.) এই সূত্রে যুক্তি দ্বারা খণ্ডিত করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, জৈমিনি ঈশ্বর স্বীকার করেন না। শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত ব্যাসসূত্রগুলির ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্যান্য

উপনিষদের ভাষ্যেও তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, মীমাংসকেরা ঈশ্বর-স্বীকার করেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপে বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ উপস্থিত করিতে পারা যায় ; যথা—

"তথাচ ন্যায়বিদঃ সাঙ্খ্যমীমাংসকাদয়োঽসংসারিণঃ (ঈশ্বরস্য) অভাবং যুক্তিশতৈঃ প্রতিপাদয়ন্তি।" দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম ব্রাহ্মণ।

শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভৃতি পুরাণ হইতেও এ কথা প্রমাণিত করিতে পারা যায়। ব্যঙ্কটাধ্বরিকৃত বিশ্বগুণাদর্শেও এই মত দেখা যায়। বাহুল্যভয়ে আমরা সে সমস্ত উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

প্রাচীন মীমাংসকগণের মত

এদিকে প্রাচীন-প্রাচীন মীমাংসকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদের মতে ঈশ্বর নাই বলিয়াই উত্তর পাই। কুমারিল-ভট্টের শ্লোকবার্ত্তিকে ও পার্থসারথিমিশ্রের শাস্ত্রদীপিকায় ঈশ্বরের অভাববিষয়ে বহু যুক্তি ও তর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে আমরা প্রধানত এই দুই গ্রন্থ হইতেই তাহা উদ্ধৃত করিব। শবরস্বামী স্পষ্টবাক্যে "ঈশ্বর নাই" এ কথা না বলিলেও বলিয়াছেন—

"তস্মাৎ (পূর্ব্বপ্রদর্শিতাৎ) কারণাদবগচ্ছামো ন কৃত্বা সম্বন্ধং ব্যবহারার্থং কেনচিদ্-বেদাঃ প্রণীতা ইতি।"

'সেইজন্য আমরা জানিতেছি যে, ব্যবহারসিদ্ধির জন্য শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ করিয়া কেহ বেদসকল প্রণয়ন করে নাই।'

বৈদান্তিকপ্রভৃতি দার্শনিকের মতে বেদ নিত্য নহে, তাহা ঈশ্বরনামে প্রসিদ্ধ পরমপুরুষ দ্বারা বিরচিত। শবরস্বামী পূর্ব্বোক্ত কথা দ্বারা তাহাই খণ্ডিত করিয়া বলিয়াছেন যে, বেদ কেহ রচনা করে নাই। হিন্দুদার্শনিক-গণ প্রধানত দুই কারণে ঈশ্বর স্বীকার করেন ; প্রথম জগৎসৃষ্টি, দ্বিতীয় বেদপ্রণয়ন। মীমাংসকেরা সৃষ্টিপ্রলয় স্বীকার করেন না, সুতরাং সেজন্য ঈশ্বরের অপেক্ষা নাই ; বেদও তাঁহাদের মতে নিত্য (নিম্নে কিঞ্চিৎ যুক্তি

প্রদর্শিত হইবে), অতএব সেজন্যও ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। জৈমিনিও "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বেদের নিত্যত্ব স্থাপন করিয়া ভঙ্গীতে ঈশ্বরকে স্বীকার করেন নাই। কুমারিলভট্টপ্রভৃতি বেদের এই নিত্যত্ব আরও বিশদরূপে স্থাপন করিতে গিয়া সূত্রকার ও ভাষ্যকারের সূচিত ঈশ্বরাভাব যুক্তি দ্বারা সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

লৌগাক্ষিভাস্কর ও আপোদেবের উদ্ধৃত বাক্যদ্বয়ের এই তাৎপর্য্য যে, কামনাপূর্ব্বক ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে তাহা দ্বারা সংসারবন্ধন এবং কামনাশূন্য হইয়া অনুষ্ঠান করিলে তাহা মুক্তির জন্য হয়। বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—

"প্রার্থ্যমানং ফলং জ্ঞাতং ন চানিচ্ছোর্ভবিষ্যতীতি।"

মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিক, সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার, ১১১ শ্লোক।

পার্থসারথিমিশ্রও তাঁহার ন্যায়রত্নে নিম্নলিখিত গীতার বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহার সমর্থন করিয়াছেন—

"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ", ইত্যাদি।

এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা আমরা প্রবন্ধের উপসংহারে বলিব। ঈশ্বরের কথা মীমাংসাদর্শনে এই প্রসঙ্গে উঠিয়াছে :—অগ্নিহোত্রাদি যাগ ধর্ম্ম ও হিংসাদি অধর্ম্ম, ইহা কেবল বেদই আমাদিগকে বলিয়া দিতে পারেন। অতএব ধর্ম্মাধর্ম্মে বেদই একমাত্র প্রমাণ, অন্য প্রমাণের এখানে গতি নাই। বেদার্থমীমাংসার জন্যই জৈমিনীয়দর্শনের উৎপত্তি, অতএব বেদের প্রামাণ্যেই এই দর্শনের প্রামাণ্য। বেদের প্রামাণ্য না থাকিলে জৈমিনীয়দর্শনেরও প্রামাণ্য থাকিবে না। এই-জন্য পরমর্ষি জৈমিনি "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" (মীমাংসাদর্শন,১.১.২) এই সূত্রে 'এক বেদই ধর্ম্মে প্রমাণ' ইহা সামান্যরূপে বলিয়া ও "তস্য নিমিত্ত-পরীষ্টিঃ" (১. ১. ৩.) এই সূত্রে 'বেদই যে ধর্ম্মে প্রমাণ, তাহা পরীক্ষা করিয়া

মীমাংসাদর্শনে বেদের প্রামাণ্যে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ

দেখা উচিত' ইহা কহিয়া "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ" ইত্যাদি (১.১.৪) সূত্রদ্বারা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া অব্যাহতরূপে বেদের প্রামাণ্য রক্ষা করিয়াছেন; এবং ইহার মধ্যে শব্দের সহিত অর্থের নিত্যসম্বন্ধ স্থাপন করিতে যাইয়া ঈশ্বরকেও অসিদ্ধ করিয়াছেন।

শব্দার্থের সম্বন্ধ ও জগৎসৃষ্টির কর্তা

মীমাংসকদিগের অভিপ্রায় এই—শব্দ উচ্চারণ করিলে অর্থের জ্ঞান হয়, অতএব শব্দ জ্ঞাপক ও অর্থ জ্ঞাপ্য। সুতরাং শব্দ ও অর্থের মধ্যে জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকলক্ষণ সম্বন্ধ। এখন দেখিতে হইবে, শব্দার্থের এই সম্বন্ধটিকে কোন পুরুষে স্থাপিত করিয়াছে কি না?—অর্থাৎ তাহা পুরুষকৃত—পৌরুষেয়, বা স্বাভাবিক? শব্দার্থের এই তত্ত্বটি নির্ণীত হইলে বেদেরও প্রামাণ্য-অপ্রামাণ্য নিশ্চিত হইবে; কেননা, বেদ শব্দময়, অর্থের সহিত ঐ শব্দের সম্বন্ধ আছে। এখন এই সম্বন্ধ যদি পুরুষকৃত—পৌরুষেয় হয়, তবে পুরুষের স্বভাবসুলভ ভ্রমপ্রমাদাদি দোষের সম্ভাবনা থাকায় বেদের প্রামাণ্য নিরবদ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। অতএব ঐ সম্বন্ধটি পৌরুষেয় কি স্বাভাবিক—অপৌরুষেয়, তাহার নির্ণয় আবশ্যক। এখন যদি ঐ সম্বন্ধটিকে পৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে সেই সম্বন্ধকারী পুরুষ সাধারণ মানব হইতে পারেন না, এইজন্য কোন প্রকারে ঈশ্বরকে স্বীকার করিলেও করিতে পারা যাইত; কিন্তু বস্তুত তাহা নহে, শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ অপৌরুষেয়—স্বাভাবিক—নিত্য; বেদের সহিত তদর্থের সম্বন্ধও এই প্রকার, ইহা ইচ্ছা না থাকিলেও বাধ্য হইয়া সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য ঈশ্বর স্বীকার করিতে পারা যায় না। তাহার পর, জগতের সৃষ্টিকর্তৃরূপেও ঈশ্বর থাকিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাও হইতে পারে না; কেননা, সৃষ্টি বা প্রলয় নামে কিছু আছে বলিয়া কোন প্রমাণ নাই।

এ স্থানে আপত্তি উঠিতে পারে—শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ যদি স্বাভাবিক হয়, তবে শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্রই সকল শব্দের অর্থপ্রতীতি হওয়া আবশ্যক; কিন্তু বস্তুত তাহা হয় না; শব্দ উচ্চারিত হইলেও, অনেক সময়ে অর্থবোধ হয় না। তার পর দেখিতে পাওয়া যায়, বক্তা যদি বলিয়া দেয়—অমুক শব্দের অমুক অর্থ, তখন অর্থবোধ হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, বক্তা শব্দের সহিত স্বয়ং অর্থের সম্বন্ধ করিয়া ঐ শব্দ উচ্চারণ করে। অতএব শব্দার্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিক হইতে পারে না।

শব্দার্থের সম্বন্ধ নিত্য

ইহার উত্তরে বলা যায়—'অমুক শব্দের অমুক অর্থ' ইহা বলিয়া বক্তা স্বয়ং শব্দার্থের সম্বন্ধ করে না; কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধ সম্বন্ধকে বলিয়া দেয় মাত্র। এইজন্যই, যদি কেহ গো-পদের অর্থ অশ্ব বলিতে চান, তবে তাঁহাকে অপর ব্যক্তি নিষেধ করিয়া বলে—'না, গো-পদের অর্থ অশ্ব নহে।' যদি পুরুষ স্বয়ং শব্দার্থের সম্বন্ধকর্ত্তা হইত, তবে সে যে পদের যে অর্থ বলিত, সে পদের তাহাই অর্থ হইত। এই নিয়মানুসারে গো-পদের অশ্বও অর্থ হইতে পারে; কিন্তু বস্তুত তাহা হয় না। শব্দার্থসম্বন্ধ স্বাভাবিক হইলেও কখন-কখন উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গেই শব্দের অর্থবোধ না হইতেও পারে; কারণ শব্দার্থ সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়াই অর্থের বোধ উৎপাদন করে; যতক্ষণ ঐ সম্বন্ধ জ্ঞাত না হয়, ততক্ষণ অর্থবোধ হয় না। অতএব যে ব্যক্তি যে শব্দের সহিত তদর্থের সম্বন্ধ জানে না, তাহার সেই শব্দের যে অর্থবোধ হইবে না, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

আর এক কথা। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের মধ্যে এতাদৃশ কোন কাল নাই, যখন কোন শব্দের সহিত তদর্থের সম্বন্ধ ছিল না। যদি তোমার মতে থাকে, তবে তোমারই অভিলষিত শব্দার্থের সম্বন্ধকরণ হইতে পারে

না। কেননা, যখন কেহ কোন শব্দের সহিত কোন অর্থের সম্বন্ধ করিবে তখন তাহাকে অবশ্যই ঐ সম্বন্ধ কোন শব্দ দ্বারা করিতে হইবে;—সে কোন শব্দ উচ্চারণ না করিয়া কাহাকেও বলিয়া দিতে পারিবে না যে, অমুক শব্দের অমুক অর্থ। এখন এই সম্বন্ধকারী পুরুষ যে শব্দ দ্বারা একটি শব্দের সহিত একটি অর্থের সম্বন্ধ করিল, সেই শব্দটির সহিত তাহার অর্থের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা করিবার জন্য অবশ্য একটি শব্দ উচ্চারিত হইয়াছিল; আবার এই শব্দের অর্থসম্বন্ধ করিতে আর একটি শব্দ আবশ্যক হইয়াছিল; এইরূপ বলিলে অনবস্থাদোষ আসিয়া পড়ে—একটির পর একটি, তার পর অন্যটি, এইরূপে আমরা কোন প্রকারেই কোন একটি শেষস্থানে উপস্থিত হইতে পারি না। এই দোষ নিবারণের জন্য স্বীকার করিতে হইবে যে, শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিক। এ বিষয়ে কুমারিলভট্ট শ্লোকবার্ত্তিকের 'সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার'-নামক অংশে বহুপ্রকার বিচারভঙ্গী প্রদর্শন করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনাবশ্যকবোধে আমরা সে সমস্ত প্রদর্শন না করিয়া, কেবল ঐ সম্বন্ধ যে ঈশ্বরকৃত নহে, তাহাই উদ্ধৃত করিব; কেননা, এই প্রসঙ্গেই ঈশ্বরের সদ্ভাব নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ঈশ্বরবাদিগণ বলেন—সৃষ্টির আদিসময়ে ভগবান্ সর্ব্বস্রষ্টা প্রজাপতি স্থাবরজঙ্গমরূপ জগৎ ও ধর্ম্মাধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া ব্যবহারসিদ্ধির জন্য শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধ স্থাপনপূর্ব্বক ঐ সমস্ত কৃতসম্বন্ধ শব্দ দ্বারা বেদ রচনা করিয়া মরীচিপ্রভৃতিকে প্রদান করেন।

জগতের সৃষ্টি অসম্ভব

"প্রজাপতির্বা ইদমেক এবাগ্র আসাৎ;" "প্রজাপতির্বেদানসৃজৎ" ইত্যাদি।

মীমাংসকগণ ইহার উত্তরে বলেন—সৃষ্টির 'আদিমসময়' নামে কোন সময় আছে বলিয়া কল্পনাই করিতে পারা যায় না, তাহার নির্ণয় ত দূরের

কথা! তুমি যে সর্বস্রষ্টা প্রজাপতির উল্লেখ করিতেছ, সে সময়ে তিনি কোথায় ছিলেন? তাঁহার আধার কি ছিল? তখনও ত পৃথিবীপ্রভৃতির সৃষ্টি হয় নাই,—যাহাতে তিনি থাকিতে পারিতেন। সে সময়ে তাঁহার আকৃতিই বা কিরূপ ছিল? তিনি অশরীর, এ কথা বলিতে পার না; কেননা, তাহা হইলে সৃষ্টির ইচ্ছায় তাঁহার প্রযত্ন হইতে পারে না। তিনি সশরীর, এ কথাও বলিতে পারা যায় না; কেননা, শরীর ভৌতিক ও ভূতগণের (পৃথিব্যাদির) তখনও সৃষ্টি হয় নাই।

সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়াবস্থা, এই প্রলয়ে তোমরা সমস্ত বস্তুরই অভাব স্বীকার কর। এখন বল, সেই সময়ে যে প্রজাপতি বিদ্যমান ছিলেন, ইহা কে জানিল,—যে ব্যক্তি অন্যকেও ঐ কথা বলিয়া দিতে পারে? ইহার সদুত্তর না পাইলে নিশ্চয় করা যায় না যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রজাপতি ছিলেন। তাহার পর, প্রলয়ে যদি কিছুই না থাকে, তবে প্রজাপতির জগন্নির্ম্মাণে ইচ্ছাই হইতে পারে না; যেহেতু যাহার সাহায্যে তিনি জগৎ নির্ম্মাণ করিবেন, প্রলয়ে তাহার কিছুই নাই; দেখিতে পাওয়া যায়, সহায়-সাধন থাকিলেই লোকে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, না থাকিল হয় না। তুমি এ কথা বলিতে পার না যে, ভগবানের ইচ্ছাতেই জগতের সৃষ্টি হইয়া যাইবে, তাঁহার আবার প্রবৃত্তির আবশ্যকতা কি। ঈশ্বর যখন শরীরহীন, তখন যে তাঁহার ইচ্ছাই হইতে পারে না; শরীর থাকিলেই ইচ্ছা হয়, অন্যথা হয় না। তুমি যদি আবার বল—ঈশ্বরের শরীর আছে; তাহা হইলেও তোমার নিস্তার নাই। তুমি উত্তর দাও—যে শরীর গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর সশরীর হইলেন, তাঁহার সেই শরীরের নির্ম্মাতা কে? তিনি নিজেই তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না; কেননা, নিজের শরীর নিজে নির্ম্মাণ করিতে পারা যায়, ইহা আমরা কোথাও দেখি নাই, আর তার প্রমাণও নাই। যদি বল, ঈশ্বরের ঐ

শরীর আর কেহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তবে এই নির্ম্মাতার শরীরকে কে উৎপাদিত করিল, এবং সেই উৎপাদয়িতার শরীরের কে স্রষ্টা হইল? এইরূপে অনন্তকাল চলিলেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে না।

স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, এই সংসার দুঃখজালাপূর্ণ। অন্যপক্ষে তোমরা বলিয়া থাক, ঈশ্বর পরমকরুণাকর। যদি সত্য-সত্যই ঈশ্বর করুণার্দ্র হন, তবে তিনি সংসারকে প্রাণীদের দুঃখপ্রদ করিয়া সৃষ্টি করিলেন কেন? অতএব বলিতে হয়, তিনি নির্দ্দয়। জীবের কর্ম্মরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মও সে সময়ে ছিল না, যাহার অনুসরণে সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর নিজের ঐ নির্দ্দয়ত্বরূপ দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন। অতএব তোমরা যে বলিয়া থাক, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সাধন গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর জগন্নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন, তাহাও হইতে পারে না; কেননা, সে সময়ে ধর্ম্মাধর্ম্মই থাকে না। উর্ণনাভিও নিঃসাধন হইয়া স্বকোশনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয় না, ক্ষুদ্রজন্তু-ভক্ষণজনিত প্রবর্ত্তমান লালাই তাহার সাধন হয়।

তুমি এ কথাও বলিতে পার না যে, অনুকম্পা করিয়া ঈশ্বর জগৎসৃষ্টি করেন, কারণ সে সময়ে অনুকম্পাপাত্রেরই অভাব। দুঃখদর্শন করিলে অনুকম্পা হয়, কিন্তু সে সময়ে মুক্তপুরুষগণের ন্যায় শরীরহীন আত্মার দুঃখই থাকে না, যাহা দেখিলে অনুকম্পা হইতে পারে। যদি বল—সৃষ্টির আদিকালে যেমন দুঃখের অভাব আছে, তদ্রূপ সুখেরও অভাব আছে, ঐ সুখের অভাব দেখিলে অবশ্যই ঈশ্বরের অনুকম্পা হইতে পারে; তবে আমরা বলিব—তাহা হইলে অনুকম্পাপ্রবৃত্ত ঈশ্বর সমস্ত সংসারকে সুখময় করিয়া সৃষ্টি করিতেন, দুঃখের লেশও থাকিত না; কিন্তু বস্তুত তাহা হয় নাই। ইহাও বলিতে পারা যায় না যে, দুঃখ বিনা সুখকে কোনরূপেই সৃষ্টি করিতে পারা যায় না, তাই ঈশ্বর দুঃখেরও সৃষ্টি

করিয়াছেন ; কেননা, যাঁহার নিখিল সাধন-সহায় স্বায়ত্ত, তাঁহার পক্ষে কোন কর্ম্ম দুষ্কর হয় বলিয়া সম্ভব হইতে পারে না। আর যদি ঈশ্বরকেও অন্য স্থান হইতে সাধনসংগ্রহ করিতে হয়, তবে বলিতে হইবে আমাদের ন্যায় তিনিও পরাধীন।

ঈশ্বরবাদিগণকে একটি প্রশ্ন করিতেছি, তাঁহারা উত্তরপ্রদান করুন— সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরের কোন প্রয়োজনটি অসিদ্ধ ছিল, যাহা তিনি সৃষ্টি করিয়া পূর্ণ করিলেন ? সকলেই জানেন—

"প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে।" শ্লোকবার্ত্তিক।

ঈশ্বরপ্রবৃত্তি জগন্নির্ম্মাণে কোন প্রয়োজনকে অনুসরণ করে নাই, ইহা বলিতে পারা যায় না। কারণ তাহা হইলে বলিতে হইবে, অচেতন হইতে ঈশ্বরের কোন ভেদ নাই। তোমরা বলিয়া থাক,—ভগবান্ লীলান্যায়ে জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাও সঙ্গত হয় না। লীলা হইলেও তাহা বিনোদনসুখের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। তোমাদের মতে ঈশ্বর পূর্ণকাম, পূর্ণসুখ ; এখন বল—যদি ঈশ্বর লীলাখেলার জন্যই জগন্নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তবে জগন্নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ঈশ্বরের তাদৃশ লীলাজন্য সুখের অভাব ছিল, যাহা তন্নির্ম্মাণের পরে পূর্ণ হইল। ইহা তোমাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয় কি না ? স্বীকার করিলেই তোমরা যে, ঈশ্বরকে পূর্ণকাম, পূর্ণসঙ্কল্প বল, তাহা মিথ্যা হইয়া যায়। আরও লীলাখেলা স্বল্পমাত্রায় হইলেই তাহা প্রীতিকর হয়, কিন্তু এই ভূধরসমুদ্রাদিসৃষ্টিরূপ মহাব্যাপার লীলাখেলা না হইয়া বরং তাঁহার প্রভূত কষ্টই উৎপাদন করে, সুখের কথা ত দূরে !

এইরূপে যেমন জগতের সৃষ্টি সম্ভাবিত হয় না, প্রলয় বা সংহারেও তদ্রূপ কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। কিজন্য ঈশ্বরের সংহারে ইচ্ছা হইবে, বুঝা যায় না। পরমেশ্বর সকরুণ, তাঁহার

জগতের প্রলয়ও অসম্ভব

সমস্ত কার্য্যই করুণানিমিত্ত, অতএব সংহারও তাঁহার করুণানিমিত্ত,—ইহা বলিতে পার না। সৃষ্টি ও সংহার দুইটি পরস্পরবিরুদ্ধ কার্য্য, ইহারা করুণারূপ এককারণে উৎপন্ন হইতে পারে না।

ঈশ্বরখণ্ডনের অপর যুক্তি

আরও, সংহারসময়ে কোন ব্যক্তি কি জীবিত থাকে, যে অন্যকে শুনাইতে পারে যে, ঈশ্বর সংহার করিয়াছেন? তুমি বলিতে পার—সৃষ্টির অনন্তরই উৎপন্ন পুরুষ যেমন পুরুষান্তরকে দেখিতে পায়, সেইরূপ ঈশ্বরকেও সে দেখিতে পারে, সেই ব্যক্তিই ঈশ্বরের কার্য্য অন্যকে বলিতে পারে। কিন্তু ইহা যুক্তিযুক্ত নয়; সে সময়ে ঐ ব্যক্তি ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলেও, ঈশ্বর যে তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, তাহা সে দেখিতে পায় না; নিজের জন্ম নিজে দেখা যায় না। যখন ঐ ব্যক্তি নিজের জন্মবৃত্তান্তই জানিতে পারে না, তখন যে জগতের জন্ম জানিবে না, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যদি বল ঈশ্বরের বাক্যে সে জানিতে পারিবে যে, তিনি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাও হইতে পারে না; যদি ঈশ্বর তাহাকে বলিয়া দেন যে, 'আমি তোমাকে উৎপাদিত করিয়াছি,' তবে ঈশ্বরের নিজের ঐশ্বর্য্য নিজে প্রকাশ করা হইবে। যে ব্যক্তি নিজের ঐশ্বর্য্য এইরূপে প্রকাশ করে, তাহার কথায় বিশ্বাস কি? বেদবাক্য দ্বারাও তাঁহার জগৎসৃষ্টিকারিত্ব জানা যায় না। সত্য কথা বেদে দেখিতে পাওয়া যায়—

"প্রজাপতির্বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, সোঽকাময়ত প্রজাঃ পশূন্ সৃজেয়, ততো বৈ স প্রজাঃ পশূনসৃজৎ" ইত্যাদি।

কিন্তু আমরা বলি—বেদ প্রজাপতি-বিরচিত কি না? যদি হয়, তবে প্রজাপতির কথায় বিশ্বাস কি?—যিনি স্বয়ং নিজের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন! আর যদি তিনি বেদ রচনা না করিয়া থাকেন, তবে বেদের

নিত্যত্ব আসিয়া পড়ে। তাহা হইলে যে বেদ সৃষ্টির পূর্ব্বেও ছিল, তাহাতে "প্রজাঃ পশূনসৃজৎ" ইত্যাদি সৃষ্টিবিষয়ক যে সকল কথা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে কিরূপে বেদের প্রামাণ্য রক্ষিত হইবে? এইজন্য তাদৃশ বচন-সমূহের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করা চলে না। ইহাদের তাৎপর্য্য অন্যত্র; ইহারা বস্তুত সৃষ্টি বা প্রলয় প্রকাশ না করিয়া বিদ্যান্তরের প্ররোচনামাত্র উৎপাদন করে। শ্রুতি, স্মৃতি ও ইতিহাসে ও প্রলয়ের প্রসিদ্ধি থাকিলেও, ঐ প্রসিদ্ধি বাধিত হয়। যে সকল প্রসিদ্ধি প্রমাণমূলক, তাহাদের বাধ হয় না। কিন্তু সৃষ্টিসংহারবিষয়ক প্রসিদ্ধি তাদৃশ নহে। অর্থবাদবাক্যের স্তুতিতেই তাৎপর্য্য,—যথাশ্রুত অর্থের প্রামাণ্য নাই; তাহারা কোন প্রস্তুত বিষয়ের নিন্দা-বা প্রশংসা-মাত্র প্রকাশ করে।* এতাদৃশ কতকগুলি অর্থ-বাদবাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারাতেই সৃষ্টি ও সংহার বস্তুত আছে বলিয়া লোকের বুদ্ধিবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। গ্রন্থের পৌর্ব্বাপর্য্য আলোচনা না করিলে এরূপ ভ্রম অতিসুলভ। মহাভারতপ্রভৃতিতেও

সৃষ্টি ও প্রলয়ের বিভিন্ন ব্যাখ্যা

* বেদবাক্য পঞ্চধা বিভক্ত, যথা, বিধি, নামধেয়, নিষেধ ও অর্থবাদ। অর্থবাদ দ্বিবিধ বিধিশেষ ও নিষেধশেষ। বিধিশেষ অর্থবাদ বিধেয় বস্তুর স্তুতি, এবং নিষেধশেষ অর্থবাদ নিষিদ্ধ বস্তুর নিন্দা প্রকাশ করে। যথা—"বায়ব্যং শ্বেতমালভেত"—[বায়ুদেবতার জন্য শ্বেত (ছাগল) বধ করিবে]—এই বিধিবাক্যের শেষে অর্থবাদ পঠিত হইয়াছে—"বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা, বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি, স এনং ভূতিং গময়তি"—(বায়ু অতি ক্ষিপ্রগামিনী দেবতা, শ্বেতালম্ভনকারী স্বভাগ্যে বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, বায়ু তাহাকে ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন)। এই অর্থবাদবাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য যে, যেহেতু বায়ুদেবতা শীঘ্র ফলপ্রদান করেন, তজ্জন্য তাঁহার উদ্দেশে শ্বেত ছাগলের আলম্ভন প্রশস্ত। ঐ অর্থবাদবাক্যের যথাশ্রুত অর্থের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় না। বিধি-বাক্যের সহিত ঐক্যসমাধান করিয়া উহাদের প্রামাণ্য রক্ষিত হয়।

ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি শিক্ষা দিবার জন্য সৃষ্টিসংহারের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে ; বস্তুত সৃষ্টি-সংহার নামে কিছু নাই।—

"স্তুতিবাক্যকৃতশ্চৈব জনানাং মতিবিভ্রমঃ।
পৌর্ব্বাপর্য্যাপরামৃষ্টঃ শব্দোঽন্যাং কুরুতে মতিম্॥ ৬৩॥
উপাখ্যানাদিমাত্রেণ বৃত্তির্বেদবদেব নঃ।
ধর্ম্মাদৌ ভারতাদীনাং ভ্রান্তিস্তেভ্যোঽপাতো ভবেৎ॥ ৬৪॥
আখ্যানানুপযোগিত্বাৎ তেষু সর্ব্বেষু বিদ্যতে।
স্তুতিনিন্দাশ্রয়ঃ কশ্চিদ্ বেদস্তচ্চোদিতোঽপি বা॥" ৬৫॥

শ্লোকবার্ত্তিক. সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার।

যদি বল আমাদের এই সৃষ্টিপ্রলয়প্রবাহ অনাদি, বেদ প্রতিসৃষ্টিতে ভিন্ন হইলে প্রবাহরূপে তাহাও অনাদি, ঈশ্বরও অনাদি, সৃষ্টিকালে পরমাণু থাকায় জগতের উপাদানেরও অভাব নাই, অতএব সৃষ্টি হইতে পারে ; তবে আমরাও বলি—লোকে যেরূপ সৃষ্টিপ্রলয় দৃষ্ট হয়, সেইরূপেই কল্পনা করা উচিত। প্রতিক্ষণেই কিছু উৎপন্ন হইতেছে,—ইহাই সৃষ্টি ; প্রতিক্ষণেই কিছু বিলীন হইতেছে,—ইহাই প্রলয়। যুগপৎ সমস্ত সৃষ্ট বা বিলীন হয় বলিয়া কল্পনা করিলে তাহা দৃষ্টানুসারী হয় না। সর্ব্বোচ্ছেদরূপ প্রলয়ে কোন প্রমাণ নাই। ঈশ্বরের যে তাহার দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রলয়ে সমস্ত পদার্থের অভাব বলিয়া তখন আত্মার কোনরূপ সুখদুঃখভোগ হইতে পারে না, বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কেননা, আত্মার ভোগহীন স্থিতি যুক্তিযুক্ত হয় না। এক-এক আত্মার পূর্ব্বপূর্ব্বানুষ্ঠিত বহু কর্ম্ম থাকিতে পারে ; তাহাদের মধ্যে যখন একটি কর্ম্মের ফল প্রবৃত্ত হয়, তখন অপর কর্ম্মফল নিরুদ্ধ থাকে ;— অর্থাৎ ঠিক সেই সময়েই অপর একটি কর্ম্ম ফল প্রসব করে না। কিন্তু প্রলয়াবস্থায় কর্ম্মফল কেন যে নিরুদ্ধ হইয়া থাকিবে,

তাহার কারণ পাওয়া যায় না। ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেই যে ঐ সমস্ত কর্ম্মফল নিরুদ্ধ থাকিবে, তাহাও সঙ্গত নহে। প্রলয়কালে সর্ব্বকর্ম্মের ফলের অনুপভোগ কোন কর্ম্মেরও ফল নহে। এমনও কোন প্রমাণ নাই যে, সে সময়ে সমস্ত কর্ম্মই বিনষ্ট হয়। যদি সত্যসত্যই বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে পুনর্ব্বার সৃষ্টির আশা পরিত্যাগ করিতে হয়; কেননা, কর্ম্মই সৃষ্টির কারণ। যদি বল—প্রলয়কালে কর্ম্মসকল তিরোহিত থাকিয়া তদনন্তর অভিব্যক্ত হয় ও তাহা দ্বারা ভূতসৃষ্টি আরব্ধ হয়; তবে আমরাও বলিতেছি—উত্তর কর—প্রলয়ানন্তর কর্ম্ম যে অভিব্যক্ত হয়, তাহার কারণ কি? ঈশ্বরেচ্ছা কারণ হইতে পারে না, তাহা হইলে ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারাই সৃষ্টি হইয়া যাউক, তাহার মধ্যে আবার কর্ম্মকে প্রবেশ করাইয়া লাভ কি? আর যদি-বা ঈশ্বরেচ্ছাই কারণ হয়, তবুও সঙ্গতি নাই; ঐ ঈশ্বরেচ্ছা যে উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ কি? অকারণই তাহা হয়, বলিতে পারা যায় না। ঈশ্বরেচ্ছার উৎপত্তিতে কর্ম্মও কারণ হইতে পারে না, কেননা, তখন সেই কর্ম্ম প্রতিবদ্ধ—তাহার যখন কার্য্যকারিত্ব নাই। কর্ম্মকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও দোষোদ্ধার হইল না;—ঈশ্বরেচ্ছার কারণ কর্ম্মাভিব্যক্তি ও কর্ম্মাভিব্যক্তির কারণ ঈশ্বরেচ্ছা—এই অন্যোন্যাশ্রয়দোষ উপস্থিত হয়। আবার যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, যাহাই হউক, ঈশ্বরেচ্ছার কোন কারণ আছে; তবে আর একটি দোষ আসিয়া পড়ে;—ঐ কারণটি নিত্য কি অনিত্য? যদি নিত্য হয়, তবে তাহার কার্য্যও নিত্য হইবে, অতএব ঈশ্বরেচ্ছাও নিত্য হইল, সুতরাং সর্ব্বদাই সৃষ্টি হউক। যদি কারণটি অনিত্য হয়, তাহা হইলে যখন ঐ কারণ উপস্থিত হইবে, তখন তাহা আবার কোন কারণকে অবলম্বন করিবে? এইরূপ একের পর অপর কারণ অন্বেষণ করিতে করিতে অনবস্থা উপস্থিত হইবে। যদি-বা তোমাদের মতে ধরিয়াই লওয়া

যায় যে, ঈশ্বরেচ্ছার কোন একটি উপযুক্ত কারণ আছে, তবে তাহাতেই ভূতসৃষ্টি হউক না কেন, আবার ঈশ্বরেচ্ছাপ্রভৃতিকে স্বীকার করা কিজন্য ? অতএব সৃষ্টি ও প্রলয় উভয়ই প্রমাণশূন্য।

যখন সৃষ্টি ও প্রলয়ই থাকিল না, তখন তৎকর্তৃত্বরূপে ঈশ্বরও নাই, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এস্থানেও ঈশ্বরের অভাবসম্বন্ধে কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। আমাদের প্রতি কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রযত্ন দেখা যায়; পদসঞ্চারণে ভিন্ন প্রযত্ন, এবং হস্ত-সঞ্চালনে ভিন্ন প্রযত্ন। যদি তোমাদের মতে সৃষ্টিবিষয়ে ঈশ্বরের প্রযত্ন নিত্য হয়, তবে ঐ প্রযত্ন এক, কি অনেক ? যদি একটি-মাত্র প্রযত্ন থাকে, তবে তাহা দ্বারা বিবিধ কার্য্য করা যাইতে পারে না। আর যদি বল, ঈশ্বরের প্রযত্ন অনেক, এবং তাহারা নিত্য, তবে প্রলয়কারণভূত পরমাণুবিশ্লেষক প্রযত্নের সৃষ্টিসময়েও, এবং সৃষ্টিকারণভূত পরমাণুসংযোজক প্রযত্নের প্রলয়কালেও অবস্থিতিহেতু উভয় প্রযত্নের পরস্পর বিরোধ থাকায় সৃষ্টি বা প্রলয় কিছুই হইতে পারে না।

ঈশ্বরাভাবে অপর যুক্তি

তোমরা অনুমান করিয়া থাক—যে যে পদার্থ সাবয়ব, তাহারা সকলই কার্য্য; এই পৃথিবী প্রভৃতিও সাবয়ব, অতএব ইহারাও কার্য্য; কার্য্যের অবশ্য একজন কর্ত্তা থাকিবে, অতএব এই পৃথিব্যাদির যে কর্ত্তা, সেই আমাদের ঈশ্বর। কিন্তু এই অনুমান ঠিক নহে। পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ইচ্ছা-প্রযত্নাদি যে-সমস্ত গুণ কর্ত্তার থাকা আবশ্যক, ঈশ্বরের তাহা সম্ভাবিত হয় না। যখন তাহাই না হইল, তখন কিপ্রকারে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইবে, এবং কিরূপেই বা পৃথিব্যাদির কর্ত্তৃত্ব আমাদের

অনুমান দ্বারা ঈশ্বরসিদ্ধি হয় না

সম্ভব হয় না বলিয়া ঈশ্বর বলিয়া আর একটি পদার্থ সিদ্ধ হইবে ?* অতএব সৃষ্টি ও প্রলয়ের ন্যায় ঈশ্বরেও কোন প্রমাণ নাই।

ঈশ্বর স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজনও দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঈশ্বর স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই

আমাদের এমন কি অনুপপন্ন রহিয়াছে, যাহা ঈশ্বরশক্তি দ্বারা উপপন্ন হইবে। যাঁহারা শব্দার্থের পৌর্ব্বাপর্য্য আলোচনা না করিয়া ও স্ববিরুদ্ধ যুক্তিতর্কসমূহে কর্ণপাত না করিয়া মুগ্ধবুদ্ধিতে সৃষ্টি ও প্রলয় স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ সৃষ্টিপ্রলয় সম্পাদনের জন্য ঈশ্বরকে স্বীকার করিতে পারেন। আমাদের মতে যখন সৃষ্টিপ্রলয়ই নাই, তখন ঈশ্বরস্বীকারের আর কোন প্রয়োজন নাই। বেদপ্রামাণ্যরক্ষার জন্য কেহ কেহ ঈশ্বরস্বীকার করেন, সেজন্যও আমাদের ঈশ্বরের অপেক্ষা নাই। শব্দার্থসম্বন্ধের নিত্যত্বব্যবস্থাপন দ্বারাই বেদে পুরুষসুলভ ভ্রমপ্রমাদপ্রবঞ্চনাদির অনবকাশ প্রতিপাদিত, ও তাহা দ্বারাই প্রামাণ্য রক্ষিত হইয়াছে। কর্ম্মফলপ্রদানের জন্যও ঈশ্বরস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। বেদ বলিতেছেন—"জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত"—স্বর্গেচ্ছু জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, জ্যোতিষ্টোমযাগরূপ ধর্ম্মদ্বারাই স্বর্গফল হয়; ঈশ্বরকে ইহার মধ্যে পাওয়া যাইতেছে না। তুমি হয় ত বলিবে—যাগ ত দেখিতে দেখিতেই বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহা হইতে বহুকাল পরে কিরূপে ফল পাওয়া যাইতে পারে। মৃতদম্পতির পুত্রোৎপত্তি ত কখন শুনা যায় নি! তাহার উত্তর এই—যদি

---

* নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ যেরূপ অনুমানদ্বারা ঈশ্বরসিদ্ধি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, মীমাংসকগণও সেইরূপ অনুমান দ্বারাই ঈশ্বরকে নিষিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাহুল্য ও নীরস হইবে মনে করিয়া আমরা মীমাংসকগণের অনুমানবাক্যের অনুবাদ করিতে বিরত থাকিলাম। শাস্ত্রদীপিকার সৃষ্টিসংহারবাদ ও শ্লোকবার্ত্তিকের সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার অংশ দ্রষ্টব্য।

বেদকে আমরা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করি, তবে যাহাতে বেদের প্রামাণ্য রক্ষিত হয়, তাহা আমাদের উভয়কেই করিতে হইবে। যাগ ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হইলেও, তাহার একটি ব্যাপার বা শক্তি অবস্থান করে, ইহা আমরা স্বীকার করি। যেমন অঙ্গার শান্ত হইলেও তজ্জন্য উষ্ণতা জলে অনুবৃত্ত হয়, সেই রূপ যাগ বিনষ্ট হইলেও যাগজন্য একটি শক্তি (অপূর্ব্ব) আত্মাতে অনুবৃত্ত হয় এবং কালান্তরে তাহা হইতেই ফলপ্রাপ্তি হয়, এজন্য ঈশ্বর স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না। সৃষ্টি, সংহার ও কর্ম্মফলপ্রাপ্তি, এই তিনটি ভিন্ন অপর কোন দুষ্কর কার্য্য সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় না,—যাহার জন্য ঈশ্বর স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ঈশ্বরে যেমন কোন প্রমাণ নাই, তদ্রূপ তাঁহার কোন প্রয়োজনও নাই।

ঈশ্বরের স্বীকার-অস্বীকারে মীমাংসকের লাভ-ক্ষতি

ঈশ্বরসম্বন্ধে মীমাংসকেরা কি বলেন, তাহা আমরা সংক্ষেপে পাঠকবর্গকে জানাইলাম। সম্প্রতি, ঈশ্বরস্বীকার করিলে মীমাংসকগণের কি ক্ষতি হইত, বা ঈশ্বরস্বীকার না করিয়াই তাঁহাদের কি লাভ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

লৌকিকের ন্যায় পারলৌকিক কার্য্যসমূহেও কালবিশেষে কোন একটি প্রবল ভাব সমাজে আদৃত হয়, ও অপরগুলি তৎকালে মলিন হইয়া যায়। যে কালে যে ধর্ম্ম সমীচীন বলিয়া গৃহীত হয়, তখন তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে উদ্বোধিত করিবার জন্য তদলম্বিগণের স্বভাবতই প্রযত্ন হইয়া থাকে। সে সময়ে যদি কেহ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে অনর্থ প্রাপ্ত হইল বলিয়া সকরুণ মনীষিগণের হৃদয় কাতর হয়; তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যান, যাহাতে লোকে সেই শ্রেয়ঃপথ হইতে পরিভ্রষ্ট না হয়। আর্য্যদের মধ্যে যখন এক কর্ম্মবিধিই অভ্যুদয়-জনক ও নিঃশ্রেয়সপ্রদ বলিয়া প্রচলিত হইয়াছিল, প্রধান-প্রধান লোকসমূহ

যখন কর্ম্মবিধিকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন, মীমাংসাদর্শনের তখনই আবশ্যকতা হইয়াছিল। যদি এক কর্ম্মবিধিই পরমপুরুষার্থপ্রদ বলিয়া মীমাংসকগণের ধারণা হইয়া থাকে, তবে যাহাতে সকলই সেই মত গ্রহণ করে, তদ্বিষয়ে যে তাঁহারা চেষ্টা করিবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। মীমাংসকেরা যখন ঈশ্বরবাদ খণ্ডন করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের পূর্ব্বে ঈশ্বরোপাসনা বিশেষ প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, কর্ম্মবিধিই শ্রেষ্ঠ এবং ঈশ্বরোপাসনা নিষ্ফল; তজ্জন্য নিঃসন্দেহে সকলকে কর্ম্মকাণ্ডে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য, তাঁহারা পূর্ব্ব-প্রচলিত ঈশ্বরবাদকে খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন; অন্যথা লোকে হয় ত কর্ম্মকাণ্ড গ্রহণ করিত না, বা করিলেও তাহাতে স্থির থাকিতে পারিত না। বিশ্বগুণাদর্শে ব্যঙ্কটাধ্বরিও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন—

> "ভগবদনভ্যুপগমনং দৈবতচিন্তাদিনিহ্নবশ্চৈষাম্ ।*
> কর্ম্মশ্রদ্ধাবর্দ্ধকতৎপ্রাধান্যপ্রদর্শনায়ৈব ॥"

ঈশ্বরোপাসনার ন্যায় কর্ম্মবিধিও নিঃশ্রেয়সপ্রদ। অতএব ঈশ্বর না থাকিলেও যদি অভিলষিতসিদ্ধি হইয়া যায়, তবে তাঁহাকে স্বীকার করিবার আর আবশ্যকতা থাকে না। আমরা বাল্যকাল হইতে ঈশ্বরো-পাসনা করিয়া আসিতেছি, তাই সহসা ঈশ্বরাভাব শুনিলে আমাদের হৃদয় কেমন ব্যাকুল হইয়া উঠে; কিন্তু যাঁহাদের বাল্যকাল হইতে কর্ম্মবিধি পরিচিত, ঈশ্বর-অস্বীকারে তাঁহাদের হৃদয় ব্যথিত হয় না।

কর্ম্মবিধি ও ঈশ্বরের সমন্বয়

কর্ম্ম ও ঈশ্বর এই উভয়ের উপাসনাকেই যাঁহারা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, তাঁহারা উভয় উপাসনা হইতেই নিজের অনুকূলরূপে অংশবিশেষের গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিয়া

* মীমাংসকেরা দেবতার মূর্ত্তিও স্বীকার করেন না। মীমাংসাদর্শনের নবমাধ্যায়ে দেবতার মূর্ত্তি খণ্ডিত হইয়াছে।

অভিনবমত আবিষ্কার করিয়া যুগপৎ উভয় পথকেই আশ্রয় করিয়াছেন। যাঁহারা এই মতানুবর্ত্তী, প্রাগুক্ত মীমাংসার্থসংগ্রহাদিকার তাঁহাদেরই অন্যতম। এইজন্যই তাঁহারা লিখিয়াছেন—

"ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যানুষ্ঠীয়মানস্তু নিঃশ্রেয়সহেতুঃ।"

বস্তুত যথার্থ মীমাংসকেরা যে ঈশ্বরস্বীকার করেন না, তাহা দেখান হইয়াছে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

কার্য্যকরী শিক্ষা

জীবনকে নিত্যপ্রয়োজনীয় কর্ম্মের উপযোগী করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে, শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষা তাহা হইতে স্বতন্ত্র।

কার্য্যকরী শিক্ষা শিল্পশিক্ষার প্রতিশব্দ নহে

স্কুলের শিক্ষা এবং জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় কর্ম্মোপযোগী শিক্ষার মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক, ইহা বহুদিবস হইতে ইউরোপের শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন মানসিক বৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ পরিস্ফুরণ, পর্য্যবেক্ষণশক্তির উৎকর্ষসাধন, স্মৃতিবৃদ্ধি ও যুক্তিশক্তির উন্নতিবিধানই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। জীবনের বাস্তব কার্য্যের সহিত স্কুলশিক্ষার কোনরূপ সম্বন্ধস্থাপন তাঁহারা আদৌ আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না।

দ্বিবিধ শিক্ষা

কিন্তু এই দ্বিবিধ শিক্ষার মধ্যে সম্বন্ধস্থাপন আধুনিক পণ্ডিত সাধারণের অভিমত। সেই নিমিত্ত ইদানীং পাশ্চাত্য জগতের প্রায় সকল বিদ্যালয়েই মনোবৃত্তির পরিস্ফুরণকরী শিক্ষার সহিত কার্য্যকরী শিক্ষাও প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে কর্ম্মজীবনের উপযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা

প্রাচীন সাহিত্যে অর্পিত সময়ের কিয়দংশ আধুনিক সাহিত্য- ও বিজ্ঞান-চর্চ্চায় প্রদত্ত হইয়াছে; জ্যামিতি-অধ্যয়নের সঙ্গে জ্যামিতিবিষয়ক অঙ্কন এবং ন্যায়- ও অলঙ্কার-শাস্ত্রের শিক্ষার সহিত ধনবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এইরূপ পরিবর্ত্তন অবশ্যই প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির খর্ব্বতাসাধন না করিয়া হয় নাই। মধ্য ও আধুনিক যুগের

চিন্তারাশির যথাসম্ভব সমন্বয় করিয়াই আজিকালিকার বিদ্যালয়ে পাঠ্য-তালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছে।

প্রাচীন যুগে কার্য্যকরী শিক্ষা

পূর্ব্বকালেও ইউরোপে প্রাচীন সাহিত্য কেবলমাত্র মানসিক উন্নতির জন্যই শিক্ষা দেওয়া হইত না; যাঁহারা গির্জ্জায় প্রবেশ করিতেন, এবং যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি পৃথিবীর সকল স্থানে পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত চিন্তা ও কার্য্যের আদান-প্রদান করিতেন, কার্য্যোপযোগী বলিয়াই তাঁহারা প্রধানতঃ গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সাহিত্য অধ্যয়ন করিতেন—মনোবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধন তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকিত না।

প্রাচীন কার্য্যকরী শিক্ষার বিশেষত্ব

প্রাচীনকালে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিবিধান জাতীয় গৌরব বলিয়া বিবেচিত হইত না। য়িহুদীদিগের মধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থপ্রণয়ন ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের কার্য্য জাতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রধান স্থান অধিকার করিত। গ্রীক ও রোমানগণ দক্ষ নাগরিক ও রাজনীতিজ্ঞ সৃষ্টি করাই গৌরবকর বিবেচনা করিতেন। মধ্যযুগে শিক্ষিত সম্প্রদায় গির্জ্জা ও দৈহিক সামর্থ্যের প্রতি সমধিক গুরুত্ব অর্পণ করিতেন। কাজেই পুরাকালে প্রধানতঃ নীতিশিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা ও ব্যায়ামশিক্ষা প্রচলিত ছিল।

অশিক্ষিত ও নিম্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেই তখন শিল্পচর্চ্চা আবদ্ধ থাকিত। তখন ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রধানতঃ দ্রব্যবিনিময়ে চলিত। শিক্ষিত ব্যক্তি ঐ সকল কার্য্য হেয় জ্ঞান করিতেন। গ্রীস এবং রোমে সভ্যসমাজে শিল্প ও ব্যবসায় আদৌ আদৃত হইত না, সুতরাং সাধারণশিক্ষার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না।

তথাপি পেন (Mr. Payne) বলিয়াছেন যে, মনুষ্যকে শিল্প ও ব্যবসায়-বিষয়ক কার্য্যের উপযোগী করাই সমুদায় ঐতিহাসিক যুগের

শিক্ষাপদ্ধতি-মূলক ইতিহাস আলোচনার উপদেশ

প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল। প্রকৃতই, শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিক্ষা এবং মানবজীবনের কর্ত্তব্যকর্ম্মসমূহের মধ্যে বরাবরই সম্বন্ধ স্থাপিত রহিয়াছে; দেশকালভেদে শিক্ষা স্বতন্ত্র হইলেও ইহার অস্তিত্ব সর্ব্বত্র সকল সমাজের মধ্যেই অনুভব করিতে পারা যায়।

ভাবুক প্লেটোর শিক্ষাবিজ্ঞান রাষ্ট্রীয় জীবনের উপযোগী

প্লেটো তাঁহার "রিপাব্লিক গ্রন্থে" অতীব অবাস্তব শিক্ষার অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে জ্ঞানলাভ বিষয়কর্ম্মে সহায়তা-প্রদানের জন্য নহে। গণিত- ও জ্যামিতি-শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য কেবল মনোবৃত্তিরই উৎকর্ষবিধান। অথচ নাগরিকগণকে রাজ্যের প্রতি কর্ত্তব্যসম্পাদনে উপযুক্ত সামর্থ্য প্রদান করিবার জন্যই সেই "রিপাব্লিক" গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই অর্থে প্লেটোর শিক্ষাপদ্ধতি ব্যবসায়মূলক এবং জীবনের দৈনন্দিন কর্ম্মপরম্পরার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্লেটোর শিক্ষারও মূল উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মনোবৃত্তিনিচয়ের উৎকর্ষবিধান নহে; পরন্তু মনুষ্যকে রাজ্যের উচ্চকার্য্যসমূহ সম্পাদন করিবার উপযুক্ত সামর্থ্য প্রদান করা।

রোমীয় শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের মত

প্রাচীন রোমে শিক্ষার উদ্দেশ্য প্লেটোর "রিপাব্লিকে" সূচিত শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতে অনেক স্বতন্ত্র। বাগ্মিতা অভ্যাস করিবার জন্য যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, রোমে সাধারণতঃ তদনু-যায়ী শিক্ষাই প্রদত্ত হইত। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রোমে কিরূপ শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাহা আমরা কুইনটিলিয়ানের (Quintilian, A. D. 35-95) প্রসিদ্ধ শিক্ষা-

বিজ্ঞান হইতে জানিতে পাই। সুবক্তা হইবার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন, তিনি তাঁহার পুস্তকে কেবল তাহারই আলোচনা করিয়াছেন।

মধ্যযুগে সমুদয় শিক্ষিত সম্প্রদায় 'চার্চ্চের' সভ্য ছিলেন; এবং যাঁহারা 'ষ্টেটের' কর্ম্ম পছন্দ করিতেন, তাঁহাদিগকে চার্চ্চের সভ্য-মণ্ডলীর ন্যায় শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইত। সে কালে ধর্ম্মশাস্ত্র-অধ্যয়ন শিক্ষাপদ্ধতির ভিত্তিস্বরূপ ছিল; বাইবেলের সহিত সমুদয় শিক্ষারই সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে যথেষ্ট লাটিন এবং সামান্য গ্রীক প্রধান স্থান অধিকার করিত।

মধ্যযুগে ধর্ম্মশিক্ষা সমাজের কর্ত্তব্য সাধনোপযোগী

আস্‌চামের (Ascham) সুপরিচিত গ্রন্থে মধ্যযুগের শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রণালী বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

অস্কার ব্রাউনিং (Oscar Browning) কিন্তু বলেন যে, প্রাচীন সাহিত্য তখন বুদ্ধিবৃত্তিপরিমার্জ্জনের জন্য পাঠ্য ছিল না,—সৌখিন কলাবিদ্যা হিসাবে তাহা শিক্ষা দেওয়া হইত।

পূর্ব্বকালে শিক্ষা ও বাস্তব কর্ম্মের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ তাহার দ্বিতীয় নিদর্শন। আইন, চিকিৎসা, ঈশ্বরতত্ত্ব তাৎকালিক বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। প্রফেসার লরি (Laurie) তাঁহার "বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন ও উৎপত্তি" নামক গ্রন্থে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে সেলার্‌নো (Salerno) বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমতঃ চিকিৎসাশিক্ষাগার এবং বলোগনা (Bologna) বিশ্ববিদ্যালয় আইন্ শিক্ষাগার ছিল। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ যে কেবলমাত্র বিশেষ-বিশেষ শাস্ত্রালোচনার আলয় ছিল, তাহা নহে, অধিকন্তু ব্যবসায় ও সমাজের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়কর্ম্মসম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করাই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়-সৃষ্টির কারণ কর্ম্মজগতের অভাবমোচন

পূর্ব্বে দেখান গিয়াছে যে লাটিন ভাষা প্রাচীনকালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাস্তব কর্ম্মের উপযোগী ছিল, এবং তজ্জন্যই শিক্ষাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন মনীষিগণ লাটিনশিক্ষার এতাদৃশ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর জনৈক লেখক বলিয়াছেন "আমরা লাটিনের দাস। বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য যৌবনকাল অতিবাহিত করিতে হইলে গ্রীক ও মুসলমানগণ তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশাবলির জন্য কখন ঈদৃশ সম্পদ্ রাখিয়া যাইতে পারিতেন না।" লক (Locke) বলেন যে, সন্তানকে ব্যবসায়ের উপযোগী করিতে হইলে তাহাকে লাটিন শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া বৃথা অর্থব্যয় অপেক্ষা অধিকতর হাস্যজনক বিষয় কিছুই হইতে পারে না; কারণ ব্যবসায়ের জন্য লাটিন শিক্ষার আদৌ প্রয়োজন নাই।

শিক্ষাপদ্ধতিতে প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত

সেকালে ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা ও আইন-অধ্যয়ন আদরণীয় ছিল, এবং শিক্ষাবিভাগের উপর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিশেষ আধিপত্য ছিল বলিয়া স্কুলে প্রাচীনসাহিত্যশিক্ষা প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে দুই-চার জন সংস্কারকের চেষ্টা কিছুই করিতে পারে নাই। শব্দশিক্ষা অপেক্ষা বস্তু-শিক্ষার উপকারিতা বহুপূর্ব্বে উপলব্ধ হইলেও, সে সময়ে সেরূপ শিক্ষার উপযোগী কোন নূতন উপকরণ আবিষ্কৃত হয় নাই। পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের সেই শৈশবাবস্থায়, ইহা বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের শিক্ষোপযোগী হইবে, এ আশা কেহই করিতে পারেন নাই। প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানসম্বন্ধে লক বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির কার্য্য এরূপ সূক্ষ্ম ও বোধ শক্তির অগম্য যে, ইহাকে কখনও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বিজ্ঞানে পরিণত করা যাইবে না।

বিজ্ঞান শিক্ষার আবশ্যকতা-বোধ

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে লকের মত

এমন কি রুসোও—যিনি তাঁহার "এমিলে"তে (Emile) শিল্পশিক্ষাকে প্রধান স্থান দিয়াছেন, এবং মৌলিক পর্য্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার সহিত তুলনায় পুঁথিগত বিদ্যার অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন, তিনিও—প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির তখন কোন পরিবর্ত্তন সংঘটন করিতে পারেন নাই। রুসো যে-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা সে সময়ের উপযোগী ছিল না। কারণ সেকালে কার্য্যোপযোগী শিক্ষালাভ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে তাহা খাটাইবার উপায় ছিল না; অধিকন্তু পুঁথিগত বিদ্যাই মানসম্ভ্রম প্রদান করিত। কাজেই বস্তুগতশিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ সাধারণের নিকট আদরণীয় হয় নাই।

রুসোর শিক্ষা-সমালোচনা ও নবতন্ত্র

লক ও রুসোর অকৃতকার্য্যতা

কিন্তু রুসো ঠিকই বুঝিয়াছিলেন; এক্ষণে সকলে তাঁহার বাক্যের যাথার্থ্য অনুভব করিতেছেন এবং বলিতেছেন যে, বাহ্য জগতের সহিত মনোবৃত্তিনিচয়ের সুস্পষ্ট সম্বন্ধস্থাপনেই বৃত্তিসমূহের প্রকৃত উন্নতি। হারবার্ট স্পেন্সারও বলিয়াছেন যে, মনুষ্যকে সর্ব্বতোভাবে জীবন যাপন করিতে সমর্থ করা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, এবং তাহা করিতে হইলে জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়কর্ম্মের সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ থাকা একান্ত আবশ্যক।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার

শিক্ষার ইতিহাস, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালী ও তাহার উদ্দেশ্য, এবং শিক্ষাবিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন মনীষিগণের মত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গেল যে, আবহমানকাল হইতে বাস্তব কর্ম্মের সহিত শিক্ষার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, এবং এই সম্বন্ধস্থাপনের জন্য বহুবিধ চেষ্টাও হইয়াছে। শিক্ষা দেশকালভেদে বরাবরই সমাজের উপযোগী ছিল।

কালক্রমে সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তননিবন্ধন শিক্ষাপ্রণালীরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। দ্বিশতাব্দীপূর্ব্বের সমাজ ও আধুনিক সমাজ এক নহে, ইহাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য জন্মিয়াছে। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সমাজেরও বহু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। এখন আর দ্রব্যবিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় চলে না; শিল্প ও বাণিজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে, এবং বহুবিধ শিল্প-ব্যবসায়েরও সৃষ্টি হইয়াছে। নানারূপ কলকারখানার সৃষ্টি হওয়ায় আজকাল অতি-অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বহুবিধ দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে এবং পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাতায়াতেরও বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এক্ষণে এক মাসের পথ এক দিবসেই যাওয়া যায়, স্থানের দূরত্ব আর পূর্ব্বের ন্যায় সময়াপহারক নহে। বিজ্ঞান আধুনিক সমাজে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছে; আজকাল একস্থানে বসিয়া নিমেষমধ্যে সমস্ত পৃথিবীর খবর পাওয়া যায়। রেলগাড়ী, ষ্টীমার ও টেলি-গ্রাফ স্থান ও সময়ের সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে একসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে। এই সকল পরিবর্ত্তননিবন্ধন এক্ষণে শিল্প ও বাণিজ্য স্বাভাবিক বুদ্ধির দ্বারা চালিত না হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চালিত হইতেছে। ইদানীং এমন অনেক নূতন-নূতন শিল্প ও ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে যাহা বৈজ্ঞানিকজ্ঞান-ব্যতিরেকে পরিচালিত করা একেবারে অসম্ভব। সুতরাং ব্যবসায়বাণিজ্য করিতে হইলে আজকাল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন।

মানবসমাজে নূতন অবস্থা

অতএব আমাদের দেশেও শিক্ষাকে কার্য্যের উপযোগী করিতে হইলে এখন আর অতীতকালের শিক্ষাপ্রণালী বজায় রাখিলে চলিবে না; সমাজের নূতন-নূতন আবশ্যকতার প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া তদুপযোগী শিক্ষাপ্রণালীরও প্রবর্ত্তন করিতে

নবযুগে কর্ম্ম-জীবনোপযোগী নূতন শিক্ষা

হইবে। সুখের বিষয় দেশের লোকে অল্পবিস্তর পরিমাণে ইহা বুঝিয়াছেন। শিল্পশিক্ষা-ব্যতিরেকে এক্ষণে আর ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি-সাধন সম্ভবপর নহে, ইহা দেখিয়া অনেকেই শিল্পশিক্ষার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন। সংসারে প্রবেশ করিয়া যে বালকবালিকাদিগকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হইবে, তাহাদিগকে তদুপযোগী শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য সাধারণের দিন-দিন অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে; ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্যোগ- এবং শিল্পবিদ্যালয়াদির প্রতিষ্ঠার দিকেও লক্ষ্য পড়িয়াছে।

তথাপি এখনও আমাদের অভাব অনেক। কর্ম্মক্ষেত্রের সকল বিভাগে প্রবেশপথ যতদিন না উন্মুক্ত হয়, ততদিন এই আগ্রহের অনুরূপ ফললাভে আমরা বঞ্চিত। এপক্ষে আর একটি প্রধান অন্তরায় শিক্ষকের অভাব। জ্ঞানপ্রচারের দিকে আমাদের যেমন লক্ষ্য পড়িয়াছে, সেই সঙ্গে কার্য্যকরী শিক্ষার সকল বিভাগেই শিক্ষক প্রস্তুত করিবার চেষ্টাও আবশ্যক। যোগেন্দ্রবাবুর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সমিতি হইতে এতদুদ্দেশ্যে ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে মধ্যে-মধ্যে ছাত্র প্রেরিত হইয়া থাকে। ইহা অতিশয় সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি আমাদের অভাবের পক্ষে এই আয়োজন একদিকে সামান্য, অন্যদিকে আবার যাঁহারা বিদেশ হইতে শিখিয়া দেশে ফিরিতেছেন তাঁহারাও সকলে দেশসেবাই ব্রতরূপে গ্রহণ করিতেছেন না। বস্তুতঃ যেদিন আমরা দেখিব বিদেশপ্রত্যাগত শিক্ষকগণ অনন্যমনে শিক্ষাদানে নিযুক্ত হইয়াছেন, সেইদিন বুঝিব আমাদের বিদেশগমন বা শিল্পবিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা সার্থক।

শিল্পশিক্ষক- ও শিল্পপ্রচারক-সৃষ্টি

শ্রীবিজয়কুমার সরকার।

প্রাচীন গ্রীসে প্রাকৃতিকবিজ্ঞানচর্চা।

প্রথম যুগ

খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর আরম্ভপর্য্যন্ত

থেল্‌স্ (Thales)

থেল্‌স্ (৬৪০ খ্রীঃ পূঃ) গ্রীসের সপ্ত জ্ঞানীর মধ্যে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। ইনি মিলেটাস্ নগরে খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় ৬৪০ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। থেলস্ মিসর দেশ পরিভ্রমণ করিয়া তদ্দেশবাসীদিগের নিকট হইতে অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। তৎপরে নিজদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

জীবনবৃত্তান্ত

প্রাচীন গ্রীকগণ মনে করিতেন—(১) পৃথিবী থালার ন্যায় চ্যাপ্টা এবং তাহা জলের উপর প্লবমান; (২) সূর্য্য, চন্দ্র ও তারাসমুদায় দেবতা; এবং (৩) বৎসর দুইভাগে বিভক্ত, শীত ও গ্রীষ্ম।

তাৎকালিক বিজ্ঞান

থেলস্ সূর্য্যের গতি লক্ষ্য করিয়া বৎসরকে চারি বিশেষ ভাগে বিভক্ত করেন। তিনিই গ্রীসবাসীদিগের মধ্যে প্রথম জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনিই বৎসরকে নিম্নলিখিত চারিটী বিশেষ ভাগে বিভক্ত করেন।

বিজ্ঞান ভাণ্ডারে তাঁহার দানঃ—
(ক) জ্যোতিষ,
(১) বৎসরচারি ভাগে বিভক্ত

প্রথম বিভাগ—২১শে ডিসেম্বর হইতে ২১শে মার্চ্চ। ২১শে ডিসেম্বর দিন সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ও রাত্রি সর্ব্বাপেক্ষা বড় হয়। ঐ দিন দ্বিপ্রহর সময়ে সূর্য্য ঠিক মস্তকোপরি আইসে না (২৩° ২৮′ দক্ষিণে)। সুতরাং উহার রশ্মি বক্র গতিতে পৃথিবীতে পড়ে। বিশেষতঃ সূর্য্য ঐ সময় খুব অল্প কালই আকাশে থাকে; সুতরাং আমরা ইহার উত্তাপ অধিক পাই না। এজন্যই এ সময় শীতকাল হয়। ২১শে ডিসেম্বরের পর হইতে দিন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং সূর্য্যও ক্রমশঃ দ্বিপ্রহর সময়ে মস্তকোপরি উঠিতে থাকে। ইহার তিন মাস পরে ২১ মার্চ্চ দিন ও রাত্রি সমান হয়।

প্রথম বিভাগ

দ্বিতীয় বিভাগ—২১শে মার্চ্চ হইতে ২১শে জুন। ২১ শে মার্চ্চের পর হইতে দিন ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে। রাত্রি ক্রমশঃ ছোট হইতে থাকে। পুনরায় তিন মাস পরে ২১ শে জুন দিন সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও রাত্রি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট হয়। সূর্য্য তখন অধিক সময় পৃথিবীতে থাকে ও ঠিক মস্তকোপরি (২৩° ২৮′ উত্তরে) আসে বলিয়া, উহার রশ্মি লম্বভাবে আমাদের নিকট আগমন করে, এ জন্য আমরা উহার উত্তাপ অধিক পাই। এ জন্যই এ সময় গ্রীষ্মকাল হয়।

দ্বিতীয় বিভাগ

তৃতীয় বিভাগ—২১শে জুন হইতে ২৭শে সেপ্টেম্বর। ২১শে জুনের পর হইতে দিন পুনরায় ছোট হইতে থাকে। তিন মাসের পর ২৭ শে সেপ্টেম্বর পুনরায় দিন-রাত্রি সমান হয়।

তৃতীয় বিভাগ

চতুর্থ বিভাগ—২৭শে সেপ্টেম্বর হইতে ২১ ডিসেম্বর। ২৭শে সেপ্টেম্বরের পর হইতে রাত্রি দিন অপেক্ষা ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে, এবং পুনরায় তিন মাস পরে ২১ ডিসেম্বর রাত্রি সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও দিন সর্ব্বাপেক্ষা ছোট হয় এবং পুনর্ব্বার শীতকাল হইয়া থাকে।

চতুর্থ বিভাগ

থেলস্ সূর্য্যের গতি ও দিনরাত্রির ভেদ লক্ষ্য করিয়া বৎসরকে যে চারিটী ভাগ করিয়া নাম করণ করিয়াছিলেন [(১) Vernal Equinox (বাসন্তিক ক্রান্তিপাত), (২) Autumn Equinox (শারদীয় ক্রান্তিপাত), (৩) Summer and (৪) Winter Solstices (উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন আরম্ভের কাল)], আজকালও সেই সমুদায় নামই ব্যবহৃত হইতেছে।

(২) বিভিন্ন ক্রান্তিপাতে ইংরাজী নামকরণ

থেলস্ মনে করিতেন, সূর্য্য ও তারাসমুদায় দেবতা নহে, কোন উজ্জ্বল পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত, এবং চন্দ্র দর্পণের ন্যায় সূর্য্যের আলোক প্রতিফলিত করে।

(৩) সূর্য্য, চন্দ্র ও তারা-সমুদয়

তিনি গ্রহণের বিষয়ও প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। কিন্তু থেলস্ স্বদেশবাসীদিগের ন্যায় বিশ্বাস করিতেন যে, পৃথিবী চ্যাপ্টা এবং তাহা জলের উপর ভাসিতেছে।

(৪) গ্রহণ

তিনি গণিতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, এবং কতকগুলি প্রতিজ্ঞার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ইউক্লিডের জ্যামিতিতে আজ কাল ঐ সকল প্রতিজ্ঞা পাওয়া যায়।

(খ) গণিত

এনাক্সিমেণ্ডার (Anaximander of Miletus.)

এনাক্সিমেণ্ডার, (৬১০ খৃঃ পূঃ) থেল্সের বন্ধু ও তৎপরবর্ত্তী গ্রীক আবিষ্কারক। তিনি কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন।

তিনি ধাতুনির্ম্মিত একটী ফলার কেন্দ্রস্থানে একটী (ঘড়ীর) কাঁটা বা গোঁজ পুতিয়া সূর্য্যের রশ্মি উহার উপর পতিত হইলে, কখন কোন ছায়া পড়িবে, উহা নির্দ্দেশ করিয়া একটী সূর্য্যঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞান-ভাণ্ডারে তাঁহার দান
(১) জ্যোতিষ
(ক) সূর্য্যঘড়ী

প্রাতঃকালে সূর্য্য অনেক নীচে থাকে, পরে ক্রমশঃ মস্তকের উপরে উঠিতে থাকে। ঘড়ীর কাঁটার ছায়াও বিভিন্ন সময়ে অন্য দিকে অন্য আকার ধারণ করিতে থাকে। এই রূপে এনাক্সিমেণ্ডার গ্রীকদিগকে দৈনিক সময় নিরূপণ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

(খ) চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি

তিনিই জ্যোতির্ব্বিদদিগের মধ্যে চন্দ্রের কলার হ্রাসবৃদ্ধি বা উহার আকার এককলা হইতে কিরূপে পূর্ণ হয় ও পূর্ণ হইয়া কিরূপেই বা পুনরায় উহার আকার ক্রমশঃ কমিতে থাকে, তাহা প্রথমে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(গ) চন্দ্রের মাসিক গতি

ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, চন্দ্র প্রতিমাসে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যে একবার প্রদক্ষিণ করে, ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

চন্দ্রের আকার কিরূপে ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও হ্রাস পাইতে থাকে, তাহা আমরা সূর্য্য ও আমাদের মস্তকের মধ্যস্থানে কোন একটী গোলাকার বস্তু ধরিয়া ক্রমশঃ সরাইতে আরম্ভ করিলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

গোলাকার বস্তুটী আমাদের মস্তকের ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে থাকিলে আমরা উহার অন্ধকার দিক্‌টাই দেখিতে পাই। কিন্তু ক্রমশঃ উহাকে আমাদের মস্তক কেন্দ্র করিয়া বৃত্তাকারে সরাইতে আরম্ভ করিলে, আমরা ক্রমে উহার উজ্জল অংশ দেখিতে থাকিব। এইরূপ যতই উহাকে সরান হইবে, আমরা ততই উহার উজ্জল অংশ দেখিব। ক্রমে যখন উহা আমাদের পায়ের দিকে অর্থাৎ সূর্য্যের ঠিক বিপরীত দিকে আসিবে, আমরা তখন উহাকে সম্পূর্ণ উজ্জল দেখিব। এইরূপে চন্দ্র যখন পৃথিবীর চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া সূর্য্যের ঠিক বিপরীত দিকে আইসে, আমরা তখন উহাকে সম্পূর্ণ উজ্জল দেখি, এবং ইহাকেই আমরা পূর্ণচন্দ্র বলিয়া থাকি।

তৎপরে ক্রমে চন্দ্র যখন পুনরায় সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে আইসে, তখন আমরা উহার যে উজ্জ্বল অংশ দেখিতে পাইয়াছিলাম, ক্রমে উহা হ্রাস পাইতে পাইতে পুনরায় সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। ইহাকেই আমরা অমাবস্যা বলিয়া থাকি।

এনাক্সিমেণ্ডার চন্দ্রকলার এইরূপ মাসিক হ্রাসবৃদ্ধি সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কার করেন।

(২) ভূগোল, পৃথিবীর মানচিত্র

প্রাচীন গ্রীকগণ সেই সময় পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে অংশ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এনাক্সিমেণ্ডার তাহার একটী মান-চিত্র অঙ্কিত করিয়া যান।

পিথ্যাগোরাস্ (Pythagoras)

জীবনবৃত্তান্ত

পিথ্যাগোরাস্ একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাঁহার জন্মস্থান ও আবির্ভাবকাল প্রকৃত প্রস্তাবে নির্ণয় করা যায় না। তবে তিনি খৃঃ পূঃ ৫৬৬ হইতে খৃঃ পূঃ ৪৭০ মধ্যে জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়।

তিনি মিসর দেশ পরিভ্রমণ করিয়া অনেক বিষয় শিক্ষালাভ করিয়া-ছিলেন ও পরে ইতালির অন্তর্গত টেরেণ্টাম নগরে বসতি নির্ম্মাণ করিয়া পিথ্যাগোরিয়ান্-নামক সম্প্রদায় স্থাপন করেন।

তিনি দর্শনশাস্ত্রে অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন। আমরা তাঁহাকে প্রথম তত্ত্বজ্ঞানসন্ধিৎসু বলিতে পারি। কিন্তু এখানে আমরা তাঁহার দার্শনিক মতের অবতারণা করিব না; তিনি আমাদিগের বিজ্ঞানভাণ্ডারে যে সমস্ত রত্ন দান করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহারই বর্ণনা করিব।

পৃথিবী চল ও শূন্যে পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা তিনিই প্রথম সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যে ইহা পরিভ্রমণ করিতেছে, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

বিজ্ঞানভাণ্ডারে তাঁহার দান
(১) জ্যোতিষ
(ক) পৃথিবীর গতি

একই তারা প্রভাত ও সন্ধ্যাকালে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। কিন্তু তিনি ইহার যে ইংরাজী নামকরণ করিয়াছিলেন (Phospherous), আজ কাল তাহা প্রচলিত নাই। আরও কতক দিন পরে উহা আধুনিক আখ্যা (Venus) প্রাপ্ত হয়।

(খ) প্রভাত-ও প্রদোষ-তারা

তিনি ভূতত্ত্ব বিষয়ের কতকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সত্য আবিষ্কার করেন। তিনি সামুদ্রিক জন্তুর কঙ্কাল সমুদায় গভীর মৃত্তিকাগর্ভে ও সাগর হইতে বহু দূরে দেখিতে পাইয়া, এককালে এই সমুদায় মৃত্তিকা সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল বলিয়া অনুমান করেন। মৃত্তিকার যত নিম্নস্তরে ঐ সমুদায় কঙ্কাল পাওয়া যায়, তত নিম্ন স্তরে মনুষ্যের দ্বারা উহা নীত হওয়া অসম্ভব, তিনি ইহা বুঝিয়াছিলেন।

(২) ভূতত্ত্ব

নদীর বেগ কর্দ্দম প্রভৃতি বহিয়া আনিয়া মোহনায় বদ্বীপ-নামক নূতন স্থান নির্ম্মাণ করিতেছে ও সমুদ্রতীর ক্রমে ক্রমে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে দেখিয়া তিনি রূপান্তরসম্বন্ধী কতকগুলি সত্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তৎসমুদয় উল্লেখ করিতেছি :—

পৃথিবীর রূপান্তর

রূপান্তরবিষয়ক সত্য আটটী

১ম। স্থল সাগরে পরিবর্ত্তিত হয়।
২য়। সমুদ্র স্থলে পরিবর্ত্তিত হয়।

৩য়। জল প্রবাহিত হওয়ায় উপত্যকা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও জল-প্রবাহ নদীরূপ ধারণ করে, এবং বন্যা পর্ব্বতসমূহ নষ্ট করিয়া সমুদ্রে মৃত্তিকা আনয়ন করে।

৪র্থ। বদ্বীপ-প্রভৃতি নূতন চড়া পড়িয়া দ্বীপসমুদায় মহাপ্রদেশের সহিত মিলিত হয়।

৫ম। উপদ্বীপ মহাপ্রদেশের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া দ্বীপরূপে পরিবর্ত্তিত হয়।

৬ষ্ঠ। ভূমিকম্পে স্থলসমুদয় প্রোথিত হইয়া জলমগ্ন হয়।

৭ম। অনেক নদীর পদার্থকে প্রস্তরীভূত করিবার ক্ষমতা আছে, তাহাতে বস্তু সমুদয় শৈলাকার প্রাপ্ত হয়।

৮ম। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গমনস্থান একস্থান হইতে অন্যস্থানে সরিয়া যাইতে পারে।

পিথ্যাগোরাস্ ও তাঁহার ছাত্রগণ এই সমুদায় ভূতত্ত্ব বিশেষ গবেষণাপূর্ব্বক আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

তিনি শব্দবিদ্যাসম্বন্ধেও কতকগুলি সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

(১) পদার্থ বিজ্ঞান
একতারা-যন্ত্র

তিনিই প্রথমে একতারা যন্ত্র (Monocord) উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। একটী তার বিভিন্ন দৈর্ঘ্যে বিভিন্নরূপ স্বর উৎপাদন করে, ইহাও তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। তদবলম্বনে গ্রীক বাদ্যকরগণ একই তারে নানারূপ স্বর উৎপাদন করিতে পারিতেন।

দ্বিতীয় যুগ

খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৯৯ হইতে ৩২২ পর্য্যন্ত

এনাক্সগোরাস্ (Anaxagoras)

এনাক্সগোরাস খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় ৪৯৯ বৎসর পূর্ব্বে আইওনিয়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই তিনি এথেন্স নগরে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃতিতত্ত্ব অধ্যয়ন করিতে বিশেষ ভালবাসিতেন।

জীবনবৃত্তান্ত

বিশেষ ঘটনা

(১) সত্যপ্রচারের জন্য প্রথম লাঞ্ছনা

বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে সত্য আবিষ্কার করিয়া প্রচার করায় তিনিই প্রথম রাজদণ্ডবিধানে ধৃত ও লাঞ্ছিত হন। সূর্য্য দেবতা নহে, এ সত্য প্রচার করায় গ্রীকগণ তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এথেন্স নগরের রাজদ্বারে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন; সেই বিচারে তিনি বৃদ্ধকালে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহার বন্ধু পেরিক্লিস্ (Pericles) তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া যুক্তি প্রদর্শন করায় তিনি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইতে মুক্তিলাভ করেন বটে, কিন্তু এ জন্য তাঁহাকে অর্থদণ্ড ভোগ করিয়া পরিশেষে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল। তদবধি তিনি লেম্পসেকাস্ (Lampsacus) নগরে বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

(২) প্রথম একেশ্বরবাদ-প্রচার

এনাক্সগোরাস সমস্ত জীবের অধিপতি ঈশ্বর এক, দুই বা ততোধিক নহে, এই সত্য প্রথম প্রচার করেন। এ জন্য গ্রীকগণ তাঁহাকে একেশ্বরবাদী নাস্তিক বলিয়া শাস্তি প্রদান করিতেন।

তৎকালে দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত না হইলেও তিনি চন্দ্রের মধ্যে পর্ব্বত, সমতল, উপত্যকা প্রভৃতি লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উহা মনুষ্যবাসোপযোগী দ্বিতীয় পৃথিবী বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু মনুষ্যপ্রভৃতির বাসের প্রধান উপকরণ বায়ু যে উহাতে নাই, তাহা বোধ হয় তিনি বুঝিতে পারেন নাই। সমুদায় জ্যোতিষ্কমণ্ডল এক-একটি উজ্জ্বল প্রস্তরবিশেষ, তন্মধ্যে সূর্য্য একটী বৃহৎ উজ্জ্বল প্রস্তরমূর্ত্তি বলিয়া তিনি মনে করিতেন। পৃথিবী সূর্য্য ও চন্দ্রের ঠিক মধ্যবর্ত্তী হইলে চন্দ্রগ্রহণ, এবং চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী হইলে সূর্য্যগ্রহণ হয়, ইহা তিনি উদ্ভাবন করিয়াছেন। বৃহস্পতি, শনি, শুক্র, রবি ও মঙ্গল-গ্রহাদি * যে শূন্যে পরিভ্রমণ করিতেছে এবং নক্ষত্ররাজি যে স্থির ও নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে, তাহা তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া যান।

জ্যোতিষ
(১) চন্দ্রের প্রাকৃতিক অবস্থা

(২) সূর্য্য ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কমণ্ডল

(৩) চন্দ্র-ও সূর্য্যগ্রহণ

(৪) গ্রহগণের পরিভ্রমণ

(৫) নক্ষত্র নিশ্চল

হিপোক্রেটিস্ (Hippocrates)

হিপোক্রেটিস্ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রায় ৪২০ অব্দে কস্ দ্বীপে পুরোহিত-ও চিকিৎসক-বংশে জন্ম গ্রহণ করেন।

এনাক্সগোরাস্ যে সময়ে নভোমণ্ডলে জ্যোতিষ্কাদি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, হিপোক্রেটিস্ ঠিক সেই সময়েই শরীরতত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া

* এখানে গ্রহগুলির আকারের পরিমাণক্রমানুসারে নাম প্রদান করা হইয়াছে; বৃহস্পতি ইহাদের মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ, তৎপর শনি, ইত্যাদি।

জীবনবৃত্তান্ত
রোগের কারণসম্বন্ধে
প্রাথমিক মত

কিসে মানবের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং কেনই বা শরীরে ব্যাধি উৎপন্ন হয়, এই সকল স্বাস্থ্যতত্ত্ব উদ্ভাবন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। এই সময় গ্রীকগণ রোগের নানারূপ ব্যাখ্যা করিতেন। ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিবার জন্য ব্যাধি প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। এ জন্য তাঁহারা পীড়িত হইলেই Aesculapius * দেবের মন্দিরে ভোগ প্রদান করিয়া, ঐ দেবতার পূজক পুরোহিতের নিকট রোগ উপশম করিতে যাইতেন।

হিপোক্রেটিস্ এই পুরোহিতবংশেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাল্যকাল হইতেই এই পৈতৃক ব্যবসায় (পৌরোহিত্য) পরিত্যাগ করিয়া রোগের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

শরীরের প্রতি অযত্ন করিলে স্বাস্থ্যের হানি হয়, ইহা গ্রীকগণ উপলব্ধি করিতেন না। হিপোক্রেটিস্ শরীরে শীতগ্রীষ্মের কার্য্য অনুসন্ধান করিয়া, পীড়িত অবস্থায় খাদ্যদ্রব্যাদির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে চিকিৎসকদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

বিজ্ঞানভাণ্ডারে তাঁহার দান :—

(১) রোগের কারণ ও তাহার চিকিৎসা

তিনি শরীরতত্ত্বসম্বন্ধে কতকগুলি প্রসিদ্ধ পুস্তক রচনা করিয়া যান। হিপোক্রেটিস্‌কে চিকিৎসাশাস্ত্রের স্থাপনকর্ত্তা বলা হয়।

(২) শরীরতত্ত্ব

---

* হিন্দুদিগের ধন্বন্তরি দেবের ন্যায় প্রাচীন গ্রীকগণ ইঁহাকে ঔষধাদির দেবতা বলিয়া মনে করিতেন।

ইউডক্লাস্ (Iudclus)

জ্যোতিষ।

(১) প্রথম মানমন্দির

(২) নক্ষত্রাদির মানচিত্র

(৩) গ্রহগণের গতি ও কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পুনরাগমনের কাল

ইউডক্লাস্ খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪০৬ অব্দে এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত স্নিডস্ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তথায় একটি মানমন্দির বা গ্রহনক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণের জন্য একটী উচ্চ স্থান নির্ম্মাণ করিয়া সেই সময় পর্য্যন্ত যে সমস্ত নক্ষত্রাদি আবিষ্কার হইয়াছিল, তাহাদের একটী মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া যান। তিনি বৃহস্পতি-আদি গ্রহগণের গতি বিশদরূপে বিবৃত করিয়া পুনর্ব্বার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহাদের আগমনকাল প্রথম নির্ণয় করেন।

ডিমোক্রিটাস্ (Democritus)

ছায়াপথ

ডিমোক্রিটাস্ এবডোরা নগরে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪৫৯ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এনাক্সগোরাসের সামসময়িক একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও পণ্ডিত লোক ছিলেন। আমরা প্রত্যহ তারকামণ্ডিত নভস্থলকে দ্বিখণ্ড করিয়া উত্তরপশ্চিম-দিগন্ত ব্যাপ্ত যে উজ্জ্বল স্থূল আলোকরেখা দেখিতে পাই অর্থাৎ যাহাকে "ছায়াপথ" বলিয়া থাকি, তাহা কোটী-কোটী নক্ষত্ররাজি ভিন্ন কিছুই নহে, ইহা তিনিই প্রথম সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন।

এরিস্‌টট্‌ল্ (Aristotle)

জীবনবৃত্তান্ত

এরিস্‌টট্‌ল্ থ্রেইসের অন্তর্গত ষ্টেগিরা নগরে খৃষ্টজন্মের প্রায় ৩৮৪ বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি গ্রীসদেশের একজন সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও প্রকৃতিতত্ত্বানুসন্ধানকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এথেন্স নগরে দার্শনিক

প্লেটোর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া তৎপরে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের শিক্ষকপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

এরিস্‌টটলের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীকগণ জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে যে সমস্ত আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিলেন, তিনি সেই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। শূন্যে পরিভ্রমণ করিতে করিতে চন্দ্র যখন সূর্য্য ও মঙ্গলের ঠিক মধ্যবর্ত্তী স্থানে আইসে বা মঙ্গল যখন সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী হয়, তখনই মঙ্গলের সূর্য্য বা চন্দ্র গ্রহণ হয়। ইহা তিনি প্রথম লক্ষ্য করেন।

বিজ্ঞানভাণ্ডারে **তাঁহার দান :—**
(১) জ্যোতিষ
(ক) লিপিসংগ্রহ
(খ) মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহাদির চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ

(২) ভূগোল—পৃথিবী গোলাকার

পৃথিবী গোলাকার, ইহা তিনিই প্রথম স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া প্রচার করেন।

কিন্তু তাঁহার বৈজ্ঞানিক কার্য্যসমুদায়ের মধ্যে প্রাণিতত্ত্বসম্বন্ধীয় গবেষণাতেই তিনি অধিক যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি প্রাণী সমুদায়ের নমুনা (specimen) সংগ্রহ করিয়া এথেন্স নগরে প্রেরণ করাইবার জন্য গ্রীসের অধিপতি মহাবীর আলেকজাণ্ডারকে অনুরোধ করিয়া এসিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বহু শত লোক নিযুক্ত করাইয়াছিলেন। তদনুসারে প্রাণিসমূহ এথেন্স নগরে নীত হইলে, এরিস্‌টট্‌ল্ তাহাদিগের শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রাদি ও তৎসমুদায়ের পরিচালনের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন।

(৩) প্রাণিতত্ত্ববিজ্ঞান

শ্রেণীবিভাগ

এরিস্‌টট্‌ল্ প্রাণী সকলকে যেরূপ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া যান, আজকালও ঐরূপ শ্রেণীবিভাগ ব্যবহৃত হইতেছে, সুতরাং আমরা তাঁহাকেই প্রাণিবিজ্ঞানের স্থাপনকর্ত্তা বলিতে পারি।

এক শ্রেণীর প্রাণী অন্য শ্রেণীর প্রাণী অপেক্ষা অতি-অল্পমাত্র বিভিন্ন।

উদ্ভিদ্ ও প্রাণি-জগতের সামঞ্জস্য

সুতরাং অতি বৃহৎ প্রাণীর সহিত নিম্নতম উদ্ভিদের সামঞ্জস্য কি করিয়া দেখান যাইতে পারে, তাহা তিনি নির্দ্দেশ করিয়া যান। কোথায় প্রাণিজগতের শেষ এবং কোথায় বা উদ্ভিদ্-জগতের প্রারম্ভ, তাহা প্রকৃত নির্ণয় করা যায় না। কারণ এমন পদার্থ আছে, যাহাদিগকে আমরা প্রাণী ও উদ্ভিদ্ উভয়ই বলিতে পারি। প্রাণী ও উদ্ভিদ্-জগতের মধ্যে কোথায় যে বিশেষ বিভিন্নতা আছে, তাহা আমরা আজপর্য্যন্তও লক্ষ্য করিতে পারি নাই।

বিভিন্নতা কোথায়

জীবজন্তুর প্রাণ ধারণ অপেক্ষা উদ্ভিদের প্রাণ ধারণ অনেক সহজ। কেননা কোন একটী উদ্ভিদ্‌কে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেও উহার প্রাণহানির বিশেষ কোন সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উদ্ভিদের জীবযন্ত্র সমুদায় অতি সরল; একে অপরের উপর অধিক নির্ভর করে না। কিন্তু একটী উচ্চশ্রেণীর প্রাণী অত্যন্ত জটিল জীবযন্ত্রে নির্ম্মিত।

(ক) উদ্ভিদ্

যেহেতু, ঐ জীবের কোন একটী প্রধান যন্ত্র কোনরূপ আঘাত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে সেই প্রাণী অচিরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়; এবং শরীরের কোন একটী অংশ কোনরূপে অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবামাত্রই উহা নষ্ট হইয়া যায়।

(খ) প্রাণী

এই সকল ও এতদ্ভিন্ন আরও সুন্দর হৃদয়গ্রাহী তত্ত্ব সমুদায় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া এরিস্‌টট্‌ল্‌, তাঁহার প্রাকৃতিক ইতিহাসে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া যান।

দার্শনিক গবেষণার ফলে তিনি যে সমুদায় অমূল্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যান, এই প্রাকৃতিক ইতিহাস তাহার অন্যতম।

থিওফ্রেষ্টাস (Theophrastus)

থিওফ্রেষ্টাস্ এরিস্‌টটূলের একজন ভক্তশিষ্য ছিলেন। তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৭১ অব্দে ইরিসাস নগরে জন্ম গ্রহণ করেন ও জীবনের অধিকাংশ সময়েই উদ্ভিদ্‌বিদ্যা আলোচনা করিয়াছিলেন।

জীবনবৃত্তান্ত

তৎকালে যে সমস্ত গাছগাছড়া কেবলমাত্র ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হইত, তদ্ভিন্ন অন্যান্য উদ্ভিদ্-সম্বন্ধে গ্রীকগণের কোনও বিশেষ জ্ঞান ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু থিওফ্রেষ্টাস অন্যূন পাঁচ শত বিভিন্ন গাছ-গাছড়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বৃক্ষ, গুল্ম-প্রভৃতিকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া যান।

উদ্ভিদ্ বিদ্যা, শ্রেণী বিভাগ—বৃক্ষ, লতা গুল্ম ইত্যাদি

থিওফ্রেষ্টাস্‌ই **প্রথম উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ্** বলিয়া কথিত হন।

তৃতীয় যুগ

খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩২০ হইতে ২১২ পর্য্যন্ত

এরিস্‌টট্‌ল্ যে সময় এথেন্স নগরে বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছিলেন, গ্রীকগণ ঠিক সেই সময়েই মহাবীর আলেকজেণ্ডারের সেনাপতিত্বে মিসর দেশে রাজ্যবিস্তারে নিযুক্ত ছিলেন। মহাবীর আলেক্‌জেণ্ডার মিসর প্রদেশে রাজ্য সংস্থাপন করিয়া ভূমধ্যসাগরের উপকূলে নিজ নামে একটী নগর নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তন্নামখ্যাত এই আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া নগর তাঁহার অন্যতম প্রধান সেনাপতি টলেমী

লেগাসের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। টলেমী লেগাসের মৃত্যুর পর ঐ বংশের কয়েকজন রাজন্য ক্রমান্বয়ে আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই টলেমীর বংশধরগণ বিদ্যা ও বিজ্ঞানচর্চ্চার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আলেক্‌জেণ্ড্রিয়াতে যে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার বিজ্ঞানবিদ্যালয়

এই সময়ে গ্রীকগণ জ্যোতিষশাস্ত্রবিষয়ে বহুবিধ তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তন্মধ্যে কতকগুলি তত্ত্ব মিসরদেশবাসীদিগের নিকট হইতে তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জ্যোতিষ

তাঁহারা সৌরকক্ষ বা গগনমণ্ডলে নক্ষত্ররাজির মধ্য দিয়া পরিদৃশ্যমান (apparent) সূর্য্যের বার্ষিক গতির পথ বৃত্তাকারে অঙ্কিত করেন।

(১) সৌরকক্ষ

এই সূর্য্যপথ তাঁহারা দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটীকে এক-একটী নক্ষত্রপুঞ্জের নামানুসারে আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল নক্ষত্রপুঞ্জ অধিকাংশই আকৃতির অনুরূপে পশ্বাদির নাম গ্রহণ করিয়াছিল। যথা মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন। এই দ্বাদশটি নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা গঠিত বৃত্তকেই আমরা রাশিচক্র বলিয়া থাকি।

(২) রাশিচক্র

সূর্য্য ও নক্ষত্রপুঞ্জ একই সময় দৃষ্ট হয় না বলিয়া গগনমণ্ডলে নক্ষত্ররাজির মধ্য দিয়া সূর্য্যের গতি নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। এই জন্য তাঁহারা সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমনের প্রাক্‌কালে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী তারকাসমূহ নিরীক্ষণ করিতেন। প্রতিদিনই এই সকল

তারকারাশির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা ক্রমে সংবৎসরে দ্বাদশরাশির পরিবর্ত্তন অবলোকন করিয়াছিলেন।

এইরূপে তাহারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সূর্য্য সংবৎসরে দ্বাদশ রাশি পরিভ্রমণ করে। কিন্তু বালক দ্রুতগামী বাষ্পীয়রথে আরোহণ করিলে যেরূপ ভ্রমে পতিত হয় যে, ঐ রথ স্থির রহিয়াছে এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী গৃহ ও বৃক্ষাদি সবেগে ছুটিয়া যাইতেছে, তাৎকালিক গ্রীকগণও সূর্য্য ও পৃথিবীর গতিসম্বন্ধে ঠিক এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।

সূর্য্য ও পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে গ্রীকগণের মত

এরিস্‌টার্চাস্ (Aristerchus)

ইনি খৃষ্ট জন্মের প্রায় ৩ শত বৎসর পূর্ব্বে সামস্‌নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই, আলেক্‌জেণ্ড্রিয়াতে আগমন করিয়া বাস করিতেছিলেন। পরে কোন এক টলেমী-বংশধরের শিক্ষকপদে নিযুক্ত ছিলেন। আমরা অধুনা পৃথিবীর যে গতি প্রকৃত বলিয়া মনে করি, গ্রীক্‌জ্যোতির্ব্বেত্তৃগণের মধ্যে একমাত্র এরিস্‌টার্চাস তাহা প্রথম সপ্রমাণ করিয়াছিলেন।

জীবনবৃত্তান্ত

সূর্য্য নক্ষত্রাদির ন্যায় স্থির ও নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং পৃথিবী সৌরকক্ষের (ecliptic) চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে বলিয়া তিনি শিক্ষা দিতেন।

জ্যোতিষ
(১) সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর গতি

তিনি ইহাও জানিতেন যে, পৃথিবী পরিভ্রমণ কালে সৌরকক্ষের উপর ঠিক লম্বভাবে দণ্ডায়মান থাকে না। উহা ঐ কক্ষের উপর বক্র বা তির্য্যক্‌ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবীর মধ্য দিয়া উত্তর হইতে

(২) পৃথিবীর মেরুদণ্ড ও তাহার অবস্থানের প্রকৃতি

দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত যে সরল রেখা অঙ্কিত করা যায়, তদুপরি সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। কক্ষের (ecliptic) উপর পৃথিবীর এই বক্র অবস্থানের জন্যই ঋতুভেদ পরিলক্ষিত হয়।

(৩) ঋতুভেদের কারণ

কোন একটী প্রদীপকে সূর্য্যস্বরূপ, এবং কমলালেবুকে পৃথিবীর ন্যায় একটী গোলাকার পদার্থ মনে করিয়া, কমলালেবুটীকে তির্য্যক্‌ভাবে যদি ঐ আলোর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করান যায়, তবে এই ঋতুভেদ সহজে উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

কমলালেবুর দুই প্রান্তভাগ বা চাপা অংশের মধ্য দিয়া একটী শলাকা বিদ্ধ কর। এবং উহা অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা আবদ্ধ কর। লেবুকে লম্বভাবে দণ্ডায়মান না করিয়া অঙ্গুষ্ঠকে তর্জ্জনী হইতে শরীরের নিকট-বর্ত্তীস্থানে রক্ষা কর। তবে ঐ শলাকা বক্রভাবে দণ্ডায়মান হইবে। আমরা এই প্রান্তভাগ বা চাপা অংশকেই পৃথিবীর মেরুপ্রান্ত ও এই বিদ্ধ শলাকাকেই মেরুদণ্ড বলিয়া থাকি। এক্ষণে আমরা যদি ঐরূপ বক্রভাবে দণ্ডায়মান কমলালেবুকে (পৃথিবী) প্রদীপের (সূর্য্যের) চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া লেবুতে পতিত আলো ও ছায়া লক্ষ্য করিতে থাকি, তবেই দেখিতে পাইব—কোন সময় উত্তর চাপা অংশ (মেরুপ্রান্ত) আলোর সম্মুখ হওয়ায় সম্পূর্ণ উজ্জ্বল হইয়াছে, এবং সেই সময়েই দক্ষিণের চাপা অংশ (দক্ষিণ মেরু) আলো হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছায়াতে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এই সময় সূর্য্যের রশ্মি উত্তর ভাগে লম্বভাবে পতিত হওয়ায় তথায় গ্রীষ্মকাল, ও দক্ষিণভাগে তির্য্যক্ (তের্চ্চা) ভাবে পতিত হওয়ায় তথায় শীতকালের প্রাদুর্ভাব, এবং উত্তর মেরুপ্রান্ত বহুদিন সম্পূর্ণ উজ্জ্বল থাকাতে গ্রীষ্মকালের লম্বা দিন, ও দক্ষিণ মেরুপ্রান্ত বহুদিন অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকায়

(ক) গ্রীষ্ম

শীতকালের লম্বা রাত্রি ভোগ হইয়া থাকে। তৎপরে ঐ লেবুকে ঐরূপ অবস্থাতে দক্ষিণ দিকে পরিভ্রমণ করাইয়া বৃত্তের চতুর্থাংশ স্থানে আনিলেই

(খ) শরৎ

উভয় মেরুপ্রান্ত সমান আলো প্রাপ্ত হওয়ায় পৃথিবীর উত্তরভাগে শরৎ ও দক্ষিণভাগে বসন্তকালের সমাগম হয়। পুনর্ব্বার ঐরূপে পরিভ্রমণ করাইয়া বৃত্তের পরবর্ত্তী চতুর্থাংশ স্থানে আনিলেই দক্ষিণ মেরুতে গ্রীষ্মকাল ও উত্তর মেরুতে শীতকালের প্রাদুর্ভাব হয়। এইরূপে ক্রমে চতুর্থ বা শেষ অংশের প্রারম্ভে আনয়ন করিলেই পুনর্ব্বার উভয় মেরুপ্রান্ত সমান আলো প্রাপ্ত হওয়ায় উত্তর ভাগে বসন্ত ও দক্ষিণভাগে শরৎকালের সমাগম হয়।

(গ) শীত

(ঘ) বসন্ত

পৃথিবীর কক্ষের উপর উহার মেরুদণ্ডের বক্র অবস্থানের জন্যই যে ঋতুভেদ হইয়া থাকে, এই তত্ত্ব এরিস্‌টার্চাসই প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের উপর প্রতিদিন ঘুরিয়া আসার জন্য যে, দিনরাত্রি ভেদ হইয়া থাকে, তাহা গ্রীক্‌গণের মধ্যে তিনিই বোধ হয় প্রথম বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

(৪) দিবারাত্রিভেদ

গ্রীক্‌গণ তাঁহার এই আবিষ্কৃত তত্ত্বসমূহ, বিশেষতঃ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর পরিভ্রমণ যদি উপলব্ধি করিতেন, তবে বোধ হয় জ্যোতিষ-শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহারা আরও বহুবিধ তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু তাঁহার এই সকল আবিষ্কৃত তত্ত্ব কেহই বিশ্বাস করেন নাই। ১৭০০ বৎসর পরে কোপারনিকাস্ এই প্রধান তত্ত্ব পুনরায় আবিষ্কার করেন। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর পরিভ্রমণ বিষয়ে এই সমুদয় গ্রীককল্পনাকে "পিথ্যাগোরীয় মত" বলা হয়; কারণ পিথ্যাগোরাস্ এই তত্ত্বসমুদয় আবিষ্কার

পিথ্যাগোরীয় মত

করিয়াছিলেন বলিয়া প্রথমে অনুমান করা হইয়াছিল; কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, পৃথিবী শূন্য পরিভ্রমণ করিতেছে বলিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহা যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহা তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

ইউক্লিড্ (Euclid)

আমরা ইউক্লিডের ন্যায় বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্যামিতিবেত্তার নাম উল্লেখ না করিয়া খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী অতিক্রম করিতে পারিলাম না। তিনি আলেকজেণ্ড্রিয়াতে প্রায় খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

(১) গণিত—জ্যামিতি

তিনি বহুবিধ প্রতিজ্ঞা সঙ্কলন করিয়া "ইউক্লিডের জ্যামিতি" নামে বিখ্যাত গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। আমরা তাঁহার এই জ্যামিতিই অধুনা প্রত্যেক বিদ্যার্থীর হস্তে দেখিতে পাই।

তিনি যে সমুদায় গ্রন্থাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান করা আমাদের পক্ষে একান্ত দুরূহ। কিন্তু আমরা তাঁহার অন্যান্য

(২) অন্যান্য গ্রন্থাবলী
পদার্থ বিজ্ঞান—আলোকরশ্মি

আবিষ্কৃত তত্ত্বের মধ্যে "আলোকরশ্মি সরল-রেখাক্রমে গমন করে" এই একমাত্র তত্ত্ব উল্লেখ করিতে পারি।

যদি একটী সূর্য্যরশ্মি কোন একটী ধূলিসংযুক্ত অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করান যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই, ঐ রশ্মি সরল-রেখাক্রমে প্রবিষ্ট হইয়া ও তৎপথস্থিত বালুকাকণাগুলিকে উজ্জ্বল করিয়া ভূমি বা দেওয়ালে পতিত হইয়াছে। এক্ষণে বিশেষরূপ লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, সূর্য্যের কেন্দ্র ছিদ্রের মধ্যস্থল ও আলোকিত স্থানের মধ্যবিন্দু একই সরলরেখায় অবস্থান করিতেছে।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত।

জনশ্রুতি সংগ্রহ

আমাদের দেশে পল্লীবাসিকল্পিত, জনশ্রুতি ও প্রবাদমূলক ইতিহাসের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ আখ্যায়িকা ও পুরাকাহিনীর মৌলিক অনুসন্ধানপ্রসূত ইতিহাস রচনা না হইলে আমাদের দেশের ইতিহাস কোন দিন সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না। বঙ্গসাহিত্যে এই বিচিত্র ঐতিহাসিক গবেষণা আদৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জনশ্রুতি-ও কিম্বদন্তী-সংগ্রহ।

আমাদের ঐতিহাসিকগণকে সকল স্থান স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া পল্লী-সমূহ হইতে প্রবাদ, জনশ্রুতি, আখ্যায়িকা ও কাহিনী সংগ্রহ করিতে হইবে। এইরূপে পল্লীসমূহই তাঁহাদের ভিতর দিয়া কথা বলিবার এবং ইতিহাস লিখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। ইহাতে ইতিহাস একদিকে পল্লীবিষয়ক হইবে, অপরদিকে ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে পল্লীরচিত এবং পল্লীকল্পিত ভাবে নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিবে। ঐতিহাসিকগণ নীরব পল্লীর মুখে ভাষা প্রদান করিয়া পুরাতন আচার, পুরাতন শিল্প-বাণিজ্য এবং পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া সত্য-সত্যই পল্লীর কথা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন।

আমাদের দেশের ইতিহাসের অসম্পূর্ণতা (১) তথ্য সমূহের অর্থ-গ্রহণে দুরূহতা।

নানা কারণে আমাদের দেশের ইতিহাস অসম্পুর্ণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ, যে সমুদায় ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত বা আবিষ্কৃত হয়, অনেক স্থলে তাহাদের প্রকৃত মর্ম্ম ও ভাব হৃদয়ঙ্গম করা সুসাধ্য হয় না। সাধারণতঃ, বিপক্ষীয়েরা অথবা বিদেশীয়েরা আমাদিগের ইতিহাসের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া তাঁহারা এ দেশের কোন অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন না। বিভিন্নজাতীয়ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ

এ দেশের জাতীয়জীবনের মধ্যে এই সমুদয় তথ্যের স্থান নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এতদ্ব্যতীত জীবিতাবস্থায় সমাজের যে ভাবভঙ্গী বর্ত্তমান ছিল, অন্যান্য সমাজের সহিত যে সূত্রে ইহা সম্বদ্ধ ছিল, বর্ত্তমান কালে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না বলিয়া স্বদেশীয় ঐতিহাসিকদিগেরও অনেক সময়ে সূত্র হারাইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং যে কারণেই হউক, তথ্য-সমূহের যথার্থ গুরুত্বনির্দ্ধারণ এবং ইহাদের সহিত প্রকৃত পরিচয় ও সহানুভূতির অভাবেই প্রধানতঃ আমাদের ইতিহাসের অসম্পূর্ণতা সাধিত হইয়াছে।

(২) তথ্যসংগ্রহ-প্রণালীর দোষ

দ্বিতীয়তঃ, তথ্যসংগ্রহবিষয়েও আমাদের অনেক অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে। আমাদের দেশের ঐতিহাসিকগণ কেবলমাত্র রাজদরবারের এবং রাজপরিবারের কার্য্যকলাপ ও পরিবর্ত্তনের মধ্যেই ইতিহাস উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি কেবলমাত্র সরকারী চিঠি, দলিল-পত্র, যুদ্ধের বৃত্তান্ত এবং সৈন্যের গমনাগমনের পথের বিবরণ দ্বারাই আকৃষ্ট হয়। তাঁহারা রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, সাহিত্য, সভ্যতা, শিক্ষা, পদ্ধতি, ধর্ম্ম, শিল্প, বাণিজ্যপ্রভৃতি সমাজের প্রকৃত অভিব্যক্তির সহিত পরিচিত নহেন। বিশেষতঃ, প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থার বিবরণ-বিবর্জ্জিত এই রাষ্ট্রীয় ইতিহাস-সমূহ কেবলমাত্র বিজেতৃগণের দ্বারাই রচিত হইয়াছে। এদেশে কোন যুগে কেহ জাতীয় ইতিহাস লিখিয়াছেন কি না সন্দেহ। সুতরাং ঐতিহাসিক তথ্য- ও উপকরণ-সংগ্রহের জন্য ঐতিহাসিকদিগকে প্রধানতঃ রাজদরবার-সংসৃষ্ট লেখকগণের উপর নির্ভর করিতে হয়।

এতদ্ব্যতীত আর এক কারণে তথ্যসংগ্রহবিষয়ে এ দেশে বিশেষ দুর্যোগে পড়িতে হয়। এখানে ভিন্ন-ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন-ভিন্ন ধর্ম্মের

ধর্ম্মভেদে তথ্যসমূহের জটিলতা

উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, অভ্যুদয় এবং অবনতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, সাহিত্য, কলা, স্থাপত্যপ্রভৃতিকে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। এজন্য জাতীয় সভ্যতার বিকাশের মধ্যে ইহাদের কাল- ও স্থান-নিরূপণ অনেক সময়ে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

যে দেশে কোন বিশেষ ব্যক্তি, স্থান, ঘটনা বা আচারের ঐতিহাসিকতা-সম্বন্ধে সাধারণতঃ সামসময়িক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং যাহা

জনশ্রুতির ঐতিহাসিক মূল্য—জন সাধারণ-রচিত ইতিহাস

প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার মধ্যেও আবার ভিন্ন-ভিন্ন চিন্তাপদ্ধতির চিহ্ন লক্ষিত হয়, সেই দেশে প্রকৃত ইতিহাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রবাদ- ও জনশ্রুতি-সমূহের আশ্রয় গ্রহণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এরূপ অবস্থায় সামান্য-সামান্য আখ্যায়িকারও ঐতিহাসিক মূল্য আছে। বর্ত্তমান লোকসমাজ পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিসম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছে, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা পোষণ করে, তাঁহাদিগকে যে ভাবে সম্মান করে, এই সকল কিংবদন্তী ও প্রচলিত ধারণার মধ্য হইতে সকল দেশের ঐতিহাসিকই ইতিহাসরচনার উপাদানসংগ্রহ করিয়া থাকেন। যাহাদিগকে প্রধানতঃ রাজসভার কবি অথবা রাজ-ধর্ম্মাবলম্বী লথকসম্প্রদায়ের আংশিক বিবরণের মধ্য হইতেই পিতৃ-পুরুষদিগের সমাজজীবন নিরীক্ষণ করিতে হইবে, তাহাদিগের পক্ষে পল্লীর কথা, পল্লীকাহিনী, এবং পল্লীকল্পিত ইতিবৃত্তের অনুসন্ধানে বিশেষ মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। কোন কোন স্থলে তথ্যসমূহ ভ্রমপূর্ণ হইলেও এরূপ চেষ্টায় ইতিহাসের অন্য এক দিকের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে, ইতিবৃত্তের এক সম্পূর্ণ নূতন দৃশ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে; এবং নূতন উপায়ে ইতিহাসের আলোচনা আরব্ধ হইয়া ইতিহাসকে নূতন

ভাবে রঞ্জিত করিয়া বর্ত্তমান ইতিহাসের রূপ পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে। ইহাতে প্রচলিত ইতিহাসরচনাপদ্ধতি নূতন পদ্ধতির আলোক প্রাপ্ত হইবে; এবং পরস্পরের সহায়তায় দেশের ইতিহাস ক্রমশঃ সম্পূর্ণতা ও বৈজ্ঞানিকতার দিকে অগ্রসর হইবে।

ইতিহাসের নূতন উপকরণ—পল্লীসমাজে প্রচলিত প্রবাদ, জনসাধারণের কল্পনা

সুতরাং ঐতিহাসিকদিগকে এখন হইতে নূতন উপায়ে উপকরণ-সংগ্রহ করিবার জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে। আমাদের ইতিহাসালোচনার প্রথমাবস্থায় বিদেশীয় ঐতিহাসিকদিগের পুস্তকের অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করাই ঐতিহাসিক দিগের উদ্দেশ্য ছিল। ক্রমশঃ প্রাচীন পুঁথি-মুদ্রা, তাম্রশাসন, সাহিত্যপ্রভৃতি আলোচনা করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক প্রণালীতে রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, সমাজপ্রভৃতি বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রবন্ধাদি রচিত হইতেছে। এই সকল উপকরণের মধ্যে পল্লীসমাজে সংগৃহীত প্রবাদ,- কাহিনী- ও জনশ্রুতি-সমূহের বিশেষ স্থান অধিকার করা উচিত। ভারতবর্ষের সভ্যতা পল্লীজীবনেই বিকাশ লাভ করিয়াছে। যদিও বর্ত্তমান কালে পল্লীসমূহ জীবন হারাইয়া নূতন ভাব- ও শক্তি-সমূহের মধ্যে গৌরবের স্থান প্রাপ্ত হয় না, তথাপি ইহারই মধ্যে পুরাতন আদর্শ স্থায়িরূপে নিহিত রহিয়াছে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে। আধুনিক রুচির বিরুদ্ধ হইলেও যাহারা এখন নিরক্ষর, অসভ্য, অথবা বিকাশহীন fossil এর ন্যায় সভ্যতার অতিনিম্নস্তরে, বনে-জঙ্গলে অথবা সামান্য গ্রামে বাস করে, তাহাদের উৎসব, পূজা, কথা-বার্ত্তা, চাল-চলন, আদর্শ-নিষ্ঠা সমুদয়ই পুরাতন জীবন্ত সভ্যতার সাক্ষী এবং তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সুতরাং পল্লীর প্রবাদসমূহ অতীত সম্বন্ধে যে সাক্ষ্যদান করিবে, তাহাতেই অতীতের ইতিহাস অনেক

পরিমাণে পরিষ্কার হইয়া আসিবে। এই জনশ্রুতিপ্রভৃতির সহিত পুঁথির তথ্য, তাম্রশাসনের প্রমাণ মিলাইয়া দিতে পারিলেই এই সমুদয় ঐতিহাসিক উপকরণসমূহও সজীবতা লাভ করিবে।

আমাদের ঐতিহাসিক চিন্তাপ্রণালীকে এখন হইতে ক্রমশঃ জনশ্রুতি, প্রবাদ, আখ্যায়িকা কথকতাপ্রভৃতি প্রচলিত কাহিনীসমূহের বিবরণ-সংগ্রহের দিকে চালিত করিতে হইবে। এইরূপে এক দিকে সমাজিক সভ্যতার ইতিহাস রচিত হইয়া রাষ্ট্রীয় সভ্যতার ইতিহাসের সহিত যুক্ত হইলে ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবে, ও কেবলমাত্র রাজ-দরবারের ইতিহাসের পরিবর্ত্তে সাধারণ জনসমাজের কার্য্যকলাপের বিবরণ পাওয়া যাইবে; এবং অপর দিকে জনসাধারণের ইতিহাসসম্বন্ধে যেরূপ ধারণা আছে তাহার চিত্র পাওয়া যাইবে। এই উপায়ে প্রকৃত জাতীয় ইতিহাস রচিত হইতে পারিবে, কেননা ইহা প্রথমতঃ সমাজবিষয়ক, এবং দ্বিতীয়তঃ সমাজকথিত ও সমাজকল্পিত।

নূতন আলোচনার ফল—প্রকৃত জাতীয় ইতিহাস সৃষ্টি

শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের উদ্দেশ্য

স্বর্গীয় গিরিজা বাবু তাঁহার বিখ্যাত সমালোচনার একস্থানে লিখিয়াছেন যে, কপালকুণ্ডলা বঙ্কিম বাবুর প্রথম স্তরের উপন্যাস, এবং বিশেষ কোন উদ্দেশ্য-সাধনার্থ তিনি ইহা লেখেন নাই। এই উপন্যাসে "কেবল মাত্র সরস ও সুপাঠ্য আখ্যায়িকায় নিষ্কাম সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই গ্রন্থকারের একমাত্র চেষ্টা ছিল।" কিন্তু আমরা তাঁহার মত সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

কেন পারিলাম না, তাহাই বলিতেছি। কপালকুণ্ডলা বইখানি শেষ করিয়া কেবল এই কথাই আমাদের মনে হইতে থাকে, কবি এ উপন্যাসখানি কেন লিখিলেন? কেন নবকুমার কোথায় কোন গহন বনে কাপালিকের হস্ত হইতে এমন সুন্দরী স্ত্রী পাইয়াও তাহার সঙ্গসুখ উপভোগ করিতে পারিলেন না—সে তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া চৈত্রবায়ু-সন্তাড়িত নদীর তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে হইতে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল? আর নবকুমারও তাহাকে ধরিবার জন্য বৃথায় নদীবক্ষে ঝাঁপ দিলেন কেন? "কপালকুণ্ডলা" বইখানার মধ্যে কপালকুণ্ডলা এত অল্পস্থান অধিকার করিয়া অল্পদিনের জন্য জগৎ-লোচনের সম্মুখে দাঁড়াইল কেন?

পৃথিবীতে কৃত্রিম ও অকৃত্রিমের মধ্যে চিরদিন সংমিশ্রণ-সংগ্রাম চলিয়াছে। আমরা তাহার সংবাদ রাখিয়াও রাখি না। স্বভাবের শিশুকে সংসারের বিজ্ঞতার মধ্যে টানিতে গিয়া গৌরচন্দ্রিকায় আমরা কতখানি যুদ্ধ করিয়া থাকি, তাহা আমরা জানিয়াও জানিতে চাহি কি?

আমরা সে চেষ্টায় কখন সফল হই, কখন হই না। সফল এই অর্থে যে, অনেকাংশেই শিশুকে কৃত্রিম করিতে পারি, অর্থাৎ তাহার হৃদয়টাকে অনেক সহজ বৃত্তি হইতে চ্যুত করিয়া ফেলিতে পারি। কিন্তু তবুও যাহা প্রকৃতির সত্য, তাহা কখনও কৃত্রিমতার মিথ্যায় ধরা দেয় না। তাহা হইলেও ধরিবার জন্য শত সহস্র চেষ্টা চারিদিকে প্রতিনিয়ত হইতেছে, এবং প্রতিনিয়ত ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। তবু চেষ্টার বিরাম নাই! ব্যাকুলতার নিবৃত্তি নাই! প্রকৃতি কিন্তু কোন অননুভূত দিবস হইতেই অপ্রকৃতির কাছে—

" *   *   * হয়ে গেছে সাবধানী,
মাথাটী ঘেরিয়া বুকের উপরে আঁচল দিয়াছে টানি।"

কবি সেই কৃত্রিম ও অকৃত্রিমের মিলনচেষ্টা, বিফলতা ও অনিবৃত্ত ব্যাকুলতাকে এই উপন্যাস কাব্যখানিতে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। কপালকুণ্ডলার চরিত্র তাই আমাদের সংসারের আদর্শ চরিত্র নহে, সে চরিত্র সংসারে কখনও ঘর বাঁধিতে পারে না। কৃত্রিমের সহিত তাহার সংস্থিতি কখনও সম্ভব নহে। সে চরিত্র কেবল সেইখানেই শোভা পায়,—যেখানে কৃত্রিম মানুষের স্পর্শ নাই! যেখানে প্রকৃতির অবাধ বিস্তার জলস্থল পূর্ণ করিয়া হাস্যময়!

গ্রন্থকার তাই সাধারণ ভাবে—স্থূলভাবে উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার প্রথমমিলনস্থান অতিসুন্দররূপে মনোনীত করিয়া লইয়াছেন। কোথায়? বনাচ্ছন্ন সমুদ্রতীরে! সেইখানে প্রদোষের অন্ধকারে—যখন অস্পষ্ট সৌন্দর্য্যের রহস্যময় অভিনয় হইতে থাকে—দুইজনের আকস্মিক দেখা হইল। কে কাহাকে দেখিল? বিশ্বপ্রকৃতি একটী অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তির মধ্যে ধরা দিয়াছে, আর পৌরুষ কৃত্রিমতা নবকুমাররূপে তাহার দিকে চাহিয়া আছে!—কি বিস্ময়! "সেই

গম্ভীরনাদী বারিধি-তীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া” ভগবানের সৃষ্ট ও অসৃষ্ট পরস্পরের প্রতি স্থিরদৃষ্টি! কি রহস্য! কি সুন্দর!

তারপর কবি মনোনীত করিয়াছেন আরেক দিন—সেটী বিয়োগের দিন! সন্থবিগত চন্দ্রমা—অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি—জনশূন্য নদীসৈকত—অস্থিপূর্ণ পরেতভূমি। আজ কৃত্রিম ও অকৃত্রিমের প্রভেদদিন। নিগূঢ় সত্য-উপলব্ধির দিন। আজ কপালকুণ্ডলাকে কিছুতেই রাখিবার উপায় নাই। নবকুমারের প্রসারিত বাহুর মধ্যে সে আজ কিছুতেই ধরা দিতে পারে না। ভগ্নতটমৃত্তিকাখণ্ডের সহিত অকস্মাৎ কপালকুণ্ডলা নদী-প্রবাহ মধ্যে ভাসিয়া যায়। লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেও নবকুমার তাহাকে ধরিতে পারেন না। তখন “অনন্তগঙ্গাপ্রবাহমধ্যে বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে” কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার অনন্ত-কাল ধরিয়া চলিয়া যাইতে থাকে। কোথায়? নবকুমার তাহাকে ধরিবেন কোথায়? বিশ্বপ্রকৃতিকে কৃত্রিমতা ধরিবে কোথায়? কোথায় উভয়ের মিলনসূত্র? তবু কৃত্রিমের প্রাণ কাঁদে। তবু কৃত্রিম তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হয়। একদিন এই ধাবমান কৃত্রিমের মিলনাকাঙ্ক্ষা কবি গেটের চিত্তে আঘাত করিয়াছিল। তিনি সেই মিলনসূত্রগাছি খুঁজিয়া-ছিলেন, কিন্তু পান নাই। আবেগবিহ্বল মিলনব্যাকুল কবি তখন বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

“Where shall I grasp thee,
Infinite Nature, where?”

ঐ where—ঐ কোথায়—ঐ প্রশ্ন—ঐ ক্রন্দন পর্য্যন্তই শেষ!

আরেক দিন আমাদের ঘরের কবি—আমাদের আঙ্গিনার কবি “প্রকৃতির প্রতি” চাহিয়া ঐ কথাই বলিয়াছিলেন—

"প্রাণ মন পাশরিয়া ধাই তোর পানে
নাহি দিস্ ধরা।
দেখা যায় মৃদু মধু কৌতুকের হাসি
অরুণ-অধরা!
যদি চাই দূরে যেতে—কত ফাঁদ থাক পেতে
কত ছল কত বল চপলা মুখর!
তবে ত করেছ বশ এমনি করিয়া
অসংখ্য পরাণ!
যুগ যুগান্তর ধরে, রয়েছে নূতন
মধুর বয়ান।
সাজি শতমায়া বাসে—আছ সকলের পাশে
তবু আপনারে কা'রে কর নাই দান।
যত অন্ত নাই পাই তত জাগে মনে
মহারূপরাশি,
তত বেড়ে যায় প্রেম যত পাই ব্যথা,
যত কাঁদি হাসি,
যত তুই দূরে যাস, তত প্রাণে লাগে ফাঁস,
যত তোরে নাহি বুঝি তত ভালবাসি।"

এই যে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকের চির মিলনদ্বন্দ্ব, ইহাই কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের ইতিহাস। উভয়ের প্রভেদ সত্য উপন্যাসের নায়কনায়িকার ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া আর কেহ পারিয়াছেন কি না জানি না।

ঋষ্যশৃঙ্গ দেখিয়াছি, শকুন্তলা দেখিয়াছি, দেখিয়াছি ইউরোপের মিরন্দা। কিন্তু সকলের মধ্যেই অসীম প্রকৃতির উপরে সসীম কৃত্রিমতার

জয় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এ কথা সকলেই জানেন—প্রকৃত জয়লাভ কখনও হয় না, এক স্থানে কি এক স্থানে প্রভেদ রহিয়া যায়ই। বঙ্কিম বাবু সেই সত্যটুকু গ্রহণ করিয়াছেন।

এই কপালকুণ্ডলা-সম্বন্ধে একটী বন্ধুর কাছে শুনিয়াছি যে, যখন ইহার উপসংহার "মৃণ্ময়ী" প্রকাশিত হয়, তখন নাকি বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন, "আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি যে, কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার সেই গঙ্গাপ্রবাহ-মধ্যে ডুবিয়া মরিয়াছিল।" কথাটা সত্য হউক বা না হউক, কথাটীর মূলে সত্য নিহিত আছে। আমরা মৃণ্ময়ীর গ্রন্থকারের কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি বঙ্কিম বাবুর কোন মত অবগত নহি। তবে পুস্তক খানি আমার অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে লেখা,—বিশেষত মেসের ছেলে-পেলেদের তাড়নায় লেখা। উহার সমস্ত ত্রুটি আপনাদিগকে মাপ করিতে হইবে।"

তা যাই হউক, বঙ্কিম বাবুর উদ্দেশ্য যথার্থই ছিল—ঐরূপ তুইটী পুরুষ ও স্ত্রীর আকস্মিক মিলন ও বিরহের মধ্য দিয়া জগতের একটী সূক্ষ্ম সত্যকে প্রকাশ করা। গ্রন্থকারের ইচ্ছাই ছিল এই যে, বইখানা শেষ করিবার পর পাঠকের মনে যেন একটা hankering—একটা ব্যাকুলতার ভাব জাগ্রত হইয়া থাকে। যে বিফল ব্যাকুলতা লইয়া নবকুমার অন্তর্হিত হইলেন, সেই বিফল ব্যাকুলতা পাঠকের মনে যেন স্পষ্টীভূত হইয়া রহে। যিনি এই গূঢ় কথাটীকে ধরিতে পারেন নাই, তিনি আবার কপালকুণ্ডলাকে "মৃণ্ময়ী" রূপে সংসারে দেখিতে চাহেন।

আমার বিশ্বাস, এই কোমলভাবকেন্দ্রীভূত উপন্যাসখানি নাটকাকারেও পরিণত হইতে পারে না। কিন্তু তবুও অনেকে ইহার নাট্যাকার প্রকাশ করিয়াছেন, এবং যতদূর পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে, কপালকুণ্ডলার চরিত্র অভিনয় করিয়া কেহই আজ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হন নাই।

এখন কথা হইতে পারে, যদি গ্রন্থকারের ইচ্ছা ঐরূপই ছিল, তবে কাপালিক, মতিবিবি, শ্যামাপ্রভৃতি চরিত্র-অঙ্কনের ত কোন প্রয়োজন বুঝা যায় না। আমরা বলি, তাহাও বুঝা যায়। এই জগৎ-ব্যাপারের কোন জিনিসেরই সৌন্দর্য্য একক উপলব্ধ হয় না। একটীকে বুঝিতে গেলে, আরেকটীর প্রয়োজন। আমরা অলোককে তখনই উজ্জ্বল ভাবে দেখিতে পাই—যখন তাহার চারিদিকের অন্ধকার ঘনীভূত। তাই কপালকুণ্ডলাকে পরিষ্কাররূপে দেখাইবার জন্য শুধু নবকুমার যথেষ্ট নহেন, ভীষণ তান্ত্রিক ক্রিয়াদির কাপালিক চাই, ঐশ্বর্য্যবিলাসলালিতা মতিবিবি চাই, পতিসম্ভোগসুখবিরহিতা শ্যামাসুন্দরী চাই।

তারপর দেখিতে হইবে, বঙ্কিম বাবু আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে উপন্যাসের সাহায্য যখন গ্রহণ করিয়াছেন, তখন সাধারণ পাঠককে উপন্যাসের আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিলে অন্যায় করা হয়। একদিকে উপন্যাসের মাধুর্য্য ঘনীভূত হইয়া উঠিবে, অন্য দিকে গ্রন্থের উদ্দেশ্য সার্থক হইয়া দাঁড়াইবে, ইহাই ত প্রতিভার কাজ।

এখন আমরা দেখিব, উপন্যাসের মধ্য দিয়া গ্রন্থকার আপনার উদ্দেশ্য কিরূপ ভাবে সফল করিয়াছেন।

কপালকুণ্ডলা কাপালিক-পালিতা। অধিকারী ও কাপালিক, এই দুইয়ের সংসর্গে তাহার যতটুকু অভিজ্ঞতা জন্মিতে পারে, তাহাই হইয়াছে।

তারপর কাপালিকের নৃশংস ব্যাপারে কপালকুণ্ডলার হৃদয়ের সহজ বৃত্তিগুলি ক্রমশই বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল, এবং সেই সময়েই যখন নবকুমারকে হত্যা করিবার জন্য কাপালিক উদ্যত, তখন তাঁহার জীবন-রক্ষা করিয়া সে হৃদয়ের সহজবৃত্তিরই পরিচয় দিয়াছিল। আবার অধি-কারীর আশ্রয়ে নবকুমারকে রাখিয়া যখন সে "সমুদ্রতীরে প্রত্যাগমন

করিবার উদ্যোগ" করিল, তখনই বুঝিলাম, বিদ্রোহের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে—এখন আবার সে প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট।

কপালকুণ্ডলার ধীরোচ্চারিত "বি—বা—হ" কথাটি তাহার প্রকৃতির পরিচায়ক। অধিকারী বিবাহের ব্যাখ্যা করিয়া মনে করিলেন, সকলই বুঝাইলেন; কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন, সকলই বুঝিলেন এবং বলিলেন, "তাহাই হউক—কিন্তু তাঁহাকে (অর্থাৎ কাপালিককে) ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না। তিনি যে আমাকে এতদিন প্রতিপালন করিয়াছেন।" কি সহজ! কি সুন্দর!

কেন প্রতিপালন করিয়াছেন, অধিকারী তাহার কারণ অস্পষ্ট রকমে বুঝাইলেন। তান্ত্রিক সাধনা কি না। কপালকুণ্ডলা কিন্তু কিছুই বলিল না, তাহার বড় ভয় হইল। বলিল, "তবে বিবাহই হউক।"

এইখানে ইউরোপের মিরন্দার কথা না বলিয়া পারিলাম না। দ্বীপ-সঙ্কীর্ণতার মধ্যে প্রতিপালিতা মিরন্দা তাহার পিতার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে একস্থানে বলিতেছে—

"Good wombs have borne bad sons."

আর একস্থানে জীবনে নবপরিচিত তৃতীয় ব্যক্তি ফার্দিনান্দের কাছে বলিতেছে—

"I am your wife, if you will marry me,
If not, I'ill die your maid, to be your fellow,
You may deny me; but I'ill be your servant."

এরূপ প্রণয়বাণী মিরন্দার মত লোকের মুখে কতদূর স্বভাবসঙ্গত, বিজ্ঞ তাহা বিচার করিবেন। আমাদের কিন্তু কপালকুণ্ডলার ঐ ধীরোচ্চারিত "বি—বা—হ" কথাটাই সুন্দর ও মধুর লাগে! বস্তুত মিরন্দা পরদুঃখকাতর হইলেও কপালকুণ্ডলা হইতে—আমাদের অভিলষিত

প্রকৃতি হইতে—অনেক বিভিন্ন। এখানে ভয়ে-ভয়ে আর একটী কথাও বলি। আমাদের শকুন্তলাও কিন্তু কপালকুণ্ডলা নহেন। তাহার কারণ আছে, সন্দেহ নাই। অনসূয়া, প্রিয়ংবদা, কণ্ব, গৌতমী-প্রভৃতির সংসর্গে তিনি অনেকটা বিজ্ঞ। কিন্তু তবুও দুষ্মন্তকে দেখিয়া যখন তিনি মনে মনে বলিয়া ফেলিলেন,—

"কিং ণু কৃখু ইমং জণং পেক্‌খিঅ তবোবণবিরোহিণো বিআরস্‌স গমনীয়ম্‌হি সংবুত্তা ?"

এই ব্যক্তিকে দেখিয়া আমার তপোবনবিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে কেন ?

তখন কপালকুণ্ডলার কথা মনে হয়। কই নবকুমারকে দেখিয়া তাহার মনে ত এরূপ কোন ভাবেরই উদয় হয় নাই ? তখন ঋষ্যশৃঙ্গের কথা মনে পড়ে—কই তিনি ত, তাঁহার জীবনে যখন প্রথম দেখিলেন, উদ্দামযৌবনসম্পদ্‌ভূয়িষ্ঠা সুন্দরীগণ বিভ্রমবিলাসচতুরচলাপাঙ্গদৃষ্টি লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত, তখন পুষ্পনায়কের কোন শরাঘাত অথবা তপোবনের বিরোধী কোন ভাবেরই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

যাঁহারা instinct অর্থাৎ স্বাভাবিকপ্রবৃত্তি-বাদী, তাঁহারা ইহার একটা ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহা সব সময়েই ঠিক হয় না। আমরা কপালকুণ্ডলার সম্বন্ধেও তাই বলি। তা যা'ক।

অধিকারীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া কপালকুণ্ডলা মতিবিবিকে যখন দেখে, তখন দুই জনের কেহই কোন কথা কহে নাই। কবি বলিতেছেন, "মতি মুগ্ধা, কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিতা।" কপালকুণ্ডলা তাহার জীবনে এই প্রথম স্ত্রীলোক দেখিল। তারপর মতিবিবির প্রদত্ত অলঙ্কারে শোভিত হইয়া সে যখন শিবিকারোহণে যায়, তখন এক ভিক্ষুক আসিয়া তাহার কাছে ভিক্ষা চাহিতে আরম্ভ করিল। কপালকুণ্ডলা

বলিলেন,—"আমার ত কিছু নাই। তোমাকে কি দিব?" ভিক্ষুক কপালকুণ্ডলার অঙ্গের অলঙ্কার দেখাইয়া বলিল—"সে কি মা! তোমার গায়ে হীরা মুক্তা—তোমার কিছুই নাই!" কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন—"গহনা পাইলে তুমি সন্তুষ্ট হও?" বিস্মিত ভিক্ষুক বলিল, "হই বই কি?"

কপালকুণ্ডলা অকপটহৃদয়ে কৌটাসমেত সকল গহনাগুলি ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন। ক্ষণমাত্র বিহ্বল ভিক্ষুক এদিক ওদিক চাহিয়া সে গুলি লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। কপালকুণ্ডলা ভাবিলেন "ভিক্ষুক দৌড়িল কেন?"

এটা বিস্ময়। অরণ্যপালিতা কপালকুণ্ডলার বিস্ময়,—সংসারবুদ্ধি-বিরহিত মানুষের বিস্ময়;—অপ্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির আপাতপরিচয়ের বিস্ময়। কপালকুণ্ডলা এই বিস্ময় লইয়া সংসারে প্রবেশ করিল।

সংসারে কিছুদিন বসতি করিয়া কপালকুণ্ডলা কি হইয়াছে, এখন একবার তাহার চিত্র দেখুন।

শ্যামার সঙ্গে সম্মিলিত করিয়া কবি এখানে "মৃণ্ময়ী" করিয়াছেন। কিন্তু কপালকুণ্ডলা তখনও তপস্বিনী। শ্যামা সেই তপস্যা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে। শ্যামা মনে করে, পরশপাতর-(অর্থাৎ পুরুষ-) স্পর্শে রাঙ্গও সোণা হয়, আর কপালকুণ্ডলা ত কোন ছার! সে তাই বলিতেছে—

"বাঁধাব চুলের রাশ, পরাব চিকণ বাস,
খোঁপায় দোলাব তোর ফুল।
কপালে সিঁথির ধার, কাঁকালাতে চন্দ্রহার,
কাণে তোর দিব যোড়া দুল॥

কুঙ্কুম চন্দন চুয়া, বাটা ভরে পান গুয়া,
রাঙ্গা মুখ রাঙ্গা হবে রাগে।
সোণার পুত্তলি ছেলে কোলে তোর দিব ফেলে
দেখি ভাল লাগে কি না লাগে ॥"

মৃণ্ময়ী বলিতেছে—মনে কর সকলই হইল, তাহা হইলেই বা কি সুখ ?

শ্যামা। বল দেখি ফুলটী ফুটিলে কি সুখ ?

মৃণ্ময়ী—লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি ?

শ্যামাসুন্দরী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। অস্ফুট জীবনে স্ফুটনের কি সুখ, সে কেমন করিয়া বলিবে? বিষাদগম্ভীর হইয়া বলিল, তবে শুনি দেখি তোমার সুখ কি ?

মৃণ্ময়ী কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন—বলিতে পারি না। বোধকরি সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।

এই কথাতেই বুঝা যায় গ্রন্থের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

তারপর দেখিতে হইবে, কপালকুণ্ডলা এক বৎসর ধরিয়া পরশ-পাথর নবকুমারের সংসর্গে থাকিল, তবুও সে কোনরূপ প্রণয়ের পরিচয় দিল না, স্বামীর প্রতি তাহার কোনরূপ আকর্ষণ দেখাইল না, মতিবিবি যখন তাহার কাছে স্বামীকে ত্যাগ করিবার প্রস্তাব করিয়া বলিল, "তোমাকে অট্টালিকা দিব, ধন দিব, দাসদাসী দিব, রাণীর ন্যায় থাকিবে, তুমি বিদেশে যাও," তখন কবি বলিতেছেন, কপালকুণ্ডলা চিন্তা করিতে লাগিলেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখি-লেন, তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন "পরের" সুখের পথরোধ করিবেন ?

কপালকুণ্ডলা বলিলেন, "তুমি আমার উপকার করিয়াছ কি না, এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। অট্টালিকা, ধন, সম্পত্তি, দাসদাসীরও প্রয়োজন নাই। আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক, কালি হইতে বিঘ্নকারিণীর কোন সংবাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।"

সেই একসুর বাজিতেছে; উপন্যাসের কেন্দ্র হইতে ঐ একই সুর উত্থিত হইয়া আমাদিগকে আবিষ্ট করিয়া তুলে।

কপালকুণ্ডলার প্রকৃতিটাকে আরও স্পষ্ট করিবার জন্য কবি তাহাকে ভৈরবীভক্তিবিমূঢ়া অনৈসর্গিকের উপরে বিশ্বাসবতী করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণসম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান। তান্ত্রিক যেরূপ কালিকাপ্রসাদাকাঙ্ক্ষায় পরপ্রাণসংহারে সঙ্কোচশূন্য, কপালকুণ্ডলাও সেই আকাঙ্ক্ষায় আত্মজীবনবিসর্জ্জনে তদ্রূপ। কপালকুণ্ডলা যে কাপালিকের ন্যায় অনন্যচিত্ত হইয়া শক্তিপ্রসাদপ্রার্থিনী হইয়াছিলেন, তাহা নহে। তথাপি অহর্নিশ শক্তিভক্তির শ্রবণ, দর্শন ও সাধনে তাঁহার মনে কালিকানুরাগ বিশিষ্ট প্রকারে জন্মিয়াছিল। ভৈরবী যে সৃষ্টিশাসনকর্ত্রী মুক্তিদাত্রী, ইহা বিশেষ মতে প্রতীত হইয়াছিল। কালিকার পূজাভূমি যে নরশোণিতে প্লাবিত হয়, ইহা তাঁহার পরদুঃখিত হৃদয়ে সহিত না। কিন্তু আর কোন কার্য্যে ভক্তিপ্রদর্শনের ত্রুটি ছিল না।

কপালকুণ্ডলা স্বপ্নে সেই কালিকার আদেশ পাইয়াছেন, তাই মতিবিবির জন্য জীবনসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইতেছেন।

কবির কথা আবার না তুলিয়া পারিলাম না। তিনি বলিতেছেন "তুমি আমি প্রাণত্যাগ করিতে চাহি না—রাগ করিয়া যাহা বলি। এ সংসার সুখময়। সুখের প্রত্যাশাতেই বর্ত্তুলবৎ সংসারমধ্যে ঘুরিতেছি—দুঃখের প্রত্যাশায় নহে। কদাচিৎ যদি আত্মকর্ম্মদোষে

সেই প্রত্যাশা সফলীকৃত না হয়, তবেই দুঃখ বলিয়া উচ্চ কলরব আরম্ভ করি। তবেই দুঃখ নিয়ম নহে, সিদ্ধান্ত হইল; নিয়মের ব্যতিক্রমমাত্র। তোমার আমার সর্ব্বত্র সুখ। সেই সুখে আমরা সংসারমধ্যে বদ্ধমূল; ছাড়িতে চাহি না। কিন্তু এ সংসারবন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু। কপালকুণ্ডলার সে বন্ধন ছিল না—কোন বন্ধনই ছিল না। তবে কপালকুণ্ডলাকে কে রাখে ?"

"যাহার বন্ধন নাই, তাহারই অপ্রতিহত বেগ। গিরিশিখর হইতে নির্ঝরিণী নামিলে কে তাহার গতিরোধ করে ? একবার বায়ুতাড়িত হইলে কে তাহার সঞ্চার নিবারণ করে ? কপালকুণ্ডলার চিত্ত চঞ্চল হইলে, কে তাহার স্থিতি স্থাপন করিবে ? নবীন করিকর মাতিলে কে তাহাকে শান্ত করিবে ?

কেহ না। আমরা বলি, কেহ না। সৃষ্টির কোন অজ্ঞাত প্রান্ত হইতে ঐ কথাই প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে—কেহ না।

মানুষের চেষ্টা সেখানে ব্যর্থ—নবকুমারের ব্যাকুলতা বিফল।

কপালকুণ্ডলার—প্রকৃতিদেবীর সেই স্থিরগম্ভীর বাক্য—"আর আমি গৃহে যাব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব।" সেখানে "না—মৃণ্ময়ী না!" বলিয়া চীৎকার করিয়া হাত বাড়াইলেও বাঞ্ছিতকে আর পাওয়া যায় না। এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা পায় নাই—কখনও পাইবে কি না, জানি না।

বিজ্ঞান চিরদিন ধরিয়া এই প্রাপ্তির সাধনাই করিতে থাকিবে—ভগবানের সৃষ্ট মানুষের সৃষ্ট হইতে তবুও চিরদিনই পৃথক্ হইয়া রহিবে। ইহাকে ব্যক্ত করাই কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের উদ্দেশ্য।

এই সুন্দর সত্যটিকে যিনি নিপুণতাসহকারে সুকৌশলে আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন, তিনি ধন্য! তিনি আমাদের বঙ্গদেশেরকবি—

তাঁহাকে ধন্যবাদ! তিনি আমাদের সেই তত্ত্বদর্শী ঋষিদিগেরই বংশধর, যাঁহারা বলিয়াছিলেন—"সত্যমেব জয়তে নানৃতং",—তাঁহাকে ধন্যবাদ!

সর্ব্বশেষ ধন্য আমরা, যাহারা কবির সেই অদ্ভুত প্রকাশের আনন্দে বিহ্বল!

শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়ী।

রেঙ্গুন-বেঙ্গল-ক্লবের অন্তর্গত সাহিত্যসভার সর্ব্বপ্রথম অধিবেশনে পঠিত।

মালদহের শিল্প-ইতিহাসের উপাদান *

গত আশ্বিন মাসে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় আমাকে এই উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনে পাঠ জন্য মালদহ জেলার শিল্পসম্বন্ধীয় ইতিহাসের কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন, এবং পরেও অভাবপক্ষে মালদহের সংক্ষিপ্ত শিল্পবিবরণ লিখিবার অনুরোধ করেন। আমি নানা কারণে তাঁহাকে সময়ে উত্তর দিতে পারি নাই। নিজের অক্ষমতাও জানাইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি "নাছোড় বান্দা"। কুক্ষণে তাঁহার প্রথম পাণ্ডুয়াদর্শনের পাণ্ডা হইয়াছিলাম, আর গৌড়ের চিতাভস্ম হইতে বিষ্ণুপঞ্জরস্বরূপ রক্ষিত কিঞ্চিৎ রঞ্জিত ইষ্টক প্রসাদ দিয়াছিলাম; তাই এখন আমার সেই ইতিহাসদেবতা-সাধনার সিদ্ধি-পথে অগ্রসর যজমানের কথা এড়াইতে না পারিয়া, আজ আপনাদের সম্মুখে তীর্থক্ষেত্রের মূঢ় পাণ্ডার মত সুশিক্ষিত সুবিদ্বান্ যজমানগণের সম্মুখে নিজ মূর্খতা ও ধৃষ্টতা প্রকাশে উপস্থিত হইতেছি।

তবে আমার হতাশ হইবার কারণ নাই। পৃথিবীর রাজভাগ্যলিপি-নির্ণায়ক যুদ্ধগুলির অন্যতম সুবিখ্যাত পলাসীযুদ্ধের সর্ব্বজনশ্রুত সেই অন্ধকূপহত্যাব্যাপারের পর সার্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইতে না হইতে যেমন একদিকে সেই অন্ধকূপহত্যাকাণ্ড প্রস্ফুটিত পরমশোভমান কুসুমস্তবকস্বরূপে ঐতিহাসিক দূরবীক্ষণে প্রতিফলিত হইল, তেমনই আবার অপর দিকে সেই অন্ধকূপহত্যাকাণ্ডের সভ্যতার অমোঘনিদর্শন-স্বরূপ মর্ম্মরস্মৃতিপ্রস্তর প্রাচ্যরাণী রাজধানী কলিকাতার কমনীয় কণ্ঠে

---

* উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনের বগুড়া-অধিবেশনে পঠিত।

দ্যুতিমতী মণিমালার মধ্যমণিস্বরূপে গ্রথিত হইয়াছে। স্বল্পায়তন মালদহ জেলার সুপ্রাচীন গৌড়-পাণ্ডুয়া-টাঁড়া বহু সময় পূর্ব্বে অন্তর্হিত হইয়াছে। ১৫৭৫ খ্রীষ্টীয় অব্দের পর হইতে ভারতবর্ষ বা বাঙ্গালার ইতিহাসে মালদহের স্থান নাই, মালদহ জেলার শেষ শিল্পসম্ভার সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই পরকরতলগত হইতে আরম্ভ করিয়া এক্ষণে নিতান্ত দৈন্য দশায় উপস্থিত হইয়াছে। রাজা-রাজড়ার গুণগাথা রাজরাজড়া-প্রতিপোষিত ভট্টকবিগণের মুখে মুখে চলিয়া আইসে; বিদ্বজ্জন তাঁহাদিগের ও তাঁহাদিগের সেনা-সেনাপতিগণের কীর্ত্তিকাহিনী লেখনীমুখে লিপিবদ্ধ করেন; কিন্তু বণিক্ ও শিল্পকার নরপতিগণের কোষাগার প্রতিনিয়ত পরিপূর্ণ করিয়া সানুচর তাঁহাদের প্রতিপোষণ করিলেও তাঁহাদের মর্য্যাদা কেহ জানে না, তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী কেহ স্মরণে রাখে না। কাজেই আমার কাজ খুব সহজ,—সেই সর্ব্ববাদিসম্মত আদি পৌরাণিক জলপ্লাবনের সময় হইতে বণিক-শিল্পকারের কথা আরম্ভ করিয়া এক নিঃশ্বাসে আমি, গৌড়ারণ্যবাসী কাকভুষণ্ডী, যাহা বলিব, তাহা আপনাদিগকে অবশ্যই ধীরতার সহিত শ্রবণ করিতে হইবে। কাজেই এখন "বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি"-স্বরূপ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ সমাপ্ত করিয়া মূল আখ্যানের অবতারণা করিতেছি।

মালদহের শিল্পবিবরণ-আলোচনার পূর্ব্বে মালদহ জেলার অবস্থান-নির্ণয় আবশ্যক। মালদহ জেলার অস্তিত্ব পূর্ব্বে ছিল না। মোটামুটি ইংরাজ-আমলের মালদহ জেলা গত ৫০ বৎসরের মধ্যে গঠিত হইয়াছে। মহানন্দা এই জেলার উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া ইহাকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। পূর্ব্বাংশ দিনাজপুর জেলা ও পশ্চিমাংশ পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। মুসলমান-আমলে এই

জেলার উত্তর পশ্চিমাংশ সুবে বেহার ও অবশিষ্ট সুবে বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল। পূর্ব্বাংশ "বরিন্দ" নামে পরিচিত, এবং পশ্চিমাংশের উত্তর ব্যতীত অধিকাংশ গঙ্গাগর্ভ হইতে উৎপন্ন ও "দিয়ারা" নামে পরিচিত। মুসলমান-আমলে ও সেন রাজগণের সময় মালদহের পশ্চিম ভাগের কতকাংশ রাঢ়, মহানন্দার পূর্ব্বভাগ বরেন্দ্র, এবং উত্তরপশ্চিমাংশ মিথিলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তদপেক্ষা প্রাচীনতর কালে দক্ষিণপশ্চিমাংশ সম্ভবতঃ কর্ণসুবর্ণ, রাঢ়াংশ গৌড়, ও পূর্ব্বাংশ পুণ্ড্র রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মহাভারতীয় যুগে এই জেলার উত্তরপশ্চিমাংশ কৌশিকীকচ্ছ, তাহার দক্ষিণাংশ অঙ্গ, ও মহানন্দার পূর্ব্বভাগ পুণ্ড্র রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কোন কোন সময়ে মালদহের উত্তর ও উত্তরপূর্ব্বাংশে প্রাচীন জ্যোতিষ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর রাজ্যের সীমা স্পর্শ করিত। মালদহ জেলার এইরূপ প্রাচীন ভৌগোলিক অবস্থান-নির্ণয় প্রমাণসাপেক্ষ, তবে তাহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং মালদহের শিল্পেতিহাসের উপাদানসংগ্রহ-সময়ে তদ্বিষয়ক তর্কের অবতারণা ও মীমাংসায় অকারণ "পুঁথি বাড়ে" বলিয়া প্রাচীন জনপদসমূহের সহিত মালদহ জেলার উক্তরূপ কুটুম্বিতার বিষয় ধরিয়া লইয়া আখ্যানসূত্র অবলম্বন করিতেছি। এক্ষণে এই পুণ্ড্র-রাজ্য হইতে প্রথমতঃ মালদহের শিল্পেতিহাসের উপাদানসংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে।

অতি প্রাচীনকালে গণ্ডকী নদীর পশ্চিম পার্শ্বে আর্য্যগণ যখন কৃষি-কার্য্যের সহিত যাগযজ্ঞ ক্রিয়ায় নিরত থাকিয়া পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত জঙ্গল ও জলাভূমির প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করেন নাই, তখন পৌরাণিক বিষ্ণু-দেবতার নিকট দেবী গণ্ডকী—

"যদি দেব প্রসন্নোঽসি দেয়ো মে বাঞ্ছিতো বরঃ।
মম গর্ভগতো ভূত্বা বিষ্ণো, মৎপুত্রস্তাং ব্রজ॥" ১

১। বরাহ পুরাণ।

বলিয়া বিষ্ণুর স্বপুত্রত্ব কামনা করেন নাই, বা বিষ্ণু

"শালগ্রামশিলারূপী তব গর্ভগতঃ সদা।
তিষ্ঠামি তব পুত্রত্বে..................॥" ১

বলিয়া দেবী গণ্ডকীর প্রার্থনা পূরণ করিয়া তাঁহার তীর্থত্ব স্থাপিত করেন নাই। সেই প্রাচীনকালে বৈদিক বা মহাভরতীয় যুগে প্রাচ্য ভারতে কতকগুলি অনার্য্য রাজ্য সমুত্থিত হইয়াছিল। এই সকল অনার্য্য রাজ্যগুলি যে অধুনাতন কালের ভীল, সাঁওতাল-আদি পার্ব্বত্য জাতির মত শিল্পজ্ঞানবর্জ্জিত বর্ব্বর ছিল, রামায়ণ মহাভারত হইতে তাহা প্রতীত হয় না। রামায়ণের রক্ষ, ঋক্ষ, বানরাদি আর্য্য ঋষিগণের মত জ্ঞানসভ্যতা-সমুজ্জল না হইলেও যে, তাঁহারা শিল্পাদির মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন, তাহা আদি কবি বাল্মীকির লঙ্কা-কিষ্কিন্ধ্যাদির বর্ণনা এবং রক্ষ-ঋক্ষ-বানর-সমাজের চিত্র হইতেই সুস্পষ্টীকৃত হয়। মহাভারতেও ২ দেখিতে পাই "দানব" ময় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সভা নির্ম্মাণ করিতেছেন, এবং তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞে পুণ্ড্র-প্রভৃতির অনার্য্য মহীপালগণ নিমন্ত্রিত ও সাদরে অভ্যর্থিত হইতেছেন।৩ প্রাচ্য ভারতের রাজগণের নিকট হইতে ভীম করস্বরূপ "বিবিধ রত্ন, চন্দন, অগুরু, বস্ত্র, কম্বল, মণি, মুক্তা, বিদ্রুমপ্রভৃতি ৪ গ্রহণ করিয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।" "পূর্ব্ব দেশের অধিপতিগণ মহামূল্য আসন, শয়ন, যান, মণিকাঞ্চননির্ম্মিত বিচিত্র কবচ, বিবিধ শস্ত্র, সুবর্ণখচিত ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত সুশিক্ষিত-অশ্বসম্পন্ন বিবিধাকার রথ, বিচিত্র গজ, কম্বল, বহুতর রত্ন, নারাচ ও অর্দ্ধনারাচ-প্রভৃতি বিবিধ শস্ত্র, এই সমস্ত মহৎ বস্তু প্রদান করিয়াও মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে

১। বরাহ পুরাণ। ২। সভাপর্ব্ব।
৩। সভাপর্ব্ব। ৪। সভাপর্ব্ব, ৩০ অধ্যায়।

প্রবেশাধিকার পান নাই"[১] বলিয়া ঈর্ষ্যাকাতর দুর্য্যোধন অন্ধ পিতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হৃদয়ের যাতনা সহ আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছেন।

এই পূর্ব্বদেশীয় ভূপতিগণের মধ্যে পুণ্ড্ররাজ অন্যতম। পুণ্ড্ররাজ, বঙ্গ-কলিঙ্গ-মগধাদি-মহীপালবর্গের সহিত "সুশিক্ষিত পর্ব্বতপ্রতিম কুথাবৃত সহস্র কুঞ্জর প্রদান করিয়া"[২] যুধিষ্টিরের রাজসূয়-সভাঙ্গনে প্রবেশ জন্য দৌবারিকের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যুধিষ্টিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় কঙ্কনামক একটি জাতি অন্যান্য উপহার দ্রব্য সহ "ঊর্ণাজ, রাঙ্কব, কীটজ, পট্টজ কমলসদৃশপ্রভাসম্পন্ন ও কার্পাসনির্ম্মিত সূক্ষ্ম বস্ত্র, নিশিত ও আয়ত খড়্গ, ঋষ্টি শক্তি ও নানাবিধ পরশু"[৩] সহ দ্বারদেশে উপনীত ছিল।

মালদহ জেলার উত্তরপশ্চিমাংশ, দিনাজপুর জেলার দক্ষিণপশ্চিমাংশ ও পূর্ণিয়া জেলার দক্ষিণপূর্ব্বাংশ, এই একটি সীমাবদ্ধ স্থানে গণেশ বা গঙ্গাই নামে একটি জাতির বাস আছে। ইহাদিগের জাতিগত ব্যবসায় বস্ত্রবয়ন, এবং গত লোকগণনার সময় ইহারা আপনাদিগকে হিন্দু তন্তুবায় জাতি বলিয়া পরিচয় লিখাইতে অগ্রসর হইয়াছিল। ইহারা মহানন্দা নদীর হিমগিরিপ্রসূতা কঙ্কাই-নামক একটী উপনদীর তীরে বাস করে। তাহাদের মধ্যে

"যাঁহা যাঁহা কঙ্কাই
তাঁহা তাঁহা গঙ্গাই।"

এই প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহারা আপন দেবতার নিকট শূকর বলি দেয়। আচার-ব্যবহার ও আকৃতি-অবয়বে ইহারা সাধারণ আর্য্যকুলোদ্ভব হিন্দু জাতি হইতে ভিন্ন। নেপালের তরাই প্রদেশে ইহাদের

১। সভাপর্ব্ব, ৫০ অধ্যায়। ২। সভাপর্ব্ব ৫১ অধ্যায়।
৩। সভাপর্ব্ব, ৫৯ অধ্যায়।

আদিম বাসস্থান ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। অবয়বের গঠনপ্রণালী-অনুসারে ইহারা মঙ্গোলীয় জাতির শাখাবিশেষসদৃশ (Mongoloid)।[১] শ্রীমদ্ভাগবতে কঙ্কজাতিকে করূদ, খস, কিরাত, হূণপ্রভৃতি হিমালয়-প্রান্তবাসী জাতির সহিত একত্র বর্ণিত দেখা যায়। উক্ত ও অপরাপর কারণে হিমগিরিনন্দিনী কঙ্কাইর তীরবাসী হিমালয়তলস্থ এই গণেশ বা গঙ্গাই-নামক জাতিকে প্রাচীন কঙ্কজাতির বংশধর এবং দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন-বিজিত কৌশিকীকচ্ছ জনপদের অধিবাসী বলিয়া আমার অনুমান হয়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে কৌশিকীকচ্ছপতি মহাবল মহৌজা উপস্থিত ছিলেন, বা কোন উপহার দ্রব্য দিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ নাই। অথচ ভীমসেনের দিগ্বিজয়ে মহৌজা মহাবল নরপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং বিদিত সমস্ত জনপদ হইতেই রাজসূয় যজ্ঞে উপহার প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। এমন অবস্থায় কৌশিকীকচ্ছ হইতে যুধিষ্ঠিরের রাজচক্রবর্ত্তিত্ব-গ্রহণের সময় কোন উপহার প্রেরিত না হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং কৌশিকীকচ্ছ হইতেই যে কঙ্কজাতি উপরি-উক্ত উপহার দ্রব্যনিচয় লইয়া গিয়াছিল, ইহা অনুমান করিলে সত্যের অপলাপ হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না।

রামায়ণে পুণ্ড্রদেশকে "ভূমিঞ্চ কোশকারাণাং" [২] বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। "কোশকারদিগের ভূমি" এই বাক্যে কৌশেয়ক অর্থাৎ তন্তূৎপাদক জন্তুবিশেষের উৎপত্তি স্থান বুঝাইতেছে। মালদহ জেলায় রেশমকীটের 'কোয়া' এই নাম এখনও রামায়ণের কোশ-শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং রামায়ণের মতেও কৌশিকীকচ্ছ জনপদের স্বল্পদূরে কীটপট্টজ বস্ত্রের উৎপাদন-উপকরণ অনায়াস লভ্য ছিল।

১। Cencus Report of India, 1901, Vol. VI., Part I, p. 410.

২। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রামায়ণে অঙ্গদেশকে “ভূমিঞ্চ রজতাকরাং” বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে,[১] এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরকে জাতরূপময়পুর[২] বলা হইয়াছে। এখনও প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অর্থাৎ আসামে স্বর্ণ পাওয়া যায়। সুতরাং পুণ্ড্র ও কৌশিকীকচ্ছ জনপদদ্বয় হইতে রজতকাঞ্চনময় উপহার যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে নীত হওয়া নিতান্ত কবিকল্পনা নহে।

কার্পাস বৃক্ষ মালদহের বরেন্দ্র-অঞ্চলে, পূর্ণিয়া-অঞ্চলে ও পূর্ণিয়া জেলায় বিরল নহে। শতবর্ষ পূর্ব্বেও পূর্ণিয়া জেলায় ও মালদহে প্রচুর পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইত।[৩] এ অবস্থায় কঙ্ক ও পুণ্ড্রগণের দেশে মহাভারতের সময় যে সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র উৎপন্ন হইত, তাহার অনুমান অসঙ্গত নহে।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞদ্বারপ্রবেশকালে পুণ্ড্রদেশাধিপতির সহস্র-কুঞ্জর-উপহারপ্রদানের কথা মহাভারতে, এবং দ্বারাবতী-অভিমুখে রণ-যাত্রাকালে নিযুতমাতঙ্গ-সমভিব্যাহারে গমনের কথা হরিবংশে উক্ত আছে। পুণ্ড্রদেশপ্রান্তে এখনও গজদন্তের কাজ হয়। এমন অবস্থায় “বিচিত্রগজদন্তযুক্ত বিচিত্র কবচ” যে, মহাভারতের সময় প্রস্তুত হইত, তাহাতে সংশয় থাকে না।

যে যে রাজ্যে রেশম-পশম-কার্পাসাদি-জাত বস্ত্র, গজদন্তখচিত কবচ, ও রজতকাঞ্চনাদিময় দ্রব্য প্রস্তুত হইত, এবং যে যে রাজ্যের রাজা রাজচক্রবর্ত্তী মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। সেই সেই রাজ্যে যে, রথাদি যান এবং খড়্গ, নারাচ, পরশু-আদি রণোপযোগী অস্ত্র-শস্ত্রের প্রাচীন কালেই উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাতে

১। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪০ সর্গ। ২। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪২ সর্গ।

৩। Dutt's Economic History of British India, p. 251.

স্বতই প্রতীতি জন্মে। সুতরাং রামায়ণ ও মহাভারতের আলোচনায় জানিতে পারা যাইতেছে যে, পৌণ্ড্রক বাসুদেব এবং কৌশিকীকচ্ছরাজ মহৌজার সময় মালদহ জেলায় ঊর্ণাজ, কীটজ ও পট্টজ বস্ত্র, পদ্মপ্রভ বস্ত্র, মূল্যবান্ আসন, শয্যা, অশ্বরথাদি যান, গজদন্ত-নির্ম্মিত দ্রব্য, নারাচ-খড়্গ-পরশু-আদি অস্ত্র-শস্ত্র, অশ্বগজের সাজসজ্জা-ইত্যাদি শিল্প দ্রব্য উৎপন্ন হইত। খ্রীষ্টজন্মের অন্ততঃ দ্বাদশ শত বর্ষ-পূর্ব্বে পৌণ্ড্রক বাসুদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং আজ হইতে অন্যূন তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মালদহ জেলায় মহাভারতকথিত উপরি-উক্ত শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইত।

মহাভারতীয় যুগের পর বৌদ্ধযুগ। মহাভারতীয় যুগের শিল্প বৌদ্ধযুগে বিলুপ্ত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। বৌদ্ধ পরিব্রাজক হোয়েন্থসাং পুণ্ড্রদেশে আসিয়া এখানে বিংশতি-সংখ্যক বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও কয়েক শত হিন্দুদেবালয় দেখিয়াছিলেন।

এখনও মস্‌জিদসমূহ দেখিলে তথায় বৌদ্ধস্তূপ নির্ম্মিত হওয়ার চিহ্ন সকল পাওয়া যায়।[১] পাণ্ডুয়ার ভগ্নাবশেষ যোগিভবন, মাধাইপুর, নগর-পাড়াদ্বারবাসিনী-প্রভৃতি মালদহ জেলার নানা স্থানে বৌদ্ধযুগের সুগঠিত প্রস্তরময়ী ভগ্নপ্রতিমা পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে

---

(১) "It is a noticeable fact that the stones of the Adina Mosque, while they show on the reverse side unmistakeable signs of having been part of a Hindu Temple, also, I think, show signs in some places of having been employed at the base of a Buddhist Stupa. The lower line of stones on which the mosque rests, are carved in the form of the well-known Buddhist railing which would scarcely have been executed by a Mahomedan or Hindu."—Mr. Samuels, Magistrate of Maldah, in the District Cencus report of Malda, No. 338-G., Dated the 5th March, 1892.

পারে যে, মালদহ জেলায় বৌদ্ধযুগে স্থাপত্য- ও ভাস্কর্য্য-বিদ্যার অভ্যুদয় ও উন্নতি হইয়াছিল।

বৌদ্ধগ্রন্থ অশোকাবদান অশোকের বৌদ্ধ গুরু উপগুপ্তের জনৈক শিষ্য-প্রণীত। এই গ্রন্থে অশোক রাজার ভ্রাতা বীতশোকের ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের দুর্ভেদ্য দুর্গস্বরূপ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে পলায়নের উল্লেখ আছে। শুনিয়াছি এই গ্রন্থে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের আনুষঙ্গিক বিবরণ আছে, সুতরাং অশোকাবদানাদি বৌদ্ধগ্রন্থে অনুসন্ধান করিলে, তাহা হইতে মালদহের তদানীন্তন শিল্পসমাচার সংগৃহীত হইতে পারে।

পৌরাণিক যুগে উপস্থিত হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, হরিবংশে পৌণ্ড্রক বাসুদেব রণস্থলে খড়্গ, গদা, চক্র, ধনু-ইত্যাদির সহিত দ্বারাবতীর অবরোধকালে পুরীপ্রাকারভেদ জন্য পাষাণদারণ টঙ্ক, কুন্ত, কুঠার, কুদ্দাল, ও পাষাণকর্ষণকর শস্ত্রসমূহ ব্যবহার করিতেছেন। মাগধগণ সেই সময়ে পৌণ্ড্রগণ অপেক্ষা উন্নততর ক্ষেপণীয় মুদ্গর, উর্দ্ধক্ষেপণী, শস্ত্রপাতবিঘাত-আদি নানাবিধ শস্ত্র ও যন্ত্র ব্যবহার করিতেন। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি, মহাভারতের সময় অপেক্ষা পৌরাণিক-যুগে পুণ্ড্রদেশে যুদ্ধোপযোগী যন্ত্র ও শস্ত্রাদির অধিকতর উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে মাগধগণ পুণ্ড্রগণ অপেক্ষা রণবিদ্যোপযোগী অস্ত্রশস্ত্রে অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

পৌরাণিক যুগেই পাল -শূর- ও সেন-বংশীয়গণ গৌড়দেশে শাসনদণ্ড চালনা করিয়াছিলেন। এই রাজগণের সময়েই বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা গৌড়দেশে উন্নতি লাভ করে, এবং তৎপর শাক্ত, সৌর, শৈব, বৈষ্ণবাদি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। মালদহ জেলার নানাস্থানে এই সময়ের নির্ম্মিত দেবদেবীর প্রস্তরপ্রতিমা ও ধাতুময়ী মূর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান আছে। পুরাতন মালদহের ধাতুময়ী সিংহবাহিনী প্রতিমা ও

পাষাণময় বিগ্রহ শ্যামরায়, ভোলাহাটের প্রস্তরনির্ম্মিত বিষ্ণুবিগ্রহ, ভবানীপুরের পাষাণময়ী চতুর্ভুজা দেবী দর্শনযোগ্য। কানিংহাম সাহেব দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত মালদহের সীমান্তবর্ত্তী দেবতলা নামক স্থানে যে পাষাণময় বিষ্ণুপ্রতিমা দেখিয়া তাহার ছবি আপন রিপোর্টে[১] প্রদান করিয়াছেন, ভোলাহাটের বিষ্ণুমূর্ত্তি অবিকল তদনুরূপ, তবে তদপেক্ষা বৃহত্তর। দেবতলার মূর্ত্তি ১৮ × ৭॥ ইঞ্চি, কিন্তু ভোলাহাটের মূর্ত্তি ৫৯ × ২৮ ইঞ্চি। এই মূর্ত্তিটী একখানি প্রস্তর খুদিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। ভবানীপুরের মূর্ত্তি ৫৮ × ৪৮ ইঞ্চ, এবং তাহা রঙ্গপুরের সাহিত্য-পারিষৎপত্রিকায় প্রকাশিত বেল-আমলায় দেবীপ্রতিমার অবিকল অনুরূপ। ভোলাহাট ও ভবানীপুরের প্রতিমাদ্বয়, অন্যূন ২২ ইঞ্চি বেধবিশিষ্ট একখানি প্রস্তরে খোদিত। উভয় প্রতিমাই তৎকালোচিত বসন ও ভূষণে সজ্জিত। ভবানীপুরের প্রতিমার বসন উর্ম্মির মত (ঢেউ-খেলান) ও বুটাদার।

পাল ও সেন রাজগণের সময়ে প্রদত্ত কয়েকখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে দেবমূর্ত্তি ও লিপি উৎকীর্ণ আছে। এই সকল ধাতুপাষাণময়ী প্রতিমা ও উৎকীর্ণ তাম্রশাসন হইতে প্রতীত হয় যে, মুসলমানশাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে মালদহ জেলায় ভাস্কর ও কাংস্য-পিত্তলকারগণ প্রতিমানির্ম্মাণে সুন্দর পটুতা লাভ করিয়াছিল।

মালদহ জেলার গৌরব পাণ্ডুয়া ও গৌড়ের মসজিদ-দরগার ভগ্নাবশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দর্শকগণ বাহ্যদৃষ্টিতে তাহাতে কেবল মুসলমান-কালের স্থাপত্য বিদ্যার উন্নতির পরিচয় পান, কিন্তু একটু সতর্কতার সহিত গৌড়নগরস্থিত ভগ্নাবশেষ পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, রাভেন্সা, হাণ্টার, কানিংহাম-প্রভৃতি লেখকগণ যে ক্ষুদ্র ভূভাগকে হিন্দু-

১। Archeological Survey of India, Vol. XV.

গৌড় বলিয়া উল্লেখ করেন, হিন্দু-রাজধানী গৌড় তদপেক্ষা বৃহত্তর ছিল, এবং তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট মুসলমান-গৌড়ও প্রাচীন হিন্দু-গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী মহাশয় বিশেষ সতর্কতার সহিত গৌড়ের গড়, পরিখা ও দ্বারগুলির পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উত্তরে কালিন্দীর তীরবর্ত্তী পিছলি-গঙ্গারামপুর হইতে দক্ষিণে জহরপুর-ডাঁড়ার তীরস্থ গৌড়েশ্বরী দেবীর স্থানপর্য্যন্ত, এবং পূর্ব্বে গোপালপুরের নিকটবর্ত্তী জহরাতলার দেবীস্থান হইতে পশ্চিমে চণ্ডীপুরের দ্বারবাসিনী ও পাতালচণ্ডী দেবীর স্থানপর্য্যন্ত বিস্তৃত সমুদয় ভূভাগ প্রাচীন হিন্দু-গৌড়ের অন্তর্গত ছিল। পাতালচণ্ডী পূর্ব্বে পাটলাচণ্ডী নামে পরিচিত ছিল। গৌড়েশ্বরী, দ্বারবাসিনী, পাটলাচণ্ডী ও জহরাতলার দেবী গৌড়ের অধিষ্ঠাত্রী ও দুর্গতোরণরক্ষাকর্ত্রী দেবী ছিলেন। ইহাঁরা স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট এখনও প্রতিবর্ষের নির্দ্দিষ্ট সময়ে অর্চ্চনা পাইয়া থাকেন।

গৌড়ের পাটলাচণ্ডী পুরাণ প্রসিদ্ধ দেবতা; স্কন্দ, মৎস্য ও পদ্ম পুরাণে তাহার উল্লেখ আছে। বৃহন্নীলতন্ত্রে চণ্ডীপুরে প্রচণ্ডা দেবী বলিয়া দ্বারবাসিনীর উল্লেখ আছে।[১] পূর্ব্বে এই সকল দেবীর বৃহৎ পাষাণময় মন্দির ছিল, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। দ্বারবাসিনী চণ্ডীর বিশালমন্দিরপ্রাচীরের ও প্রাচীরসংলগ্ন স্তম্ভের কিয়দংশ এক্ষণেও বর্ত্তমান আছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী মহাশয়ের সতর্ক পর্য্যবেক্ষণে দ্বারবাসিনী-মন্দিরের গুম্বুজবিশিষ্ট ভাগে "মীনা" করা ইষ্টক (glazed and enamelled) দৃষ্ট হইয়াছে। বল্লালবাড়ীর টামনা দীঘির (তর্পণ-দীঘির) উত্তর পাড়ে কৃষ্ণলাল বাবু একখণ্ড খোদিত মীনা-করা ইষ্টক

১। বৃহন্নীলতন্ত্র, ৫ম পটল।

মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত দেখিয়া উঠাইয়া আনিয়াছেন।[১] গৌড়ের ও পাণ্ডুয়ার মস্‌জিদের স্তম্ভগুলি দ্বারবাসিনীর মন্দিরপ্রাচীরসংলগ্ন স্তম্ভের অনুকরণে এবং মস্‌জিদ নির্ম্মিতসমূহে দৃষ্ট "মীনা" করা ইষ্টকের পূর্ব্বেও হিন্দু-আমলে তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ পাণ্ডুয়া, গৌড়, পুরাতন মালদহ ও মালদহ জেলার অন্যান্য স্থানের মস্‌জিদগুলি যে, বৌদ্ধমন্দির ও হিন্দুদেবালয় ভাঙ্গিয়া বিনির্ম্মিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। পাণ্ডুয়ার "সাতাইশ ঘর"-সংলগ্ন পুষ্করিণী উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, এবং তাহা হিন্দুনির্ম্মাতার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। সুবিশাল আদিনা-মস্‌জিদের কতকগুলি প্রস্তর যে, বৌদ্ধ-স্তূপের পাদদেশগঠনার্থ ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। অপর কতকগুলি প্রস্তর দেবদেবীমূর্ত্তি ও পদ্মপুষ্পাকৃতি দ্বারা বৌদ্ধ এবং হিন্দু স্থপতি ও ভাস্করের স্মৃতি জাগরূক করে।[২] গৌড়ের পীরুসা-মিনারের আকৃতি বৌদ্ধস্তূপসন্নিকটবর্ত্তী স্তম্ভের কথা স্মরণ করায়, এবং গৌড়ের মস্‌জিদগাত্রের ইষ্টকখচিত কারুকার্য্যও হিন্দুস্থাপত্যের প্রমাণ দেয়। ইংরাজলেখকরাও[৩] পাণ্ডুয়া ও গৌড়ের অধিকাংশ মসজিদে Bengalee Fashion উপলব্ধি করিয়াছেন। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে, দূরদেশাগত শিল্পীর হস্ত পাঠানশাসনকালেও গৌড়-পাণ্ডুয়ার কারুকার্য্যে ব্যবহৃত হয় নাই। অতএব ইহা নিশ্চয় যে, পৌরাণিক যুগে এবং পররর্ত্তী মুসলমানশাসনকালে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও অন্যবিধ কারুকার্য্যের জন্য মালদহ পরপ্রত্যাশী ও পরের নিকট ঋণী ছিল না। সার জর্জ্জ বার্ডউড্ ও জেম্‌স্ ফারগুসন্ সাহেব মহোদয়দ্বয়ের মতে ভারতবর্ষের

---

(১) এই ইষ্টকখানি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী মহাশয় অক্ষয় বাবুকে দিয়াছেন।

(২) Cencus Report of Malda by Samuels.

(৩) Cunningham and Fergusson

অন্যান্য প্রদেশে বৌদ্ধযুগের বৌদ্ধ মন্দির, বিহার, স্তূপ ও স্তম্ভ পৌরাণিক যুগে শিবালয়, বিষ্ণুমন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ ও দেবস্থান-আদিতে, এবং তৎসমুদায়ই আবার পাঠানযুগে মস্‌জিদ্ ও মিনারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। মালদহেও তাহারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে। এক আদিনা-মসজিদই সম্ভবতঃ এককালে বৌদ্ধ স্তূপ, এবং আর এককালে রাজতরঙ্গিনীকথিত জয়ন্ত-রাজধানী পুণ্ড্রবৰ্দ্ধনে স্থিত কার্ত্তিকেয়-মন্দির ছিল;[১] পরে আবার ইলিয়াস-বংশধর সেকন্দর সাহের কৃপায় তাহা আদিনা মস্‌জিদে পরিণত হইয়াছে। ফলতঃ একই প্রাচীন স্থাপতি ও ভাস্করের বংশধরগণ ভিন্ন-ভিন্ন যুগে ভিন্ন-ভিন্ন নামে একই প্রণালীতে আপন-আপন বংশপরম্পরাগত শিল্পকৌশল বিহার,-মন্দির- ও মস্‌জিদ-গাত্রে প্রকাশ করিয়া আপনাদের চিরঞ্জীবকীর্ত্তিযুক্ত আবির্ভাবের পরিচয় গৌড়-পাণ্ডুয়ার ভগ্নাবশেষমধ্যে প্রদান করিয়াছেন।

গৌড়ের ভগ্নাবশেষ ব্যতীত, ইতিহাস ও পবনদূত-নামক কাব্য হইতেও লক্ষ্মণসেনের রাজধানীর বর্ণনা পাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেনদেবের পঞ্চরত্নের অন্যতম রত্ন ধোয়ীকবি-বিরচিত পবনদূত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, গঙ্গাকালিন্দীসঙ্গমের অনতিদূরে লক্ষ্মণসেনদেবের নির্ম্মিত বিচিত্র কৈলাসোপম বিজয়পুরনামক নগরে তাঁহার অভ্রভেদী সপ্ততল রাজপ্রসাদ এবং মেঘস্পর্শী অৰ্দ্ধনারীশ্বরদেবের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। মুসলমান লেখকগণের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, লক্ষ্মণসেনের গৌড় সুবিশাল সৌধরাশি, মনোরম উপবন, ও প্রশস্ত রাজপথ দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া লক্ষ্মণাবতী নাম ধারণ করিয়াছিল। ইহা হইতে মালদহে সেন-রাজগণের সময়ে শিল্পকলার যে, যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়।

---

(১) Raj Tarangini as translated by J. C. Dutt under the title of Kings of Kashmere, Book IV.

পৌরাণিক যুগে মালদহ জেলার শিল্পগৌরবের পরিচয় অন্য সূত্রেও ভগ্নাবশেষসমূহনিহিত ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য কৌশল হইতে যেরূপে সংগৃহীত হইতে পারে, তাহার আভাস প্রদান করিলাম। মহাভারতীয় যুগ অপেক্ষা এ যুগে যে, মালদহের শিল্পগৌরবের অবনতি ঘটিয়াছিল, তাহার কোন কারণ নাই। যেহেতু মুসলমানশাসনপর্য্যন্ত রাজবিপ্লব বা ধর্ম্মবিপ্লবে ভারতবর্ষের সনাতন পল্লীসমাজের শক্তিফলে নাগরিক- বা গ্রাম্য-সমাজভুক্ত শিল্পকার বা কৃষিজীবিগণের বৃত্তিচালনার কোন অন্তরায় উপস্থিত হয় নাই; এবং মহাভারতীয়, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক যুগে মালদহ জেলা কোন-না-কোন রাজত্বের কেন্দ্রশক্তি ও রাজধানীকে আপন বক্ষে ধারণ করিয়াছে। বৌদ্ধ ও পৌরাণিক যুগের প্রস্তর- ও ধাতু-ময়ী প্রতিমার বেশভূষা ও সাজশয্যা হইতে এ যুগেও যে বসন, ভূষণ, শয্যা, যান, অস্ত্র, শস্ত্র ইত্যাদি নানাবিষয়িণী শিল্পকলা প্রচলিত ছিল, এবং পৌরাণিক যুগে দেবদেবীসেবার বহুলপ্রচারফলে যে, স্বুবর্ণ, রজত, তাম্র, কাংস্য, পিতল ও প্রস্তরাদি-নির্ম্মিত নানা অর্চ্চনাধার, ভোজনপাত্র, পানপাত্র, ইত্যাদির প্রবর্ত্তন ও উন্নতি হইয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

অতঃপর মুসলমানশাসনকালে মালদহ জেলায় শিল্পগৌরবের বিষয় আলোচনা করিব। মুসলমানশাসনকালে মালদহের শিল্পোন্নতি প্রথমতঃ স্থগিত হয়, ও তৎপর তাহার পতন আরম্ভ হইয়া মুসলমানশাসন-অন্তর্দ্ধানের সহিত তাহার প্রায় তিরোধান ঘটিয়াছে। এই কালের শিল্পেতিহাস-আলোচনায় বাঙ্গালার রাজধানীপরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক।

সম্ভবতঃ সেনরাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম রাজা বল্লালসেনদেব পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত নিভৃতে শাস্ত্রালোচনা-জন্য গঙ্গাতীরস্থ নবদ্বীপে বিশ্রামাবাস প্রতিষ্ঠিত করেন,[১] এবং পরে তদীয় পুত্র লক্ষ্মণসেনদেব বৈষ্ণবধর্ম্মের

১। দানসাগর।

শান্তমধুররসাস্বাদনপ্রিয়তার দ্বারা পরিচালিত হইয়া ভক্তভাবুক জয়দেবাদি কবিগণের সহিত নবদ্বীপে গঙ্গানিবাস স্থাপিত করেন। বল্লালসেন ও লক্ষণ-সেন নবদ্বীপে বিশ্রামাবাসমাত্র সংস্থাপন করেন, তাঁহাদিগের রাজধানী গৌড়নগরেতেই ছিল। মুসলমান-অধিকার-প্রবর্ত্তনের পরও গৌড়নগর প্রায় সার্দ্ধশত বৎসর তদানীন্তন মুসলমান-অধিকৃত বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। সন ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াসসাহ পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় পাণ্ডুয়া হইতে গৌড়ে রাজধানী নীত হয়। গৌড়ের অস্বাস্থ্যজনকতার উপলব্ধি করিয়া স্থলেমান সাহ ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়েরই উপকণ্ঠে টাঁড়া-নগরে আপন রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। মোগল-কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের পর আকবর-সেনাপতি মুনিম খাঁ গৌড়ের সৌধসৌন্দর্য্য, সমৃদ্ধি ও সম্পদ লক্ষ্য করিয়া গৌড়েই রাজধানী নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু সেই মোগলকর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের বৎসরেই, ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, ভয়ানক মহামারী উপস্থিত হইয়া গৌড়নগরকে শূন্য করে, এবং পরে সাহ স্থজার সময় ব্যতীত গৌড়ের নাম আর ইতিহাসে স্থান পায় নাই। অতঃপর রাজমহল, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ মুসলমান শাসনকর্ত্তৃবৃন্দের রাজধানী হয়, ও মালদহের সহিত রাজধানীর সংস্রব সম্পূর্ণ রহিত হয়। বস্তুতঃ, বঙ্গে পাঠানরাজত্ব-অবসানের সহিত মালদহের নাম বাঙ্গালার রাজ-নৈতিক ইতিহাস হইতে উঠিয়া গিয়াছে।

পাঠানশাসনকালে মালদহের শিল্পগৌরবের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পাঠান-রাজগণ অধিকাংশ সময় যুদ্ধবিগ্রহ ও আত্মকলহে ব্যাপৃত থাকিলেও, তাঁহাদিগের সময়ে মালদহের শিল্প-সম্ভারের ততদূর অধঃপতন হয় নাই। গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ভগ্নাবশেষমধ্যে পাঠানরাজগণকর্ত্তৃক মসজিদ, মিনার, দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী, ইষ্টকপ্রস্তর-গ্রথিত স্থদৃঢ় খিলান, সেতু, বাঁধ ও প্রশস্ত রাজপথাদি ও প্রণালীনির্ম্মাণের

প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।[১] ইহাঁদিগের সময়ে যে, কার্পাস- ও রেশম-নির্ম্মিত রঞ্জিত ও অরঞ্জিত নানাবিধ বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহার প্রমাণ বিরল নহে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয় পরিব্রাজক পর্টুগাল হইতে আসিয়া গৌড়-বাদসাহকে মূল্যবান্ উপহার প্রদান করেন, এবং গৌড়ের সমৃদ্ধি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।[২] এই সময়ে গৌড়ে দ্বাদশ-লক্ষাধিক অধিবাসী, মণিমাণিক্যাদি রত্ন ও রেশমকার্পাসনির্ম্মিত কারুকার্য্য-বিশিষ্ট বস্ত্রের বিপণি, ছায়াপ্রদ-বৃক্ষরাজিশোভিত জনাকীর্ণ রাজপথ, এবং সুদৃশ্য হর্ম্ম্য ও রমণীয় উপবন ছিল। এই সময় মালদহ হইতে তুরস্ক, মিসর ও ইউরোপে জাহাজযোগে কার্পাস- ও রেশম-নির্ম্মিত বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে প্রেরিত হইত। মুনিমখাঁ-কর্ত্তৃক পাঠানবিজয়ের সেই বিপ্লব-বহুল বৎসরেও পুরাতন মালদহের ভিকু সেখ ইউরোপীয় রুশিয়ায় প্রেরণ জন্য তিন জাহাজ মালদহী বস্ত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে পারস্য-উপসাগরে দৈবযোগে তাহা বিনষ্ট হয়।[৩] ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্গদেশে জনৈক ইতালীয় পরিব্রাজক আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ[৪] হইতে জানা যায় যে, এদেশ হইতে প্রতিবর্ষে ৫০ খানি জাহাজ কার্পাস- ও রেশম-জাত বস্ত্রে পরিপূর্ণ হইয়া বিদেশে যাইত। এই ৫০ খানি জাহাজের মালের অধিকাংশ যে, গৌড় হইতে সংগৃহীত হইত, তৎপক্ষে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম

১। Archeological Survey of India, XV.

২। De Baros.

৩। Birdwood's Industrial Art of India and Hunter's Statistical Account of Malda.

৪। The Travels of Ludivico Divar Hema.

ইংরাজ-পর্য্যটক[১] বঙ্গদেশে আগমন করিয়া টাঁড়ায় কার্পাস ও কার্পাস-জাত বস্ত্রের বিশাল বাণিজ্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। গৌড়ের ধন-রত্ন লইয়া গিয়াই সুন্দরবন কাটিয়া বাঙ্গালীকর্ত্তৃক স্বাধীন যশোহর রাজ্যের পত্তন হয়, ও বঙ্গগৌরব[২] প্রতাপাদিত্য বারংবার মোগলগণের বিপুল বাহিনীর প্রতি বিক্রম প্রদর্শনে সমর্থ হন। পাঠানরাজত্বাবসানের স্বল্প-কাল পরেই আমরা জাহাঙ্গীর সাহ বাদসাহের আমলে সম্রাজ্ঞী নুর-জাহানের কোমল অঙ্গকে মালদহের পট্টবস্ত্রে সজ্জিত হইতে দেখি, এবং আমীর-ওমরাহ-গণ মালদহের চারুকারুকার্য্যবিশিষ্ট পট্টজ পোষাকে ভূষিত হইয়া আগরায় বাদসাহ-দরবারের শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন, দেখিতে পাই। এই সময়ে মালদহে উৎকৃষ্ট ও দৃঢ় কাগজ প্রস্তুত হইত, এবং তাহা বাদসাহ-দরবারে সনদ-ফারমান, দলিল-দস্তাবেজ লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। মুসলমানশাসনকালে মালদহ জেলায় কামান, বন্দুক, তরবারি ও অন্যান্য লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র-শস্ত্র সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইত। ধাতুময় বাসন-কোসন এই সময় অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হইত। হিন্দুগণের সময় হইতে কানসাট (কাংস্যহট্ট বা কংসহট্ট) ও সাদুল্লাপুর কাংস্য-পিত্তল দ্রব্যের নির্ম্মাণের জন্য বিখ্যাত ছিল। গৌড়ধ্বংসের পর সাদুল্লাপুরের কাংস্যবণিক্ ও কাংস্যকার-গণ কলিগ্রাম ও বর্ত্তমান ইংরেজবাজারের অন্তর্গত কুতুবপুরে পলায়ন করিয়া বাস করিতেছে, এবং কানসাটের বাসনের কারবার নিতান্ত হীনভাবে হুজরাপুর ও নবাবগঞ্জে বর্ত্তমান আছে। এই সময়ের অত্যল্পপূর্ব্বপর্য্যন্ত মালদহের কাংস্যকারগণ কাঁসা-পিতল ঢালাই করিয়া নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিত। 'সাদুল্লাপুরিয়া' ঘটী এখন প্রাচীন সাদুল্লা-পুরের বাসনের কারবারের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

১। Ralph Fitch.

২। নিখিল বাবুর প্রতাপাদিত্য।

মুসলমানরাজত্ব-সময়ে কাষ্ঠখোদাই কার্য্যেরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। মালদহের পুরাতন অট্টালিকাসমূহে কাষ্ঠের নানাবিধ সুন্দর কারুকার্য্য এখনও চৌকাঠ-কপাট-আদিতে, আলিসার মহবতে, কাষ্ঠের থাম ও মেহরাপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। মালদহের পুরাতন কোন কোন পাকা বাড়ীর আলিসার মহবৎ প্রস্তর- বা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত না হইয়া তৎপরিবর্ত্তে ছাঁচে তোলা মৃত্তিকা পোড়াইয়া প্রস্তুত হইয়াছিল, দৃষ্ট হয়। এই সকল মহবৎ এরূপ মজবুদ্, সুছাঁদ ও চিত্রিত যে, তদ্দ্বারা মুসলমান-শাসনকালে কুম্ভকারগণের ব্যবসায়েরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, অনুমিত হয়। উক্তরূপ মহবৎ এখন আর কুম্ভকারগণ প্রস্তুত করিতে পারে না।

মালদহ হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায়,এবং রাজধানী গৌড় শার্দ্দূলনিষেবিত বিজন গভীর কাননে পরিণত হওয়ায়, মালদহের সকল শিল্পীরই সংখ্যা ও আয় হ্রাস পায়। তবে বিদেশে মালদহের গরদ, কার্পাস ও মালদহী রেশমকার্পাসমিশ্রিত বস্ত্রের কারবার প্রচলিত থাকায়, তাহা বিলুপ্ত হয় নাই। মালদহের বস্ত্রশিল্পে আকৃষ্ট হইয়া পর্টুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও ইংরাজপ্রভৃতি সকল বণিক্-জাতিই পুরাতন মালদহে ব্যবসার জন্য আসিয়া কুঠী সংস্থাপন করিয়া ছিলেন। পুরাতন মালদহই গৌড়ধ্বংসের পর বস্ত্রব্যবসায়ের প্রধান স্থান হইয়া দাঁড়ায়। মোগল, আরমানি-প্রভৃতি বিদেশীয় জাতির দ্বাবিংশতিটী কুঠী পুরাতন মালদহের রুকুণপুর ও মোগলটুলি বিভাগে ছিল। রুকুণপুর ও মোগলটুলি এখন আম্রকাননে পরিণত ও শিবা-শার্দ্দূলের ক্রীড়াস্থল হইয়াছে। পুরাতন-মালদহস্থ ইংরাজগণের কুঠী আনুমানিক ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ নবাবের আমলে নবাবসৈন্যগণকর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছিল। মালদহে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ইংরাজ কুঠিয়ালগণ উদ্ধতপ্রকৃতি বলিয়া

পুরাতন মালদহের অধিবাসিগণের সহিত তাঁহাদিগের সদ্ভাব থাকিত না। এই অসদ্ভাবের কথা নবাব-দরবার পর্য্যন্ত উঠে। পরিশেষে সম্ভবতঃ এই অসদ্ভাব-ফলে পুরাতন মালদহ হইতে ইংরাজের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কুঠী ইংরাজবাজারে উঠিয়া যায়। যে স্থানে এখন গবর্ণমেণ্টের কাছারী আদালত আছে, সেইস্থলে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কুঠী নির্ম্মিত হয়। এই কুঠীতেই পরবর্ত্তী কালে ম্যাজিষ্ট্রেট-কালেক্টরের বিচারালয় ও কার্য্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংরাজবাজারকে মালদহ জেলার লোকে সাধারণতঃ "রংরাবাজার" বলে। হিন্দুস্থানের রঙ্গীগণ "রংরাজ" নামে পরিচিত। ইংরাজবাজার-সহরে পূর্ব্বে বহুসংখ্যক রঙ্গীর বাস ছিল। সেই জন্য তাহা "রংরাজবাজার" নামে অভিহিত হইয়া অপভ্রংশে "রংরাবাজার" হয়। পুরাতন কাগজপত্রে কোথাও "ইংরেজ-বাজার" এই নাম নাই। একালের মানচিত্রে তাহা প্রথম "অংরেজাবাদ" হইতে পরে "ইংরেজবাজার" হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান ইংরেজ-বাজারের তলস্থ জমী মকদুমপুরের অন্তর্গত, এবং তাহা তত্রত্য একজন মুসলমান বিধবার নিকট হইতে কোম্পানীর পক্ষে সালিয়ানা ২০৲ টাকা জমায় বন্দোবস্ত হয়। কলিকাতা কাউন্সিলের অধিবেশন-বিবরণীতে তাহার উল্লেখ আছে।[১] ইংরেজবাজারের এই কুঠীতে রেশম প্রস্তুত হইত। রেশমপ্রস্তুত জন্য ১৫০ খাই ছিল, এবং দুই সহস্রাধিক লোক এই কুঠীতে কাজ করিত। সৈয়দ গোলাম হোসেন স্বপ্রণীত রিয়াজউস সালাতিন-নামক গ্রন্থে [২] লিখিয়াছেন—"মালদহ (পুরাতন মালদহ) ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কার্পাসনির্ম্মিত মসলিন বস্ত্রও প্রস্তুত হয়। মালদহের গুটী পোকা হইতে

১। Wilson's Annals of Early British Administration of Bengal.

২। রামপ্রাণগুপ্ত-সম্পাদিত অনুবাদ, ৩৬ পৃষ্ঠা।

রেশম প্রস্তুত হয়। দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইল, ইংরাজ কোম্পানীর মহানন্দার অপর তীরে (বর্ত্তমান ইংরাজবাজারে) রেশমের কুঠী স্থাপন করিয়াছেন। কুঠীর অধ্যক্ষ ইংরাজ কোম্পানীর ফরমাইস-মত প্রস্তুত রেশমী ও কার্পস বস্ত্র ক্রয় করেন। এজন্য অগ্রিম দাদন করা হইয়া থাকে।" রিয়াজউস সালাতিন সন ১২০২ বাঙ্গালা সালে প্রণীত হয়। সুতরাং ইহা হইতে সেই সময়েও যে মালদহে রেশমী ও কার্পাস বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত, তাহা জানিতে পারা যাইতেছে।

ইংরাজ কোম্পানী প্রবল হইয়া উঠিলে ইউরোপীয় অন্যান্য জাতি বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করে। স্বদেশের বস্ত্রব্যবসায়ের উন্নতির জন্য ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার আইন-বলে এদেশের বস্ত্রাদির বিলাতে রপ্তানী বন্ধ হওয়ায় মালদহের বস্ত্রবাণিজ্য শ্রীহীন হইয়া পড়ে। বোম্বাই-প্রদেশীয় বণিগ্‌গণ পারস্য-উপসাগর-তীরবর্ত্তী বন্দরে তত্রত্য অধিবাসিগণের জন্য মালদহী কাপড় স্বল্পাধিক পরিমাণে গ্রহণ করিতেন। তাহার ফলে স্বল্প পরিমাণ মালদহী কাপড় প্রস্তুত হইতেছিল। এই রপ্তানী-পরিমাণ এখন খুব কমিয়া যাওয়ায় মালদহের বস্ত্র ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ তিরোধানের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। শতবৎসর-পূর্ব্বে বস্ত্র-বাণিজ্যে বাঙ্গালার কোন স্থান মালদহের তুল্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না। শতবর্ষপূর্ব্বে জনৈক ইংরাজ লেখক [১] স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, —"কি সম্ভ্রান্ত, কি গরিব, সকল পরিবারের স্ত্রীলোকেই সূত্রনির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল; অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ টাকা মুল্যের কার্পাস হইতে ২৫ লক্ষ টাকার সূত্র প্রস্তুত করিয়া তাহারা প্রতিবর্ষে ২০ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিত। এতদ্ব্যতীত সুজনী-নামক সুদৃশ্য ও মজবুত কাঁথাও তাহারা প্রস্তুত করিত, এবং তাহাতেও প্রচুর টাকা তাহাদিগের গৃহে আসিত।"

১। Buchanon.

এখন স্ত্রীলোকদিগের পরিশ্রমের মূল্য কপর্দ্দকমাত্র নহে। পুরাতন মালদহে মুসলমান-স্ত্রীলোকগণ বৎসরে দুই-চারি-খানি-মাত্র সুজনী প্রস্তুত করে।

উক্ত লেখকের প্রদত্ত বিবরণে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেবল রেশমীবস্ত্র-প্রস্তুত-কার্য্যে সেই সময়ে পুরাতন মালদহে ও তাহার পার্শ্ব-বর্ত্তী গ্রামে সাত শত তাঁত নিযুক্ত থাকিয়া দেড় লক্ষ টাকার বস্ত্র উৎপাদন করিত, ও তন্মধ্যে রেশমের মূল্য বাদে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাঁতিগণের ঘরে থাকিত, অর্থাৎ সেই সস্তার অবস্থায়, টাকায় দুই মন চাউলের সময় প্রাত্যেক তাঁতে মাসিক ৬৲ টাকার কম তাহারা লাভ করিত না।

উক্ত ইংরাজ লেখকের বিবরণে আরও জানা যায় যে, রেশম-কার্পাস-মিশ্রিত মালদহী বস্ত্র বয়ন জন্য সেই সময়ে মালদহ নগর ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে অন্যূন ৮০০০ তাঁত ছিল, এবং এই সকল তাঁতের প্রত্যেকটীতে মাসিক ২০৲ টাকার কম লাভ হইত না। এই হিসাবে মালদহী বস্ত্র হইতে মালদহের তাঁতিগণ অন্ততঃ দেড় লক্ষ টাকা লাভ করিত। এতদ্ব্যতীত প্রায় এক সহস্র তাঁত ইংরাজ কোম্পানীর নিকট দাদন লইয়া তাঁহাদিগের ফরমাইস মত "এলাচি"-প্রভৃতি রপ্তানীযোগ্য বস্ত্র প্রস্তুত করিত। আমরা কানন হামিল্টনের সাক্ষ্যে জানিতে পারি যে, এখন হইতে একশত বর্ষ পূর্ব্বে মালদহ হইতে সার্দ্ধ দ্বিলক্ষ মুদ্রা মূল্যের মালদহী বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত। হাণ্টার সাহেবের অনুসন্ধান মতে [২] চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ৬০০০৲ টাকার মাত্র

১। Hunter's Statistical Account of Malda.

২। *Ibid.*

মাল রপ্তানী হইয়াছিল, এখন বৎসরে এক হাজার টাকারও মালদহী বস্ত্র প্রস্তুত হয় না।

ইংরাজী ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী রেশম ও কার্পাসের বস্ত্র প্রস্তুত না হইয়া যাহাতে কেবল রেশম উৎপাদিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করেন। রেশমের কাটনীদারগণ যাহাতে বাহিরে কার্য্য না করিয়া কেবল কোম্পানীর কুঠীতে রেশম প্রস্তুত করে, তাহার ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিলে রেশম-কাটনীদারগণের উপর গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা হয়।[১] ইহার ফলে তন্তুবায়গণেরও বস্ত্রবয়নের নানারূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। এই ব্যবস্থায় মালদহে বস্ত্রবয়ন উঠিয়া গিয়া মালদহবাসিগণ কেবল রেশমসূত্র প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে, ও তাহার অবস্থাও দিন দিন শোচনীয় হইয়া আসিয়াছে। গত শতাব্দীর প্রথম ভাগেও মালদহে বড়-বড় বস্ত্রবণিক্ ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। পুরাতন মালদহের মোকাতিপুর গ্রামে এই সময়ে ৭৫০ ঘর তন্তুবায় ছিল, এবং বুলচাঁদ শেঠ-নামক সম্ভ্রান্ত বণিকের কলিকাতা হইতে জাহাজযোগে কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত, ইহা আমরা তাঁহার দৌহিত্রীর নিকট শুনিয়াছি। এখন পুরাতন মালদহে একখানাও তাঁত নাই। জেলার বাহিরে মালদহের কার্পাসবস্ত্র রপ্তানী হয় না, রেসমী বস্ত্রও জেলার বাহিরে অল্প-স্বল্প যায়। উক্তরূপ ব্যবস্থার ফলে মালদহে এখন প্রধানতঃ কোয়া প্রস্তুত হয়, ও তাহার অধিকাংশ ইংরাজগণের কলে কাটাই হইয়া বিলাতে যায়, দেশীয় কলে স্বল্প পরিমাণে রেশম প্রস্তুত হয়, ও তাহা বারাণসী, কনজিবেরম্ তাঞ্জোর, নাগপুর, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেরিত হয়।

বস্ত্রবয়ন- ও বস্ত্রব্যবসায়-লোপের সহিত এ জেলার শতরঞ্চ ও রঞ্জিত সূত্রের ব্যবসায়ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এখন রঙ্গিগণ আর আপন

১। Dutt's Economic History of British India.

ব্যবসায়ে নিযুক্ত নাই। তাহারা এখন আর লাক্ষা, কুসুমফুল, কাঁঠাল কাষ্ঠের গুঁড়া, হরিতকী, চাকুন্দা, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, তেঁতুল ইত্যাদি সামান্য-সামান্য দেশীয় উপাদানে সুন্দর-সুন্দর অথচ পাকা রং উৎপাদন করে না। এখন বিলাতী রঞ্জন-উপকরণের সাহায্যে অল্প-স্বল্প পরিমাণে সূত্র রঞ্জিত হয়।

যে সময়ে রেশম-ব্যবসায়ের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময়ে অর্থাৎ গত শতাব্দীর প্রথমভাগে অনুমান ১৮০৪, বা ১৮০৫ সালে মালদহ জেলায় নীলের চাষ প্রবর্ত্তিত হয়।[১] ইংরাজী ১৮৭৩ সালে প্রায় ২০টী নীলের কুঠী এ জেলায় বর্ত্তমান ছিল ও অন্যূন ৮০,০০০ আশী হাজার বিঘা জমিতে ৮,০০০০০ আট লক্ষ টাকার নীল উৎপন্ন হইত।[২] এই ব্যবসায়ের প্রধান লভ্যাংশভাগী ইংরাজ বণিগ্‌গণ ছিলেন। কিন্তু গত ২০ বৎসরের মধ্যে এই ব্যবসায়ের অবনতি ঘটিয়া এখন ইহা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

মালদহে লবণ এবং তাম্রদস্তাদি ধাতু ব্যতীত কি শিল্পজ, কি স্বভাবজ, কি কৃষিজ কোন দ্রব্যের জন্য মালদহ পরমুখাপেক্ষী ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গত ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এ জেলায় যে যে ব্যবসায়ে যত লোক নিযুক্ত ছিল, তাহা হইতেই সেই সময়ে সেই জেলায় শিল্পের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বুঝা যাইবে। মালদহে ৪০ বৎসর পূর্ব্বে নিম্নলিখিতরূপ শিল্পশ্রমজীবী আপন-আপন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল ঃ[৩]—

১। রিয়াজ উসসালাতিন।

২। Hunter's Statistical Account of Malda.

৩। Hunter's Statistical Account of Malda.

শিল্পী	জনসংখ্যা	শিল্পী	জনসংখ্যা
কাষ্ঠের কাজের জন্য করাতিয়া	৩৩	খেলান-নির্ম্মাতা	৩০
সূত্রধর	৮৬৩	হুকা-নির্ম্মাতা	৫২
নৌকানির্ম্মাতা	৯৪	শঙ্খের জিনিষ-নির্ম্মাতা	১৬১
গোগাড়ী-নির্ম্মাতা	৪০	সোলার নানাবিধ ফুল-ফল ও টুপি-আদি-নির্ম্মাতা	৬
অন্য উৎকৃষ্ট গাড়ী-নির্ম্মাতা	১৬	তাঁত-চালক	২
কাংস্যকার, পিত্তলকার	৫৬১	কার্পাসসূত্র-নির্ম্মাতা	১০২
লৌহকার	৭৬৫	কার্পাসবস্ত্র-নির্ম্মাতা	৪৬৫৪
স্বর্ণকার	১১২৫	রেশমবস্ত্র-নির্ম্মাতা	২৮৭
জহুরী	৩	দরজি	৩৬৯
টীনের কার্য্যকার	৮	রঞ্জনকার্য্য-কারী	৬৫
কুম্ভকার	৯৪৬	স্বর্ণলেস্-নির্ম্মাতা	১
মাদুর-নির্ম্মাতা	৩৪	জুতা-নির্ম্মাতা	৮৭২
পাখা-নির্ম্মাতা	১	ছাতা-নির্ম্মাতা	৭
পেটরা-আদি বেতের জিনিষ-নির্ম্মাতা	৬২	খোদখারী-কার্য্যকারক	৭
মালাকার	৩৮	ভাস্কর	২
		কাগজ-নির্ম্মাতা	১

এতদ্ব্যতীত কাগজ কাটিয়া বাণ্ডিল, ঝাড়, তাজিয়া, ফুল-ফল-বাগান ইত্যাদি, মোম হইতে ফুল-ফল, জেলার বিলখাল-লব্ধ ঝিনুক হইতে চূণ ও তাহা হইতে পালিসের ব্যবহার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট চূণের উপাদান ও অন্য নানাবিধ শিল্প মালদহে প্রচলিত ছিল। তার ও সোলার পাতার সাহায্যে সলমার কার্য্য খুব প্রচলিত ছিল। বিশেষজ্ঞদিগের মতে মালদহের সলমা বাঙ্গালার সকল জেলা হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু তাহা

এখন বিলুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার হাউইগীরগণ অতিসুন্দর নানাবিধ আতোষবাজী প্রস্তুত করিত, এখন আর তাহার কারবার নাই বলিলেই চলে। বড়-বড় মালদহী নৌকা প্রস্তুত করিবার কারখানা তুলসীহাটা, মুরালীপুর ও ইংরাজবাজারে ছিল। তাহাতে ময়ূরপঙ্খী, মধুকর, ভ্রমর, বজরা, বে-আইন-আদি চারুশিল্পপরিচায়ক নৌকা ও মাল বোঝাই করিবার উপযোগী বড় বড় নৌকা ২৫ বৎসর পূর্ব্বেও প্রস্তুত হইত। এখন এই সকল নৌকা বা চারুকারুকার্য্যপরিচায়ক বাক্স, সিন্দুক, চৌকাট, কবাটাদি প্রস্তুত হয় না। ছাতা, জুতা. কাগজ, লেস প্রস্তুত হয় না, সলমা ও কাটাকাগজের শিল্প প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, ভাস্কর কেহ নাই। যে মালদহ হইতে মস্‌লিন-বয়নকারী ঢাকায় গিয়া তাহার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিল, সেই মালদহে মোটা গামছা ভিন্ন কার্পাস বস্ত্র পাওয়া যাইত না! "স্বদেশী"-প্রচারের পর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী ও তাঁহার কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়দিগের চেষ্টায় ও উৎসাহে জোলারা সম্প্রতি ব্যবহার্য্য পরিধেয় ধুতি, সাড়ী, প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখানে নিপুণ স্বর্ণকার আর নাই। ঢাকা হইতে স্বর্ণকার আসিয়া স্থানীয় মহিলাগণের মন রক্ষা করিতেছে। মালদহের দর্‌জিগণ রঙ্গপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী ইত্যাদি জেলায় যাইবার সময় "বাঙ্গালা যাইতেছি" বলিয়া আপনাদিগের প্রাচীন গৌরবময়ী জন্মভূমিকে স্মরণ করিত। এখন এখানে ভাল কাট-ছাঁট পাইতে হইলে বাবুদিগকে কলিকাতায় দর্‌জির আশ্রয় লইতে হয়। অল্প দিন পূর্ব্বেও মালদহের রাজমিস্ত্রীরা পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহে সম্ভ্রান্ত ধনিগণের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে যাইত, এখন অন্য স্থানের রাজমিস্ত্রীর সাহায্য ভিন্ন মালদহের ধনিগণ নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতে পারেন না। মালদহের বিলখাল হইতে ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া মালদহের চূণিয়াগণ

স্থানীয় চূণের প্রয়োজন পূর্ণ করিতে পারে না, সিলেটের পাথুরে চূণ দ্বারা মালদহের চূণের অভাবের পরিপূরণ হইতেছে। ফলতঃ মালদহের প্রতি বিশ্বকর্ম্মার কৃপা একেবারে অন্তর্হিত ও তাঁহার অর্চ্চনা এ জেলা হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিশ্বকর্ম্মার অকৃপায় লক্ষ্মী বিমুখা হইয়াছেন এবং ষষ্ঠীদেবীও শিল্পকারগণের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখেন নাই, এবং তৎপরিবর্ত্তে তাহাদিগের প্রতি মহিষবাহনের দৃষ্টি বিশেষরূপে পতিত হইয়াছে।

চিরদিন সমান যায় না। কালনেমির আবর্ত্তনে পুরাতন বিদায় লইতেছে, নূতন আগমন করিতেছে; উন্নত নত হইতেছে, নত উন্নত হইতেছে; চীরধারী বন্য সুসভ্য-সুসংস্কৃত হইতেছে, সুবর্ণমণ্ডিত-পট্টবস্ত্র-পরিধারী চিরধারী বন্য মানবের দশা প্রাপ্ত হইতেছে। যে মালদহের কীটজ বস্ত্রের স্মৃতি সীতান্বেষণে বানরপ্রেরণ-সময়ে কপীশ্বর সুগ্রীবের হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল; যে মালদহের কীটজ ঊর্ণাজ ও কার্পাসজ বস্ত্রাদি, হস্তিদন্তখচিত নানাবিধ দ্রব্য ও আয়ুধাদি মহারাজরাজচক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল; যে মালদহের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য গৌড় পাণ্ডুয়ার চিতাভস্ম স্তূপ উদ্ভিন্ন করিয়া প্রকাশিত হইতেছে, এবং রঙ্গপুর, দিনাজপুর, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, রাজমহল-প্রভৃতি স্থানে গৌড় হইতে নীত ইষ্টক-প্রস্তর-খণ্ড সকল যাহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে; যে মালদহের প্রাসাদাট্টালিকা ধ্বংস করিয়া ইষ্টকখনন জন্য পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারগণ নবাব-ভাণ্ডারে সালিয়ানা আট হাজার টাকা নজরানা স্বরূপ প্রদান করিতেন,[১] যে মালদহের বস্ত্রবাণিজ্য পুরাকালে

১। "In the Revenew returns of Bengal at the time of its transfer to the Company there was an annual levy of Rs. 8000, "Gaur brick Royalty," from landholders in the neighbourhood of Gaur who had the exclusive right of dismantling its remains."—*Vide* Gour, in Encyclopœdia Britanica.

রোমক ও মিসর দেশে ও অধুনাতন কালে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও পর্ত্তুগাল-পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছিল; যে মালদহের সুধাধবলিত সৌধসজ্যের বর্ণনা কবিলেখনীতে নাটকাদি অলঙ্কৃত করিয়াছে; যে মালদহ জেলার সুনিপুণ শিল্পিগণের চারু কারুকার্য্যে গৌড়-মহানগরী দ্বাদশ লক্ষাধিক অধিবাসী, সুন্দরসুবিমল প্রাসাদ, নয়নরঞ্জন উদ্যান, সুপ্রশস্ত জনাকীর্ণ রাজপথ, মৌক্তিকমরকতসুবর্ণাদিবিজড়িত-বসনভুষণাদিশোভিত বিপণি-নিচয় বক্ষে ধারণ করিয়া ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগিজ পর্য্যটকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল; যে মালদহের পট্টবস্ত্র সাদরে "জগজ্জ্যোতিঃ" সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের কমনীয় কলেবরের কান্তি বর্দ্ধিত করিয়াছিল; যে মালদহে বাণিজ্যলক্ষ্মীর সুদীর্ঘকাল অধিষ্ঠান হেতু "সওয়া প্রহর সুবর্ণবর্ষণের" প্রবাদ প্রচলিত আছে; সেই মালদহে এখন বন-জঙ্গল ভাঙ্গিয়া, শিবা-শ্বাপদ তাড়াইয়া পতিত ভূমি সকল অনলসভাবে আবাদ করিলেও অনাহারে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, তাহার তাঁতি-কর্ম্মকারগণ হাহাকার করিতেছে! ঢেঁকি-যাঁতা ঠেলিয়াও তাহাদের উদর পূর্ণ হইতেছে না! রাজদ্বারে গতায়াত ও রাজসেবাও তাহাদের জাঠরাগ্নি নির্ব্বাণ করিতে অশক্ত! মালদহ ঠেকিয়া শিখিয়াছে :—

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী-
স্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং"

পরিশেষে বোধ হয় ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে শিখিবে :—

"ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥"

শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ।

গৌড়ীয় নৌশিল্প

ঐতিহাসিক তথ্য

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড় নগরদ্বয় প্রায় চতুর্দ্দিকে সুবৃহৎ নদী দ্বারা বেষ্টিত। যে কোনও দিক্ হইতে বৈদেশিকগণ নগরে প্রবেশ করিতেন, সেই দিকেই তাঁহাদিগকে নদী পার হইতে হইত। বিশেষতঃ, গৌড় ও পৌণ্ড্রের অধিবাসিগণের নিয়ত স্থানান্তরে গমনাগমনের জন্য নৌকার প্রয়োজন হইত। নদীপথে ও সমুদ্রবক্ষে বিচরণের জন্য, দেশ হইতে দেশান্তরে বাণিজ্যার্থ সে কালে গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অধিবাসিগণ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নৌকার ব্যবহার করিতেন। সমুদ্রপথে ভ্রমণের জন্য বড়-বড় নৌকা এ দেশে যথেষ্ট নির্ম্মিত হইত। ইহা ব্যতীত এ দেশের রাজগণ যুদ্ধকার্য্যের জন্য ছোট, বড় বিবিধপ্রকার সমরতরণী নির্ম্মাণ করিতেন। বর্ষাকালে এ দেশ একেবারে জলমগ্ন হইয়া যায়। সুতরাং নৌকা ব্যতীত একপদও অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না। আর, দেশমধ্যে বড় বড় নদীর অভাব না থাকাতে, স্থলপথ অপেক্ষা জলপথেই যুদ্ধাদি কার্য্য, বাণিজ্য, ধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রচারকগণের স্থানান্তরে গমন, এবং নৌসেতু নির্ম্মাণ করিয়া সৈন্যগণের নদীপারাপারের ব্যবস্থা এ দেশে দৃষ্ট হইত। বৌদ্ধরাজগণের সময়ে ধর্ম্মপ্রচারকগণ এ দেশ হইতে সিংহলাদি দ্বীপে গমন করিতেন। এ দেশ হইতে বৌদ্ধগণ ও বণিক্‌সমূহ চট্টগ্রামাদি প্রদেশে জলপথেই গমনাগমন করিতেন। এ দেশ হইতে আরবাদি দেশে বাণিজ্যতরণী নিয়ত গমনাগমন করিত। এ দেশী সুজনী ও রেশমী বস্ত্রে বোঝাই পোতগুলি কুমারিকা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া ঈজিপ্ত, আরব,

পারস্য, ইতালী ও সময়ে সময়ে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল। রোম নগরে এ দেশের রেশমী ও কার্পাস বস্ত্রের যথেষ্ট আদর ছিল। এ দেশের বণিগ্‌গণ দেশের প্রস্তুত পোতের আশ্রয়ে সুদূর দেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিত। হিন্দুরাজগণের সময়ে যথেষ্ট নৌব্যবহার হইত। বৌদ্ধপ্রভাব-কালে নৌশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তৎপরে হিন্দুরাজগণের সময়ে নৌশিল্প কিছু মন্দীভূত হয়। মোসলমান-শাসনকালে নৌশিল্পের আবার উন্নতি হয়। মোসলমান-বাদশাহী-আমলে গৌড়াদি স্থানের শাসনকর্ত্তৃ-গণের মালবাহী, ও সমরকার্য্যের উপযুক্ত তরণী, এবং শোভাযাত্রার উপযোগী, জলবিহারের উপযোগী, ও বেগমগণের উপযোগী বিবিধাকার প্রমোদতরণী থাকিবার কথা শুনা যায়। এ দেশের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র হিন্দু করদ-রাজগণ বাদশাহের আদেশমত যথেষ্ট যুদ্ধতরণী ও দ্রব্যাদিবহনোপ-যোগী নৌ রক্ষা করিতে বাধ্য থাকিতেন।

নৌ-ব্যবহার

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে জয়ন্ত নামে এক রাজা ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকেই আদিশূর বলেন। সেই সময়ে কাশ্মীরাধিপতি এ দেশে আগমন করেন। তাঁহার রাজকীয় তরণী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকটস্থ গঙ্গাবক্ষে অবস্থিত ছিল। তাঁহার সমরতরণী ছিল, তাহাও অবগত হওয়া যায়। সে কালের যুদ্ধনৌগুলির আকার কীদৃশ ছিল, তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া দুষ্কর।*

এ দেশে যতগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ধর্ম্মপাল-দেবের তাম্রশাসনখানি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। এই তাম্রশাসনখানি মালদহ জেলার খালিসপুর গ্রামে এক কৃষক প্রাপ্ত হয়। আমি তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়কে সংবাদ দি। উক্ত তাম্র-শাসনখানির পাঠোদ্ধার করিয়া তিনি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠে

* রাজতরঙ্গিণী।

বুঝিতে পারা যায় যে, সেই সময়ে রাজগণের সৈন্যসামন্তাদি সহ নদী পার হইবার জন্য "নৌসেতু" নির্ম্মিত হইত; এই তাম্রশাসনেই তাহা ক্ষোদিত রহিয়াছে; যথা—

> স খলু ভাগীরথী-পথ-প্রবর্ত্তমান-নানাবিধ-নৌবাটিক-
> সম্পাদিত-সেতুবন্ধ-নিহিত-শৈলশিখরশ্রেণী-বিভ্রমাৎ"—
>
> ২৫।২৬ পঙ্‌ক্তি।

নৌসেতু

এই প্রকারের যে 'নৌসেতু' নির্ম্মিত হইত, তাহার উপর দিয়া হস্তী, অশ্ব, রথ, শকটাদি অক্লেশে নিরাপদে গমনাগমন করিত। অতএব, সেই সেতুনির্ম্মাণের উপাদান-স্বরূপ নৌসমূহ ক্ষুদ্র ছিল না।

প্রধান রাজনৌরক্ষক

রাজসংসারে যথেষ্ট নৌ রক্ষিত হইত। এমন কি প্রত্যেক গ্রামের আবশ্যক রাজকার্য্যের জন্য নৌ প্রস্তুত থাকিত। তাহার রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ও হিসাব রাখিবার জন্য বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান এক ব্যক্তি থাকিতেন; তাঁহাকে রাজসভায় উপস্থিত থাকিতে হইত।

পালরাজ্য-কালে

ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে তাঁহাকে "তরিক" বলা হইয়াছে। কোনও ব্যক্তিকে তাম্রশাসন দ্বারা ভূমিদানকালে "তরিক"কে উপস্থিত থাকিতে হইত, তাহা জানা যায়।

পালবংশীয়গণের তাম্রশাসনগুলিতে নৌরক্ষকের কথা আছে, এবং আনুলীয়া (নদীয়া) গ্রামে প্রাপ্ত লক্ষ্মণশাসন ও সুন্দরবনে প্রাপ্ত তাম্র-শাসনে আমরা রাজকীয় নৌরক্ষকের উল্লেখ পাই—"নৌবল-হস্ত্যশ্ব-গোমহিষা-জীবিকা দিব্যা—"ক্ষোদিত আছে। সুতরাং সেকালে Naval forceএর এক জন সর্ব্বেসর্ব্বার সমাচার পাওয়া যায়। সেই প্রাচীন

কালের রঘু রাজাও জলপথে সমরতরণী লইয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন। পাল ও সেনবংশীয় রাজগণের সময়ে জলযুদ্ধের জন্য সমরতরণী ছিল, এবং রাজারা যে যথেষ্ট নৌ রক্ষা করিতেন, তাহার সমাচার তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ দেখা যায়।

মহারাজ বল্লালসেনের সময়ে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন পিতার রাজ্য ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন। একদা কোনও বিশেষ কারণে শীঘ্র পুত্রকে আনিবার জন্য মহেশ মাঝিকে আদেশ দেন। মহেশ মাঝির ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। সে তীরবেগে নৌকা চালাইতে পারিত। মহেশ মাঝি রাজভোগ্য সুন্দর প্রমোদতরণী লইয়া অতিসত্বর যুবরাজ লক্ষ্মণকে আনয়ন করে। তাহাতে মহেশ মাঝি মহেশপুর গ্রাম প্রাপ্ত হয়। মহেশ মাঝি তখন জাহাজের কাপ্তেন ছিল। তখন নৌবল রাজরক্ষার্থও অপরিহার্য্য ছিল।

বল্লালী-আমলে

হজরৎ পাণ্ডুয়ার বাদশা ইলিয়াস শাহ হিন্দুদিগের সহিত সদ্ভাব করিয়া বাঙ্গালীর নৌসেনাদের সাহায্যে আলিশাহকে পরাজিত করেন। হাজি ইলিয়াস বাদশাহের যথেষ্ট সমরতরণী ও নৌসেনা ছিল, তাহা অবগত হইয়া "দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ এক হাজার জাহাজের বহর লইয়া গৌড়ে আগমন করেন।"*

মোসলমাম কাল—
দেশী যুদ্ধতরণী

"মালদহ" যখন প্রধান বাণিজ্যস্থান হইয়াছিল, সেই সময়ে ও তাহার পরেও, অর্থাৎ "১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে ভিখু সেখ-নামক এক সওদাগর, তিনখানি জাহাজ বহুমূল্য বস্ত্রে পূর্ণ করিয়া পারস্য উপসাগরের পথে রুসিয়ায় প্রেরণ

* শামস সিরাজ আফিক্।

করেন।" [১] সেই কালে যে জাহাজ এ দেশ হইতে সমুদ্রপথে প্রেরিত হইত, তাহার মাঝি-মাল্লারা এ দেশী ছিল।

সেই সময়ে "মনসামঙ্গল"-প্রভৃতি মনসার গীতাদি এদেশে রচিত, লিখিত ও প্রচারিত হইতেছিল। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, ভিখু শেখের মত আরও কত শেখ হয় ত গৌড় বা মালদহ হইতে সুজনী, সুতী ও রেশমী বস্ত্র বোঝাই বড়-বড় সমুদ্রপোত বিদেশে পাঠাইয়াছিল। তখনকার বাণিজ্য-ব্যাপারের কথা এখন দেশে গল্পচ্ছলে প্রচলিত রহিয়াছে। মনসার গীতে কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ও মঙ্গলচণ্ডীর গীতে সাধুর বাণিজ্যের কথা লিখিত আছে। যে সময়ে গ্রন্থকারগণ পুঁথী লিখিয়াছিলেন, সে সময়ে লঙ্কায় বাণিজ্য মন্দীভূত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা তাহা বৃদ্ধদিগের নিকট গল্প শুনিয়া সিংহলের বাণিজ্য-অধ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তবে ভিখু শেখের মত মহাজনকে জাহাজ বোঝাই মাল লইয়া সাগরবক্ষে দেখিয়া থাকিবেন। তখন সমুদ্রতরণী কত বড় এবং কি প্রকারে নির্ম্মিত হইত, তাহাও হয় ত দেখিয়া থাকিবেন; তাই বনের কাঠ কাটিয়া নৌকা নির্ম্মাণের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন।

মনসামঙ্গল

সত্যনারায়ণী ক্ষুদ্র পুঁথিতেও সওদাগরের সিংহলে বাণিজ্য করিবার কথা লিখিত আছে।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ধনপতি সওদাগরের কথা লিখিত আছে; তাহাতে নৌশিল্প ও বাণিজ্যের কথাও আছে। গৌড়ে এখনও এক ধনপৎ সওদাগরের প্রবাদ শুনিতে পাই। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে উল্লিখিত যে ধনপৎ সওদাগর সুবর্ণপিঞ্জর প্রস্তুত করাইতে গৌড়ে আসিয়াছিলেন, তিনিই গৌড়ে বহুদিন ছিলেন।

কবিকঙ্কণ

১। স্যার জর্জ্জ উড্।

আমরা সে ধনপৎ ব্যতীত আর এক ধনপৎ-নামক ধনকুবের বণিকের সন্ধান পাই। তিনি গৌড়ের শ্রেষ্ঠ বণিক্ ছিলেন। এ দেশে শতাধিক বর্ষের প্রাচীন একটি গম্ভীরার গীতে এই ধনপৎ সওদাগরের ঐশ্বর্য্যের মহিমা-সূচক গীত আছে। গীতে প্রকাশ,—তাঁহার এত অধিক জাহাজ গৌড়বন্দরে অবস্থান করিত যে, সময়ে সময়ে গঙ্গা হইতে জল তুলিবার অবকাশ থাকিত না।

ধনপৎ সওদাগর-বিষয়ক গম্ভীরার গীতের কিয়দংশ

ধনপতি সওদাগর ও পানীহারী [১]

উত্তর-প্রতিউত্তর

পানী। কিস্‌কে জাহাজা লাগি এহি গৌড়া সাহারামে।

সও। আয়ে হামা ধনপতি সদাগর আয়ি দিল্লী সারাবাসে।

পানী। ঘাট্‌সে জাহাজ বোহার দূরা লে যাও হে পানী ভারনেসে আয়ি।

সও। মাসুলা দিয়া হম্মা শোওয়া পঞ্চাশামে, ঐহিনা বাদ্‌শাকে আগে।

পান। গৌড়ে কিনারা হ্যায় ভাগীরথী নদী, জাহাজসে ছালিয়া হায় ধনপতি। সব্ ঘাট বন্ধ কিয়া জাহাজ বোহারাসে, নাহি আদ্‌মি পাবে পানী ভর্‌নে।

আরে ঘায়েলা [২] লে যাই সখিয়া গালি কারাইছে কাহাঙ্গে মোরা আয়ি।

সও। মোয়া কাহাকে যো গালি দিয়া মেরি, কর ও নসিহত আজ তেরে পানীহারী। ফেরা বোলেগা মোঝে এইসা বোলি। তেরে

১। জলানয়নকারিণী দাসী।

২। কলসী।

গোলাল ৩ সে মারেলা জোতেরি কে এই সান লুটিকে লেবগে আরে লালি কায়ালা তোরাসে। (ইত্যাদি)

গৌড় নগরের যে স্থানে লোহাগড় ও পাতালচণ্ডী-নামক স্থান, তথায় প্রাচীন কালে বাণিজ্যতরণী-রক্ষার বন্দর ছিল। দেশের লোকে ঐ স্থানকে পোতাশ্রয় বলিত। এই স্থানে প্রস্তরময় সুন্দর নৌরক্ষার স্থান অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, এই স্থানে প্রস্তরস্তম্ভগাত্রে লৌহের শৃঙ্খল আবদ্ধ থাকিত; তাহাতে বাণিজ্যার্থ আগত পোত বন্ধন করা হইত। বৃদ্ধদের মধ্যে অনেকেই উক্ত শৃঙ্খল দেখিয়াছেন।

গৌড়বন্দরে লোহশৃঙ্খল

এই প্রকারের যে, একটিমাত্র শিকল লোহাগড়ের নিকট ছিল, তাহা নহে। গৌড়ের লোহাগড় হইতে উত্তরে অমৃতী (প্রাচীন রামাবতী) নগর—পীছলী গঙ্গারামপুর (বৌদ্ধ গৌড়) পর্য্যন্ত গৌড়ের পশ্চিম পার্শ্ব বাঁধান ছিল। এই স্থান প্রাচীন কালে বাণিজ্যবন্দর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, এবং এখানে নৌবন্ধন উদ্দেশে লৌহশৃঙ্খল প্রস্তরস্তম্ভে আবদ্ধ থাকিত। "শিকল গাড়া" নামক স্থানের শিকলটি অনেকেই দেখিয়াছেন।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে গৌড়াগত ধনপতি সওদাগরের বাণিজ্যার্থ সিংহলে গমনের কথা লিখিত আছে। কাহারা নৌকা নির্ম্মাণ করিত, নৌকা-নির্ম্মাতৃগণের প্রাথমিক সম্মান কি প্রকারে করিবার প্রথা সে কালে প্রচলিত ছিল, কি প্রকারে কোন কোন কাষ্ঠে নৌকা নিৰ্ম্মিত, কোথায় কাহারা বৃক্ষচ্ছেদন করিত, নৌকার কোন কোন অংশে কোন কোন কাষ্ঠের ব্যবহার হইত, নৌকার মন্দির কীদৃশ ছিল, যে সময়ে নৌকা ব্যবহৃত হইত না, তখন নৌকা কি প্রকারে রক্ষিত হইত, ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ এই চণ্ডী ব্যতীত অন্যান্য পুঁথিতেও দৃষ্ট হয়।

৩। বাঁটুল।

ধনপতি সিংহল-গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার বাণিজ্যপোত গুলি "ভ্রমরা"র জলে ডুবান ছিল। সে কালে সওদাগর বাণিজ্য হইতে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার নৌকাগুলি জলমধ্যে ডুবাইয়া রাখা হইত। তাহাতে নৌকা ভাল থাকিত। ডুবুরী আনিয়া জল হইতে নৌকা উঠান হইত—

"পূর্ব্ব হৈতে আছে ডিঙ্গা ভ্রমরার জলে।
ডুবারু লইয়া সাধু গেলা তার কূলে॥"

সওদাগরেরা কথায় কথায় জলদেবতার পূজা দিতেন; কারণ, জলপথেই তাঁহাদের গতিবিধি। সওদাগর ভ্রমরার কূলে জলদেবতার পূজা দিলেন। তৎপরে দুই জন ডুবুরী ভ্রমরার জলে নামিল।

নৌ-উত্তোলনকারী ডুবুরীর কথা

তখন এ দেশে যথেষ্ট ডুবুরী ছিল, এবং আধুনিক কালের ন্যায় ডুবুরীর পরিচ্ছদ না থাকিলেও, সে কালে ডুবুরীগণ নির্ভয়ে অনায়াসে গভীর জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া তলমগ্ন নৌকা ও মুক্তাশুক্তির অনুসন্ধান করিত। সেকালে এক-এক জন ডুবুরীর বিশেষ ক্ষমতা ছিল। কেহ জলে ডুব দিবামাত্র জলের অভ্যন্তরস্থ সমুদায় অবস্থা অবগত হইত। গ্রন্থাদিতে আমাদের দেশের ডুবুরীদের কথা কিছু অতিরঞ্জিতভাবে লিখিত হইলেও, তাহা অলীক বলিবার উপায় নাই। যখন "মুক্তাশুক্তি" উত্তোলন করিতে পারিত, বড় বড় নৌকাগুলি জলমগ্ন থাকিলে ডুব দিয়া তাহার সন্ধান করিতে পারিত, তখন বাঙ্গালার ডুবুরীগণ বিখ্যাত ছিল। কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন,—

"এক ডুবে যাইতে পারে অর্দ্ধেক সাগর॥"

ডুবুরীগণ একে একে ধনপতি সওদাগরের ডিঙ্গাগুলি তুলিতে আরম্ভ করিল:—

"প্রথমে তুলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
সুবর্ণের বান্ধা যার বৈঠকীর ঘর॥
তবে ডিঙ্গা তুলিলেন নামে দুর্গাবর।
আখণ্ড চাপিয়া তাতে বসিল গাবর॥
তবে ডিঙ্গাখান তোলে নামে গুয়ারেখী।
দুই প্রহরের পথে যায় মালুম কাঠ দেখি॥
আর ডিঙ্গাখান তোলে নামে শঙ্খচূড়।
আশী গজ পানী ভাঙ্গে গাঙ্গের দু কূল॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেক নামে চন্দ্রপাল।
যাহার গমনে দুই কূল করে আল॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেন নামে ছোটমুটি।
যাহে ভরা দিল চালু বায়ান্ন পউটি॥"

"মধুকর" ডিঙ্গাটি সুন্দর। তাহার বসিবার বৈঠকখানা (মন্দির) সোনার পাতে মোড়া, এবং সোনার কাজ করা। তবে তাহাতে কত মণ ভার ধরিতে পারে, তাহার কথা নাই। "দুর্গাবর" ডিঙ্গায় দাঁড়ীরা নৌকার "আখণ্ড" নামক স্থান পর্য্যন্ত (প্রায় পশ্চাৎ পর্য্যন্ত) বসিয়া দাঁড় বাহিত। সম্ভবতঃ ইহাও দ্রুতগামী ছিল। "গুয়ারেখী" ডিঙ্গাখানির মালুম কাঠ দেখিয়া দুই প্রহরের পথ যাইতে পারে। "মালুম কাঠ" বলিতে মাস্তুলের কাঠ। দুই প্রহরের পথ নৌকাখানি গমন করিলেও, গুয়ারেখীর "মালুম কাঠ" দূর হইতে দৃষ্ট হইত, সুতরাং "গুয়ারেখী" আকারে ও উচ্চতায় সুবৃহৎ ছিল। "শঙ্খচূড়" একখানি বড় জাহাজ বলিলেই হয়; কারণ "আশী গজ পানী ভাঙ্গে।" সাধারণতঃ মাঝিগণ তাহার নৌকা কত হাত পানী ভাঙ্গিতে পারে—জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "এ নৌকা তিন হাত বা এত

নৌকার নাম

হাত জলের উপর দিয়া যাইতে পারে।" এ হিসাবে ধরিলে এক শত ষাট হাত গভীর জল নহিলে "শঙ্খচূড়" যাইতে পারে না। ইহা বিশ্বাস করা চলে না; তবে "গাঙ্গের দু-কূল" শব্দ দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, নৌকাখানি আশী গজ চওড়া ছিল। সেকালে এ দেশে এত বড় বাণিজ্যপোত ছিল, তাহা হয় ত অনেকে বিশ্বাস করিবেন না; কিন্তু অবিশ্বাসের ত কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না। "চন্দ্রপাল" নৌকা অতিসুন্দর ছিল। যখন নদীমধ্য দিয়া গমন করিত, তখন তাহার সৌন্দর্য্যে নদীর উভয় তীর আলোকিত হইত। "ছোটমুখী" ডিঙ্গাতে বায়ান্ন পৌটি চাউল বোঝাই করা চলিত। আজকাল চল্লিশ মণে পৌটি হয়; সুতরাং ২০৮০/০ মণ চাউল "ছোট-মুখী"তে বোঝাই করা চলিত।

জল হইতে ডিঙ্গা ডাঙ্গায় তুলিতে হইত, এবং তাহা ঘষিয়া পরি-স্কৃত করিয়া "গাহিনী" করিতে হইত। সূতার পলিতা পাকাইয়া, নৌকার জোড়ের মধ্যে যে স্থানের সংযোগ কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে বোধ হইত, সেই স্থানে প্রেক দ্বারা পলিতাটি ক্ষুদ্র মুগ্দরের সাহায্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইত। তৎপরে জোড়ের মুখে "গোম ধূনা দিয়া সাধু গাহিল সাত নায়।" নৌকায় "গাব-কালী" দেওয়াটা আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যাহাই হউক, এই প্রকারে সে কালে বাণিজ্যার্থ নৌকা সাজাইয়া সাধু "গাবর"-গণকে অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট করিতেন।

নৌকার এক অংশের নাম "রই-ঘর" ছিল। এই "রই-ঘরে" সওদাগর অবস্থান করিতেন। "রই-ঘর" অর্থে প্রধান ঘর; "রই-কাঠ" অর্থেও নৌকার প্রধান কাষ্ঠখণ্ড।

"হাতে কেরোয়াল সব বসিল গাবর।"

হাতে দাঁড় ধরিয়া দাঁড়ীরা বসিল। সে কালে নৌকায় দাঁড়ী-মাঝি ব্যতীত প্রহরীও লইতে হইত; কারণ, পথে জলদস্যু ও স্থলদস্যুর যথেষ্ট

ভয় ছিল। সেই জন্য "দণ্ডধারী" ও "রায়বাঁশ" লইয়া কেহ কেহ রহিল। কতকগুলি লোক "ফাঁস" হস্তে করিয়া রহিল। ফাঁস দ্বারা কি কার্য্য হইত? দস্যুগণের মধ্যে এই ফাঁস ছুঁড়িয়া আকর্ষণ করিলে, কাহারও কাহারও গলদেশে ফাঁস আবদ্ধ হইত, এবং দস্যু ধৃত হইত।

জানা গিয়াছে, এই প্রকার মহাজনের নৌকায় অন্যান্য ক্ষুদ্র বণিগ্‌গণও মালপত্র বোঝাই করিয়া বাণিজ্যার্থ সমুদ্রযাত্রা করিত। নৌকাপতি কমিশন্ পাইতেন মাত্র। যাত্রীর নৌকায় মালপত্র বোঝাই করা হইত না। মালের জন্য স্বতন্ত্র নৌকা যাত্রীর নৌকার পশ্চাতে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখা হইত। নৌকায় জাতীয় পতাকা উড়িত। পাল উড়াইয়া দিত, আবার দাঁড়ীরা দাঁড় ফেলিয়াও নৌকা চালাইত। নৌকার আরোহী, দাঁড়ী, মাঝি ও রক্ষকগণের জন্য সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই "লায়ে তুলে সদাগর নিল মিঠা পানী।"

সমুদ্রযাত্রা

এক্ষণে আমরা দুই শতাধিক বর্ষের পুরাতন পুঁথি হইতে নৌকানির্ম্মাণ-প্রণালী কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিব। মালদহের জগজ্জীবন কবির প্রণীত "মনসামঙ্গল" হইতেই প্রথমে উদ্ধৃত করিতেছি—

মিস্ত্রী

"আনিল ছুতোর নেঙ্গা শিষ্যগণ সাথে।
বাণিঞাকে প্রণাম করি জোড় হাতে॥
চান্দ বলে কুশাই তাম্বুল খাও ধর।
যাইব পাটনে চোদ্দ ডিঙ্গা সাজ কর॥"

চাঁদ সওদাগর বাণিজ্যে গমন করিবেন বলিয়া কুশাই মিস্ত্রীকে ডাকিয়া "গুয়াপান" দিয়া তাহার সম্মান করা হইল। চতুর্দ্দশ ডিঙ্গা বাঁধিবার আদেশ দিলে কুশাই বহু শিষ্যগণ সহিত কাষ্ঠের অনুসন্ধানে চলিল :—

"চলিল কুশাই সঙ্গে লঞা শিষ্যগণ।
নানাজাতি বৃক্ষ কাটে প্রবেশিয়া বন॥"

সে কালে নগরের অনতিদূরে অরণ্য ছিল। নগরবাসিগণের কাষ্ঠের প্রয়োজন হইলে উক্ত বনভূমি হইতে কাষ্ঠ আহরণ করা হইত। নৌকা প্রস্তুত করিতে হইলেও বড় বড় নৌনির্ম্মাণ-কারখানার প্রধান অধ্যক্ষ বহু শিষ্য লইয়া অরণ্য হইতে আবশ্যক কাষ্ঠ আহরণ করিয়া আনিয়া, তদ্দ্বারা নৌনির্ম্মাণাদি করাইতেন।

এক্ষণে দেখা যাউক, কোন কোন বৃক্ষ কুশাই ছেদন করিল—

"শাল পিয়াল কাটে খরি তেতলি।
কাটিল নিম্বের গাছ গাম্ভারি পারলি॥
আম্র কাঁঠাল কাটে কাটয়ে বকুল।
চম্পা খির্নি কাটি করিল নির্ম্মূল॥"

এই প্রকার কয়েকজাতীয় বৃক্ষ ছেদন করিয়া আবশ্যকমত খণ্ড-খণ্ড করিল, এবং সারি সারি ফেলিয়া রাখিল। পরে—

"চিরিঞা করিল ফালি লক্ষ তিন চারি॥"

"বাছিঞা বসায় ফালা, কর্ম্মকর ভাল।
সারি সারি বসাইল লোহার গজাল॥
আসন বান্ধিঞা যাগে আর জলই পাট।
বান্ধিয়া গোলা তোলে মালুম কাট॥"

সে কালে নৌকার নামকরণ-পদ্ধতি সুন্দর ছিল। কিন্তু সওদাগরগণের মধ্যে কতিপয় নৌকার নাম বড় প্রিয় ছিল; সে কারণ দেখিতে পাই, অনেক পুঁথিতে একই রকমের কয়েকটি নাম ব্যবহৃত হইয়াছে।

চাঁদ সওদাগরের যে চৌদ্দখানি ডিঙ্গা প্রস্তুত হইল, তাহার বিবরণ দেখুন—

"প্রথমে বান্ধিল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
রায়, মহাভেরা, মুরা, ধাউরা, ভ্রমর ॥
শীতলপাটি উভমুখী কোচ কুড়াবন্ধ।
বান্ধিয়া মোহন গিরি পরম আনন্দ ॥
সারঙ্গিয়া জাহাজ গোরা আর পান সই।
চৌদ্দটি ডিঙ্গা করে আগে বাণিঞার ঠাঁই ॥"

এই প্রকারের চৌদ্দখানি বাণিজ্যপোত নির্ম্মিত হইলে, সাধু "মধুকরে" আরোহণ করিয়া গমন করিলেন :—

"মধুকরে বসিয়া, আদেশ করে বাণিঞা,
ডিঙ্গা মেগ গাবরিয়া ভাই।"

কাণ্ডারীগণকে ও গাবরগণকে নৌকায় অবস্থান করিতে বলিল। কাণ্ডারী বাণিজ্যপোতের "হাল" ধরিত, গাবরেরা দাঁড় টানিত, এবং খালাসীরা কাজ করিত। কাণ্ডারী সারঙ্গের কাজ করিত। সেকালে "পাইলট্"ও ছিল। মাণিক গাঙ্গুলীর "ধর্ম্মমঙ্গলে" সে কথার আভাস আছে

"আনিল নিশানে নৌকা ছোটে ঐরাবত।
দিশারু মালুম কাষ্ঠে দিশা করে পথ ॥"

বাঙ্গালায় দেশী জাহাজী পাইলট্‌দিগকে "দিশারু" বলিত।

বৌদ্ধ গৌড়ের অনতিদক্ষিণে, সোনাতলা ও কাঞ্চনসহরে নৌশিল্পের বিস্তীর্ণ কারখানা ছিল। প্রবাদমূলে অবগত হওয়া যায়, এই স্থানে অতি-বৃহৎ-বৃহৎ বাণিজ্যপোত ও সমরতরণী নির্ম্মিত হইত। তদ্ব্যতীত "খেল্‌নার লা", বিবিধ প্রমোদ-তরী ও ছোট ছোট "কোষা"-নামক ক্ষুদ্র সমর-নৌ নির্ম্মিত হইত।

গৌড় নগরে নৌনির্ম্মাণ-স্থান

মোসলমান গৌড়ের উত্তরপূর্ব্বাংশে "চিরাইবাড়ী"-নামক স্থানে বাদশাহী আমলে বিস্তীর্ণ নৌনির্ম্মাণ-কার্য্যালয় ছিল। প্রবাদমূলে অদ্যাপি অবগত হওয়া যায় যে, এই স্থানে রাজকীয় নৌ-নির্ম্মাণ-কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহাতে সহস্রাধিক শিল্পী কর্ম্ম করিত ও গৌড়ের সমুদায় আবশ্যক নৌ নির্ম্মিত হইত।

গৌড়ীয় নৌনির্ম্মাণ-স্থান

ভগ্ন বা জীর্ণ নৌসমূহ এই স্থানে সংস্কৃত হইত। সরকারী কর্ম্মস্থান ব্যতীত বড়-বড় সূত্রধারের নৌ-নির্ম্মাণ-কারখানা এই স্থানে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে নৌ-নির্ম্মাণার্থ কাঠ চেরাই হইত; তাহার শব্দ বহু দূর হইতে শ্রুত হইত। সাধারণ পথিকগণ ইচ্ছা করিয়া "চেরাই-বাড়ীর" কর্কশ শব্দে বিরক্ত হইয়া উক্ত স্থানে গমন করিত না। প্রতিদিন দেশ-বিদেশের বণিগ্‌গণ বড় বড় নৌকা ক্রয় করিবার জন্য এই চেরাই-বাড়ীতে আগমন করিত।

হজরৎ পাণ্ডুয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে "পালখানদীঘী"-নামক এক প্রাচীন দীঘী আছে। পূর্ব্বে এই দীঘীর পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত। তৎপরে মহানন্দা বিস্তীর্ণ জলময়ী মূর্ত্তিতে প্রধাবিত হইত। সেই সময়ে "মোড়বল্লার-ভিটা" নামক স্থানে—মহানন্দার তীরবর্ত্তী স্থানে পাণ্ডুয়া হইতে নদীতীরে গমনাগমনের জন্য একটি রাজমার্গ বিস্তারিত ছিল। "মোড়বল্লায়" একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ও বন্দর হইতে নগরে প্রবেশ করিবার সুরক্ষিত দুর্গদ্বার ছিল। সম্ভবতঃ এইটিই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পশ্চিমপার্শ্বস্থ প্রধান প্রবেশদ্বার ছিল। পালখান-দীঘী ইহার সন্নিহিত। এই স্থানে "বেণিয়াপাড়া" নামে একটি প্রাচীন স্থান আছে। এই বেণিয়াপাড়ার অনতিদক্ষিণে "বল্লাল-কাঠাল।" "কাঠাল" অর্থে অরণ্য। মোড়বল্লাল হইতে বল্লালনগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ

পাণ্ডুয়ার সন্নিহিত নৌনির্ম্মাণ-স্থান

স্থানের পার্শ্বে "লাঘাটা"য় নৌশিল্পের প্রাচীন কারখানা ছিল। প্রাচীন সূত্রধর-বংশীয়গণ এই স্থানকে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের বাসস্থান বলিয়া গল্প করিয়া থাকেন। এই বেণিয়াপাড়ার বণিগ্‌গণের বাণিজ্যপোত ছিল। তাঁহারাও চাঁদ সওদাগরের ন্যায় বাণিজ্য করিতে যাইতেন।

"মহাস্থান" নামক স্থানে বেণিয়াগণের সমাজ ছিল। তথাকার সাধুগণ পুনর্ভবা বাহিয়া বড় বড় নৌকায় মাল বোঝাই করিয়া গৌড় ও সপ্তগ্রাম হইয়া সিংহলে যাইতেন।

অলঙ্কারকুণ্ডু-নামে ভালুকীর এক বেণে ছিলেন। বর্দ্ধমানের ধুস দত্ত—"ষোল শো বেণের মাঝে যাহার মহত্ত্ব", ইছানী নগরের লক্ষপতি সাধু ও এইরূপ অন্যান্য বহু সাধু সে সময়ে বড় বড় বাণিজ্য-তরণী লইয়া বাণিজ্য করিত। গৌড়ের সাকরমা গ্রামের গর্ভেশ্বর দত্ত (প্রাচীনপুঁথি—লেকমাল্লিকা) এক জন শ্রেষ্ঠ বণিক্ ছিলেন। ইঁহারাও বাণিজ্যার্থ দেশ-বিদেশে গমন করিতেন। ইঁহাদেরও বাণিজ্যতরণী ছিল।

প্রসিদ্ধ বণিক্‌গণ

মোসলমান রাজত্বের সময় সাধুগণের বাণিজ্যতরণী লইয়া বিদেশ-ভ্রমণ অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। সেই সময়ে আরব, রোম, গ্রীস্, রুষিয়া-প্রভৃতি দেশের বণিগ্‌গণ ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিতেন।

অষ্টাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে এ দেশ হইতে কার্পাসবস্ত্র রোমে নীত হইত।

"More than eighteen hundred years ago, they were used to be taken far away to Europe, to the great city of Rome. They were highly prized there and were called by the Romans 'Karpas' which is the Bengalee name for cotton."—History of Bengal.

" It is not improbable that the vessels which were engaged in this trade, went up the great river, the Padma to Sonargang to purchase their merchandize"—*Ibid.*

আমরা ভারতবর্ষ হইতে অর্ণবপোতারোহণে দূরদেশে গমনের বহু প্রসঙ্গ অবগত হই। সিরীয়া-নিবাসী বারদিসানেসের ভারত-কথা অতিরঞ্জিত হইলেও মধুর বটে। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতের রাজদূতের প্রমুখাৎ ভারত-কথা শুনিয়া তিনি ভারতের অনেক কথা লিখিয়াছেন। বৈশ্যগণ তখন বাণিজ্য করিতেন। কিন্তু জানা যায়, ব্রাহ্মণগণও সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য করিতেন।

ডি. খৃসোসটস্ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভারতীয় বণিগ্‌গণ সমুদ্রপথে অর্ণবপোতারোহণে ভারত হইতে দেশান্তরে গমন করিতেন। স্বদেশের যে নাবিক ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিতেন, গ্রীকেরা তাঁহাকে "ইণ্ডিকো-প্লিউ-ষ্টেম্" বলিতেন। এ ত খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা। সেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড় হইতে সিংহলে ও যবদ্বীপাদি স্থানে বাণিজ্যপোতে আরোহণ করিয়া গমন করিবার কথা কি অলীক ?

কয়েক জন বৈদেশিক মোসলমান বণিকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিব। তাঁহারা আরবাদি দেশ হইতে বাণিজ্যার্থ আগমন করিয়া এ দেশে বাস করেন, এবং শেষজীবনে "ফকীরী" লইয়াছিলেন। ইতিহাসে তাঁহাদের নাম নাই। কিন্তু তাঁদের নাম ইতিহাসে লিখিত থাকা আবশ্যক। এ দেশে হিন্দু বেণিয়া-(সাধু)-গণের বিদেশ-গমন কিছু মন্দীভূত হইয়াছিল। ক্রমশঃ বিদেশী আরবীয়গণের দস্যুতায় এ দেশের বণিগ্‌গণ বাণিজ্যার্থ আর সমুদ্রপারে গমন করিতেন না। এই দুঃখের কথা স্বর্গীয় মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী গাহিয়াছেন :—

"বিংশতি বৎসর হৈল, রঘুপতি দত্ত মৈল,
ডিঙ্গা ভরি আনিত চন্দন।
আর সব সদাগর তিলেক না ছাড়ে ঘর,
না পাই চন্দন অন্বেষণ॥"

যে বাণিজ্যে গৌড়ীয় বেণিয়াগণ কোটিপতি হইয়াছিলেন, তাঁহারা কি কারণে সে ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছিলেন? মোসলমান-আমলে অত্যাচারের ভয়ে বেণিয়ারা বিদেশে গমন করিত না। ক্রমে দেশে বসিয়া কেহ লবণ, কেহ বেণিয়াদী-জিনিসের দোকান খুলিল। তখন তাহারা মোসলমান সওদাগরের নিকট পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কেহ কেহ হাটে মাথাঘষা আমলা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। কেহ মহাজনী ও ঋণদান করিয়া কুসীদবৃত্তি অবলম্বন করিল। তার পর ত আইনের বলে এ দেশের জাহাজনির্ম্মাণ ও জাহাজ বোঝাই করিয়া মাল বিদেশে লইয়া যাওয়া উঠিয়া গিয়াছিল।

নৌ-বাণিজ্যের অবসান

গৌড় কতক পরিমাণে হতশ্রী হইতে আরম্ভ হইলে, যে কয়েক জন বৈদেশিক বণিক্ এ দেশে আগমন করিয়াছিলেন, এবং বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

বৈদেশিক বণিক্

(১) চম্বল আলী, (২) মিঞা ওলি, ও (৩) মাসুম শাহ। এই তিন জনের নাম উল্লেখযোগ্য। এই তিন জন মোসলমান বণিকের পরস্পর কুটুম্বিতা ছিল।

চম্বল আলি বোগদাদ হইতে বাঙ্গালা দেশে বাণিজ্য করিতে আগমন করেন। তিনি যখন গৌড় নগরের সন্নিহিত পূর্ব্বপার্শ্বস্থ পদ্মাবক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি দূর হইতে গৌড় নগরের শোভা দেখিয়া

মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি গৌড় নগরের পরপারস্থ গোহালবাড়ী গ্রামে (প্রাচীন নাম অজ্ঞাত, সম্ভবতঃ "সুন্দরবাড়ী"-নামে সেকালে পরিচিত ছিল) তরণী হইতে অবতরণ করেন, এবং গোহালবাড়ীই ব্যবসায়ের স্থান মনে করিয়া এই স্থানে বাস করেন। গোহালবাড়ীতে সেই সময়ে বহু বস্ত্ররঞ্জকদিগের বাস ছিল। এ দেশে তাহাদিগকে "রংরেজা" বলিত। এই স্থানে সে কালে মাথার পাগড়ী প্রস্তুত হইত। দেশের রমণীগণ "সুজনী" প্রস্তুত করিত। গোহালবাড়ীর বন্দরে এই সব দ্রব্যের যথেষ্ট আমদানী হইত। কেহ কেহ বলেন, "বরখাপীরের দরগা" তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। যাহাই হউক, গোহালবাড়ীর বরখা গাজীর দরগার ও তন্নিকটবর্ত্তী "বরখা পীরের পুখুরে"র সন্নিকটে চম্বল আলী আপন বাস-ভবন নির্ম্মাণ করেন, এবং এ দেশে থাকিয়া কয়েকবার বাণিজ্য ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, চম্বল আলী সর্ব্বপ্রথম এ দেশে আসেন নাই; তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ এ দেশে আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহা-দের মধ্যে কেহ "বরখাপীরের দরগা" নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাপি এই বংশের লোক বিদ্যমান আছেন। চম্বল আলীর মাথার পাগড়ী, মশারি ও পিত্তলের খাট অদ্যাপি যত্নসহকারে রক্ষিত হইতেছে।

মিঞা ওলি

মিঞা ওলির আদি বাসস্থান আরবদেশ। তিনি বাণিজ্য-উপলক্ষে গৌড়ে আগমন করেন। তাঁহার জাহাজ পিছলী গঙ্গারামপুরের মোহানা দিয়া গৌড়ের পূর্ব্ব পার্শ্বে আগমন করে। আমাদের বোধ হয়, গৌড়ের ধ্বংস হইলে পর যখন মালদহ অতুল ঐশ্বর্য্যে ও বাণিজ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, সেই সময়ে মিঞা ওলি মালদহে বাণিজ্য করিতেন। তিনি তুলা, রেশম, মালদহের সুজনী, রেশমী ও কার্পাস বস্ত্র এ দেশ হইতে লইয়া যাইতেন। তাঁহার বহুসংখ্যক নৌকা ছিল। একদা তাঁহার মাতা তাঁহাকে বলেন,

'বাবা, তোমার নৌকা কতগুলি হইয়াছে, একবার দেখিব।" তাহাতে মিঞা ওলি তাঁহার লায়ের গাবরদিগকে প্রতি নৌকা হইতে এক জন হিসাবে একটি করিয়া দাঁড় হাতে করিয়া আসিতে বলেন। তাহাতেই তাঁহার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল!

পুরাতন মালদহের সন্নিকটে "মোগলটুলী" নামক মহল্লায় আরবাগত প্রসিদ্ধ বণিক্ মাশুম শাহ অবস্থান করিতেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম মালদহের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ও বাণিজ্যের স্থান বলিয়া এই স্থানেই প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি মালদহের চালসেপাড়া, ও শর্ব্বরী-প্রভৃতি স্থানের 'সুজনী' ক্রয় করিতেন। এক্ষণে "মালদহী সুজনী" নামে যাহা পরিচিত, বলিতে কি, পূর্ব্বকালের তুলনায় ইহা কিছুই নহে। সেকালে অধিকাংশ রমণীই সুজনীর কাজে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। মতি ও মুগার ঝালর দেওয়া রেশমী সুজনী সে কালে বাদশাহ ও বেগমগণের প্রিয়বস্তু ছিল। সেই সময়ে মালদহের নিম্নলিখিত স্থানসমূহে যথেষ্ট বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। মাশুম শাহের সেই সকল স্থানে গদি ছিল; মালদহের শান্তিপুর, ঢাকা, বরেন্দ্র-নগর, জগন্নাথপুর, চোরাড্যাং, কালকামারা, চিড়েরড্যাং, খিরশি, খিরোদা-বাদ, মনসুরড্যাং, উচলা, বর্ম্মচাল প্রভৃতি তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিল।

মাশুম শাহ

মাশুম শাহের ভ্রাতা মালদহের "কাটরা" নামক সুরক্ষিত সুন্দর বাজার নির্ম্মাণ করান। এই বাজারেই তাঁহাদের গুদামখানা ছিল। বহুমূল্য দ্রব্যাদি লইয়া বহু বণিক্ নির্ভয়ে এই কাটরার বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করিতেন।

মাশুম শাহের শতাধিক সুবৃহৎ অর্ণবপোত ছিল। তাঁহার পোতা-রোহণে অনেক বণিক্ আরবাদি দেশ হইতে এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিতেন, এবং এ দেশী পণ্যভার লইয়া স্বদেশে বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট

লাভ করিতেন। শেষজীবনে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া পরম ধার্ম্মিক ও সাধু পুরুষ বলিয়া পরিচিত ও সাধারণের সম্মানার্হ হইয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকখানি বহুমূল্য পণ্যপরিপূর্ণ বাণিজ্যতরী সাগরগর্ভে নিমগ্ন হয়। এই সংবাদ যখন তিনি শ্রবণ করেন, তখন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "জীবনে আমার জাহাজ মারা পড়ে নাই, নিশ্চয় আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে!" এই বলিয়া তিনি বাণিজ্য ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ করেন।

মালদহের মোগলটুলী-নামক স্থানে মাশুম শাহের সুন্দর আবাস ছিল। তাঁহার বংশধরগণের নিকট অবগত হওয়া যায়, তিনি পুরাতন মালদহের মোগলটুলিস্থ সুন্দর "জুম্মা মস্‌জিদ" নির্ম্মাণ করেন। মালদহের প্রাচীন মস্‌জিদগুলির মধ্যে এই জুম্মা মস্‌জিদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই মস্‌জিদের নির্ম্মাণকার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট অর্থব্যয় হইয়াছিল। এই মস্‌জিদকে কেহ কেহ "সোণামস্‌জিদও" বলিয়া থাকে। মস্‌জিদ-নির্ম্মাণ-সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচারিত আছে। সম্রাট্ আকবরের সময় ১০০৪ হিজিরায় এই মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়। র‍্যাভেন্‌শা বলেন, "এই মসজিদ ৯৪৭ হিজিরায় (১৫৬৬ খৃঃ) মাশুম-নামক বণিক্ নির্ম্মাণ করেন।" এই মস্‌জিদটি যে মাশুম শাহের নির্ম্মিত, এই প্রবাদ এ দেশে বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। মাশুম শাহের উত্তরাধিকারিগণের মুখেও আমি অনেকবার এই কথা শুনিয়াছি।

এই মস্‌জিদটি মিশ্র ইষ্টকে নির্ম্মিত, এবং ইহাতে হিন্দু দেবালয়ের প্রস্তর-ইষ্টকও যথেষ্টপরিমাণে দৃষ্ট হয়। সেই সময়ে মালদহের ধর্ম্মকুণ্ড, দেবকুণ্ড, কালিয়াদহ ও নাগদহ-নামক স্থানে যথেষ্ট হিন্দু ও বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্ত্তিবিশিষ্ট সুন্দর সুন্দর দেবালয় ছিল। সে কালে মূর্ত্তিদ্বেষী মোসলমানগণ হিন্দুদের দেবালয় ভগ্ন করিয়া তাহারই উপাদানে মসজিদ

নির্ম্মাণ করিতে ভালবাসিত। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। এই মস্‌জিদের পশ্চিমে বাঁধান সিঁড়ি মহানন্দায় গিয়াছে, এবং তাহার পার্শ্বে অনেকগুলি কবর আছে; সম্ভবতঃ মস্‌জিদের খিজমদগারদের, অথবা তাঁহার আত্মীয়গণের সমাধি হইতে পারে।

এই মস্‌জিদের কতক অংশ ইষ্টক ও কতক অংশ প্রস্তরে নির্ম্মিত। প্রধান প্রবেশদ্বার কোনও হিন্দু দেবালয় হইতে গৃহীত বলিয়া বোধ হয়। কোনও কোনও প্রস্তরে মোসলমানগণের শিল্পকলার নিদর্শন বিগুমান। মস্‌জিদস্থিত শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে ৯৭৯ হিঃ ইহা মাশুম সওদাগর-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

প্রস্তরলিপিতে যাহা লিখিত আছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল;—

Translation :—This place of worship became known in the world and was called in India by the name of Kaba, as it was the second Kaba, the date is disclosed in Baitullah Haram Masum, 1566 A. D.

র‍্যাভেনশার মতে,—

From the above inscription it is known that the Mosque was built by one Masum Sadagar in 979 A. H. (1566 A. D.).

এই মস্‌জিদের চারি কোণে চারিটি সু-উচ্চ মিনারেট ছিল। মাশুম সওদাগর নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি হাজি আবদুর কাদেরের পুত্র গোলাম গাউস-নামক সৎ বালককে পোষ্য গ্রহণ করেন। শুনা যায়, হাজী আবদুর কাদেরও এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। যাহাই হউক, তিনি একজন সিদ্ধ পীর ছিলেন। দিনাজপুর, ঘাটনগর-প্রভৃতি স্থানে তাঁহার অনেক শিষ্য ছিল।

গোলাম গাউস মোগলটুলীতে বাস করিতেন না। নিমাসরাই-নামক স্থানে,—যথায় প্রাচীন মিনারেট বিদ্যমান রহিয়াছে, উহার পার্শ্বেই

গোলাম গাউসের বাটী ছিল। মিনারেটটি তাঁহার সুবৃহৎ ইষ্টক-গৃহের পার্শ্বেই ছিল। মিনারেটের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে তাঁহার একটি প্রাচীন মস্‌জিদ ছিল। গোলাম গাউসের বংশধরগণ বলেন—সেই মস্‌জিদটি হাজী আবদুর কাদেরের প্রতিষ্ঠিত। নিমাসরাইর মিনারেটটি যে উদ্দেশ্যেই সে সময়ে নির্ম্মিত হউক না, হাজী সাহেবের সময় উহার উপর হইতে "আজান" দেওয়া হইত। উহা হাজী সাহেবের কীর্ত্তি বলিয়াই পরিচিত। মহরম, ইদ ও বকর-ইদ উপলক্ষে এই মিনারেট মশালে ও আলোকমালায় শোভিত হইত। হাজী সাহেব ও গোলাম গাউসের জীবিতকালে মহরমের সময়ে নিমাসরাই-নামক স্থানে মেলা বসিত, এবং উৎসব হইত। বেগমাবাদের পীরের দরগা হাজী সাহেবের প্রতিষ্ঠিত। এই স্থানে তিনি যোগসিদ্ধ হয়েন। বেগমাবাদে সে সময়ে শতাধিক ফকিরের স্থান ছিল। তাঁহারা যথেষ্ট নিষ্কর পীরাণ ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন।

গোলাম গাউস

এই স্থানের জঙ্গলাবাদে জঙ্গলী ফকীরের আস্তানা ছিল, এবং বহু সুমিষ্ট আম্রের মনোহর উদ্যান ছিল। কুমারবাগ একটি মনোহর সুমিষ্ট আম্রের উদ্যান ছিল। বাগবাড়ীও উদ্যান ছিল। গৌড়ের কোনও বেগম বেগমাবাদের ভূসম্পত্তি তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, এবং বাগবাড়ী-নামক স্থানে পুষ্পকানন ও সুমিষ্ট বিবিধ বিদেশজাত ফলফুলের উদ্যান করিয়াছিলেন। এই উদ্যানবাটী বেগম সাহেবার প্রিয় বিলাসনিকেতন ছিল। পূর্ব্বে এই স্থানের নাম গণিপুর ছিল। তথায় বৌদ্ধদের একটা ষড়ভুজা শক্তিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্ভবতঃ টামনা-দীঘীর উত্তর পার্শ্বে এই দেবীর মন্দির ছিল। বেগম সাহেবারা তাহা ভাঙ্গিয়া তাহাতে এনামেল ইষ্টক দিয়া একটি সুন্দর মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বাগবাড়ীর প্রকাণ্ড তোরণ উদ্যানের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। তোরণে

পীরের ক্ষুদ্র দরগা ছিল। যে সময়ে বাগবাড়ীতে মোসলমান-পল্লী বসিয়াছিল, সেই সময়ে কালু-নামক এক হিন্দু মোসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাগবাড়ীতে পীর হয়েন। তাঁহারা চারি ভাই ছিলেন। তাঁহাদের কবর ও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত পীরের আস্তানা "খোঁড়া পীরের" দরগা বলিয়া খ্যাত। অদ্যাপি তাঁহাদের দরগা রথবাড়ীর সন্নিকটে রাজমহল-রাস্তার পার্শ্বে বিদ্যমান। বাগবাড়ীকে লোকে ভ্রমক্রমে "বল্লালবাড়ী" নাম দিয়া ও শুদ্ধ করিয়া ফেলিয়া মহান্ ঐতিহাসিক ভ্রমের সৃষ্টি করিয়াছেন।

শের আলি

যাহাই হউক, গোলাম গাউসের বংশে গোলাম হোসেন নামক এক ফকীরের জন্ম হয়। তিনি পীর ছিলেন। তাঁহার পুত্র শের আলি বর্ত্তমান। তাঁহার নিকট আমি বহু বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। শের আলি মিঞা এক্ষণে গোহালবাড়ীতে বাস করিতেছেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের মাথার পাগ, মশারি, বিছানার চাদর ও পিত্তলময় খট্টা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

গোলাম গাউস এক জন সিদ্ধপীর ছিলেন। তিনি মালদহের অঘোরী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তাঁহার অনেক গল্প আছে। পল্লীকথায় তাহা লিখিত হইয়াছে।

দিনাজপুরের বিবি কিশোরী তাঁহার শিষ্যা ছিলেন। তিনি প্রতিদিন এক টাকা করিয়া মুরশীদের প্রণামী দিতেন। বগুড়ায় তাঁহার অনেক শিষ্য আছে। গোলাম গাউসের শ্বশুরালয় আরাপুরে ছিল। আরাপুরে তাঁহার সমাধিক্ষেত্র বিদ্যমান আছে। শুনা যায়, হাজী আবদুর কাদেরের বিবাহ আরাপুরে হয়। তাঁহার সমাধি পুনর্ভবাতীরে ঘাটনগরে বিদ্যমান আছে। তিনি এক শত বৎসর জীবিত ছিলেন। চামুস্ আলি তাঁহার শ্বশুর ছিলেন। আরাপুরে তাঁহার কবর হয়।

গোলাম হোসেনের স্ত্রী নিমাসরাই-এর প্রসিদ্ধ মিনারেটের [১] পার্শ্বস্থ অট্টালিকা বিক্রয় করিয়া গোহালবাড়ীতে বাস করেন।

শ্রীহরিদাস পালিত।

১। ইহা কালিন্দী এবং মহানন্দার সঙ্গমস্থলে দিল্লীর Elephant towerএর আদর্শে নির্ম্মিত।

রসায়নবিজ্ঞানের ইতিহাস

———:০:———

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন যুগ

(ক) হিন্দু

জন্ম হিন্দুস্থানে

রসায়নবিজ্ঞান যে কোন সময়ে এবং কোন স্থানে জন্ম লাভ করে, তদ্বিষয়ে এতদিন বহু বাদানুবাদ চলিতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য জ্ঞানতপস্বিগণ প্রকৃত তথ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে সকল মনস্বী এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাঁহাদের মতে হিন্দুস্থানই প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের জন্ম স্থান।

গ্রীসে নহে

ম্যাক্‌ডোনাল সাহেব (History of Sanskrit Literature—A. A. Macdonell) বলেন যে, আরবজাতি হিন্দুস্থানের বিজ্ঞান প্রতীচ্য জগতে প্রচার করেন। অনেকের ধারনা ছিল যে, গ্রীসদেশই বিজ্ঞানের জন্মস্থান। কিন্তু ভারতগৌরব রমেশচন্দ্র (Early Civilisation of Ancient India —R. C. Dutt) নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেকেন্দর সাহের (Alexander the Great) ভারত আক্রমণের পরে গ্রীসদেশে বিজ্ঞানচর্চ্চা আরব্ধ হয়। কিন্তু হিন্দুস্থানে তাহার অনেক পূর্ব্বেই এই বিদ্যার আলোচনা ছিল। কেহ কেহ আরবদেশকেই বিজ্ঞানের

জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। কিন্তু বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র (Hindu Chemistry, Part I.—P. C. Roy)

আরবে নহে

আরব লেখকগণের মধ্যে হাজি খলিফার গ্রন্থাবলী হইতে তথ্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, আরবীয়েরা হিন্দু বৈজ্ঞানিকগণের নিকট চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি আগ্রহ সহকারে শিক্ষা করিতেন। মুসলমান ছাত্রগণ জ্ঞানলাভের জন্য ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থানে আসিয়া জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্তি করিতেন। সুতরাং হিন্দুস্থানই যে, বিজ্ঞানের জন্মস্থান সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই।

সময় সম্বন্ধে সকলে এখনও একমত হইতে পারেন নাই। অতিপ্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুদের বিবিধ মতবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, পৃথিবীতে কেবল পাঁচটি মূল পদার্থ আছে, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম্। জাগতিক যাবতীয় পদার্থ এই পাঁচটি মূল পদার্থ-সমুদ্ভুত। এই মতবাদ কোন সময় হইতে চলিয়া আসিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে প্রথমে এই মতবাদ বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বেদের বয়স নিরূপিত হইলেও অনেকটা সত্যের আভাস পাওয়া যায়। হিন্দুদের মতে এই বেদ অপৌরুষেয়। যত দিন পৃথিবী তত দিন বেদ। রমেশদত্তও তাঁহার ভারতের ইতিহাসে উক্ত মতেরই পোষকতা করিয়াছেন। কিন্তু প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ ইহাকে পৌরুষেয় ধরিয়া একটা আনুমানিক সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে খ্রিষ্টের জন্মের ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হয়। কিন্তু অধ্যাপক জেকবি জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন যে, অন্ততঃ ৪০০০ খ্রিঃ পূঃ বেদের কাল। কিন্তু ম্যাক্‌ডোনাল প্রভৃতি একথা স্বীকার করেন না। যাহা হউক, উপর্য্যুক্ত বিষয়সমূহের পারম্পর্য্য আলোচনা করিলে

সময় নিরূপণ

এই বিদ্যা অন্তত ১৫০০ খ্রিঃ পূঃ হিন্দুস্থানে প্রচলিত ছিল

সহজেই অনুমিত হইবে যে, এ বিদ্যা অন্ততঃ ১৫০০ খ্রিঃ পূঃ হিন্দুস্থানে প্রচলিত ছিল। এবিষয়ে আর মত-দ্বৈধের আশঙ্কা নাই।

হিন্দুর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা

পৃথিবীর এই অন্ধযুগে বিজ্ঞান যে, হিন্দুস্থানে কেবল জন্মলাভ করিয়াছিল তাহা নয়, এখানে তাহা বৰ্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। যে সকল ঔষধ হিন্দুগণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যে সকল শস্ত্র এবং যন্ত্রাদি তাঁহারা নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তৎসমুদয় বর্ত্তমানে অতীতের গর্ভে প্রোথিত থাকিলেও যে, তাঁহাদের অদ্ভূত প্রতিভার পরিচায়ক তাহা আজকালও হিন্দুর দুই এক খানা অতি প্রাচীন জীর্ণগ্রন্থের গলিত পত্র দেখিলে সম্যক ধারণা করা যায়। চরকসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দিল্লির কুতব-মিনারের সমীপস্থ ৪০ হাত উচ্চ লৌহস্তম্ভ তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য। এই মিনারের উপরিভাগে খ্রিঃ ৪র্থ শতাব্দীর খোদিত সংস্কৃত ভাষা বর্ত্তমান। ইহার লৌহ এত উৎকৃষ্ট যে, আধুনিক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক রস্কো সাহেবও ইহাতে চমৎকৃত ও বিস্মিত হইয়াছেন। এই লৌহস্তম্ভ কখন এবং কি প্রকারে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা এখনও লুপ্ত ইতিহাস।

(খ) গ্রীক

গ্রীক্ দার্শনিক আরিষ্টোটল (Aristotle) গ্রীস্‌দেশের সর্ব্ব প্রথম বৈজ্ঞানিক। তিনি সেকেন্দর সাহের সমসাময়িক এবং গুরু। সুতরাং গ্রীকগণ যে, হিন্দুদের নিকট তাঁহাদের মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা এখানে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেকেন্দর সাহের ভারত-আক্রমণের সময় তাঁহার গুরু আরিষ্টোটল তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া হিন্দুর বৈজ্ঞানিক মতবাদ যে নিজস্ব করিয়াছিলেন, তাহা ধারণা

করা কি অযৌক্তিক? উভয় স্থানের মূলপদার্থ-বিষয়ক মতবাদ তুলনা করিলে বিষয়টা আরও পরিস্ফুট হইয়া প্রতিভাত হইবে।

হিন্দুদের মতবাদ—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটি মূলপদার্থ; আর গ্রীক্‌দের—মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু এই চারিটি মূল পদার্থ। অন্যটি (ব্যোম) বোধ হয় গ্রীকগণ তখন ধরিতে পারেন নাই। আরিষ্টোটল তাঁহার মূলপদার্থ-বিষয়ক মতবাদ-প্রচলনের সঙ্গে-সঙ্গে অন্য এক মতবাদ প্রচার করেন যে, নিকৃষ্ট ধাতুকে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা উৎকৃষ্ট ধাতুতে পরিণত করা যাইতে পারে। যদিও এই মতবাদ শুনিয়া বর্ত্তমান জগৎ হাস্য সংবরণ করিতে পারিবে না, তথাপি এই মতবাদের নিকট বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ এবং ক্রমোন্নতি অনেক পরিমাণে ঋণী।

আরিষ্টোটল, তাঁহার মতবাদ—(১) মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু এই ৪টি মহাভূত (২) নিকৃষ্ট ধাতুর উৎকৃষ্ট ধাতুতে পরিণতি

মানবের চরিত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনরূপে প্রলুব্ধ না হইলে, অথবা কোনরূপ উন্নতির আশা না দেখিতে পাইলে কেহই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে হস্তক্ষেপ করে না। এখানেও সেই কথা। মিশরবাসিগণ যখন আরিষ্টোটলের উক্ত মতবাদ পরিজ্ঞাত হইলেন, তখন তাঁহারা লোহাকে সোনা করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলেন না; ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নানারূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ইহাই রসায়ন-বিজ্ঞানের প্রকৃত কার্য্যারম্ভের সূত্রপাত করিয়া দেয়।

(গ) আরবীয়

মিশরবাসিগণ এই বিদ্যাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিবার চেষ্টা করেন, এবং ইহার নাম দেন 'কিমিয়া' (chemia) অর্থাৎ গুপ্তবিদ্যা।

তারপর যখন আরবীয়গণ ঘটনাবৈচিত্র্যে এই বিদ্যা জ্ঞাত হইলেন, তখন তাঁহারা কিমিয়ার সহিত স্বীয় মাতৃভূমির নামের পূর্ব্ববর্ণ যোগ করিয়া নাম করণ করিলেন 'য়্যালকেমি' (Alchemy)। এই আরবীয়দের নিকট হইতেই প্রতীচ্য জগৎ এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ইহার ক্রমোন্নতি সাধনপূর্ব্বক বর্ত্তমানে এতদূরে অগ্রসর হইয়াছেন।

এই ক্রমোন্নতির কথাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য। আরবগণ যে সময়ে এই বিদ্যার বিষয় অবগত হন, তাহার কিছু পরেই তাঁহাদের মধ্যে জেবের (Gaber) নামে এক বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত দেখা দেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, ধাতু সকল পারদ এবং গন্ধক এই দুই উপাদানে গঠিত। যে ধাতুতে পারদ যত অধিক থাকে, সেই ধাতু তত উৎকৃষ্ট; যে ধাতুতে গন্ধক যত অধিক, সেই ধাতু তত নিকৃষ্ট। তিনি অনেক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন। তিনি স্বর্ণকে দ্রবীভূত করিবার জন্য সোরা-দ্রাবক (Nitric acid) এবং লবণ-দ্রাবক (Hydrochloric acid) মিশ্রিত করিয়া এক মহাদ্রাবক (Aqua Regia) আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

জেবের—তাঁহার মতবাদ—ধাতুর উপাদান (ক) পারদ ও (খ) গন্ধক আবিষ্কার—মহাদ্রাবক এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া

যখন গ্রীস্ এবং ইতালীর গৌরবরবি অস্তমিত হইতেছিল, তখন এই বিদ্যা দক্ষিণ আফ্রিকা দিয়া স্পেন দেশে প্রবেশ লাভ করে, এবং আরববাসিগণ গুরুর আসনে বসিয়া প্রতীচ্য জগৎকে শিক্ষাদান করিতে থাকেন (৬৪০ খ্রিঃ)। এই সময়ের বিজ্ঞানসম্বন্ধে বর্ত্তমান জগৎ অনেক কথাই বলিয়া থাকেন। পণ্ডিতেরা বলেন যে, অতীতকালে বিজ্ঞানালোচনা থাকিলেও সেই সময়ের লোকসমূহ বিষয়গুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে পারিতেন না। অনেক বিষয়ই তাঁহাদের হাতগড়া ও মনগড়া ছিল। কিন্তু

অন্ধযুগে হিন্দুদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সম্বন্ধে যে কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই এই সকল লোকের ভ্রম দূর হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

যাহা হউক, আরব দেশ হইতেই এই বিদ্যা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপের অনেক স্থানে ইহার চর্চ্চা আরব্ধ হয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই বিদ্যা সমধিক উন্নতি লাভ করিয়া সমস্ত সভ্য জগতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং চারিদিক হইতে জ্ঞানতপস্বিগণ কঠোর সাধনা দ্বারা অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং পদার্থ আবিষ্কার করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আধুনিক যুগ

(ক) বিচিত্র রাসায়নিক পরীক্ষা

এই সময় বেসিল ভেলেণ্টাইন (Basil Valentine) বৈজ্ঞানিক জগতে প্রবেশ করিয়া প্রচার করেন যে, ধাতুসমূহ কেবল গন্ধক এবং পারদ দ্বারাই গঠিত নয়। লবণ ইহাদের অন্য একটি উপাদান, অতএব এই পদার্থত্রয়ে পদার্থসমূহ গঠিত। গন্ধক আছে বলিয়া ধাতুসমূহ অগ্নিতাপে দগ্ধ হয়; পারদ আছে বলিয়া পদার্থবিশেষে ধাতব গুণ বর্ত্তমান; এবং লবণের জন্য ধাতুসমূহ দ্রবীভূত হইতে পারে। অন্যদিকে আরিষ্টোটল সুদূর অতীত কালে যে মতবাদ একবার প্রচার করিয়াছিলেন, এই প্রতিভাবান্ পুরুষ দ্বিতীয়বার সেই মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন যে, নিকৃষ্ট ধাতুকে উৎকৃষ্ট ধাতুতে পরিণত করা সম্ভবপর। কিন্তু তাহাতে এমন এক পদার্থ আবশ্যক, যাহাকে প্রকৃতি দেবী এখনও লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। তিনি

বেসিল ভেলেণ্টাইন—তাঁহার মতবাদ—(১) ধাতুর উপাদান ৩টি, (ক) পারদ, (খ) গন্ধক, (গ) লবণ (২) স্পর্শমণির কল্পনা।

এই পদার্থের নাম দিলেন "ফিলসফার্স ষ্টোন" (Philosopher's stone)। আমাদের ভাষায় ইহার নাম স্পর্শমণি। তখন কুহকিনী আশার বিদ্যুৎ-ভাতিতে সকলের মনোগৃহ আলোকিত হইয়া উঠিল, এবং স্পর্শমণি পাইবার জন্য সকলে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

আরিষ্টোটলের মূলপদার্থ-বিষয়ক মতবাদ মধ্যযুগ পর্য্যন্ত চলিত ছিল। প্রতীচ্য জগতে তাঁহার আসন বড় উচ্চ ছিল, সুতরাং তাঁহার মতবাদ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু ভান্ হেলমণ্ট (Van Helmont)—'১৫৭৭-১৬৪৪'—এই মতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। অগ্নির যে কোন ভৌতিক অস্তিত্ব আছে, এবং মাটি যে মৌলিক পদার্থ, তাহা তিনি স্বীকার করিতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু বায়ু ও জলের মৌলিকত্ব অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

ভান্ হেলমণ্ট—তাঁহার মতবাদ—(১) অগ্নি ভৌতিক অস্তিত্ব-বিহীন, (২) মাটীর মৌলিকত্ব-অস্বীকার

সম্ভবতঃ হেলমণ্টের মতবাদ তখনও আদৃত হয় নাই। ইহার পরে আমরা যে এক অসাধারণধীসম্পন্ন ব্যক্তির নাম প্রাপ্ত হই, তিনি পুর্ব্বোক্ত মতবাদ একেবারে উড়াইয়া দিলেন। এই প্রতিভাবান্ পুরুষের নাম রবার্ট বয়েল (Robert Boyle)—১৬২৭-১৬৯১। তিনি বলিলেন পৃথিবীতে কত যে মৌলিক পদার্থ আছে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। যে পদার্থ হইতে অন্য কোন পৃথক পদার্থ পাওয়া যায় না তাহাই মৌলিক পদার্থ; এবং এই মৌলিক পদার্থ সমূহের একত্র রাসায়নিক মিলনে যৌগিক পদার্থ পাওয়া যায়। যৌগিক পদার্থের উপাদান মৌলিক পদার্থ বটে, কিন্তু মৌলিক পদার্থের উপাদান অন্য কোন পদার্থ নহে। তিনি আরও দেখিলেন যে

রবার্ট বয়েল—তাঁহার মতবাদ—(১) মূল পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ-নিরূপণ, (২) এক অদৃশ্য-বস্তুর যোগে ভস্মের ভারবৃদ্ধি

কোন একটা পদার্থকে দগ্ধ করিয়া ওজন করিলে উহার ভারের বৃদ্ধি হয়। এই বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, তখন একটা অদৃশ্য পদার্থ আসিয়া উক্ত পদার্থে যুক্ত হয়। এই নূতন পদার্থের ভারের জন্যই ভস্মের ভারের বৃদ্ধি হয়। কিন্তু এই পদার্থটি যে কি, তাহা তিনি পরিজ্ঞাত ছিলেন না। তৎকালীন প্রচলিত মতবাদের জন্য প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ষ্টলের (Stahl), ১৬৬০-১৭৩৪, নিকট আমরা ঋণী। তিনি এই পদার্থের নাম দিলেন "ফ্লজিষ্টন"। তাঁহার মতে সকল দাহ্য পদার্থই মিশ্র-পদার্থ। এই নিমিত্তই কাঠ জ্বলে, আর পাথর জ্বলে না। যখন কাঠ জ্বালান হয়, তখন ফ্লজিষ্টন বাতাসের সহিত মিশিয়া যায়; এবং বাতাস হইতে বৃক্ষাদি এই পদার্থ গ্রহণ করে, এবং বৃক্ষদেহে ইহা থাকিয়া যায়। প্রত্যেক পদার্থেই এই ফ্লজিষ্টন অল্প পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। যেখানে উত্তম বায়ু-প্রবাহ বর্ত্তমান, সেখানে পদার্থ-সমূহ সহজে নষ্ট হয়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, এই অবস্থায় ফ্লজিষ্টন প্রবলবেগে ঘুরিবার গতি প্রাপ্ত হয়, এবং সেই জন্যই পদার্থ সহজে নষ্ট হয়।

ষ্টল, তাঁহার মতবাদ—ফ্লজিষ্টন

ষ্টলের পর যে কয়েকজন বৈজ্ঞানিক দেখা দেন ব্ল্যাক (Black) তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি নানাপ্রকার প্রক্রিয়া করিয়া দেখিলেন যে, মৃদু ক্ষারে যে গুণ বর্ত্তমান, তীক্ষ্ণ ক্ষারে সে গুণ নাই; এবং এই মৃদুক্ষারে দ্রাবক সংযুক্ত করিলে, যে ফেনার মত এক রকম পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা ক্ষার-নিঃসৃত এক রকম বায়ু। তিনি এই বায়ুর নাম দিলেন 'আবদ্ধ বায়ু'। তিনি দেখিলেন যে, মৃদু ক্ষার একটা মিশ্র পদার্থ, এবং ইহা তীক্ষ্ণ ক্ষার ও এই আবদ্ধ বায়ুর দ্বারা গঠিত। মৃদুক্ষার হইতে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা আবদ্ধ বায়ু বাহির করিয়া দিলে

ব্ল্যাক, তাঁর আবিষ্কার—(১) ক্ষারের গুণ, (২) আবদ্ধ বায়ু, (৩) Latent and Specific heat.

তীক্ষ্ণক্ষার উৎপন্ন হয়। তিনি ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে পদার্থের Latent heat বা প্রচ্ছন্ন তাপ (অর্থাৎ যে তাপ পদার্থের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া উহাকে তরল বা অনিল অবস্থায় রাখে), এবং Specific heat বা আপেক্ষিক তাপ (অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জলকে নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় উত্তপ্ত করিতে যত তাপ আবশ্যক তাহার সহিত তুলনা করিয়া সম পরিমাণ অন্য পদার্থকে সেই মাত্রায় তুলিতে যে পরিমাণ তাপের আবশ্যক), আবিষ্কার করিয়া সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

(খ) অনিল আলোচনার যুগ

ব্ল্যাকের আবদ্ধবায়ু-আবিষ্কারের পর বিজ্ঞান-জগতে অনিল-পদার্থের (Gaseous body) চর্চ্চা আরব্ধ হয়; এবং প্রিষ্টলি (Priestley) ১৭৭৪ সনের ১লা আগষ্ট তারিখে 'অম্লান অনিল,' (Oxygen) আবিষ্কার করিয়া বৈজ্ঞানিক জগতে এক নবযুগের প্রবর্ত্তন করেন। তিনি একদিন আতস কাচ দ্বারা সূর্য্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করিয়া লোহিত পারদভস্ম উত্তপ্ত করিতেছিলেন, এবং তাহা হইতে এক রকম অনিল বাহির হইতেছে অনুমান করিয়া এক কাচপাত্র জলপূর্ণ করিয়া তাহার উপর ধরিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখিলেন যে, সেই অনিল সমুদায় জল বাহির করিয়া দিয়া উহার ভিতর প্রবেশ করিতেছে। তিনি এই অনিলের অভিনব গুণ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। একখণ্ড লৌহশলাকা উত্তপ্ত করিয়া এই অনিলের মধ্যে ধরিলে উহা জ্বলিয়া গেল। তিনি এই অনিলের নাম দিলেন 'ডিফ্লজিষ্টিগেটেড্' এয়ার (Dephlogistigated air)। ইহার পর তিনি কতকগুলি পদার্থ আবিষ্কার করেন।

প্রিষ্টলি, তাঁহার আবিষ্কার—(১) ডিফ্লজিষ্টিগেটেড্ এয়ার (Oxygen), (২) ফ্লজিষ্টিগেটেড্ এয়ার (Nitrogen), (৩) এমোনিয়া, (৪) এবং অন্যান্য পদার্থ

তিনি প্রচলিত মতবাদের পথ ছাড়িয়া যাইবার সাহস পান নাই, সেই জন্যই তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত প্রত্যেক পদার্থের নামেই 'ফ্লজিষ্টন' শব্দ যোগ করিয়াছেন।

রাদারফোর্ড, তাঁহার আবিষ্কার—(১) যবান

১৭৭২ খৃঃ অব্দে রাদারফোর্ড (Rutherford) যবান (Nitrogen) আবিষ্কার করেন। প্রিষ্টলিও সেই বৎসর নিজ প্রতিভাবলে উক্ত অনিল প্রস্তুত করিয়া তাহার নামকরণ করিলেন 'ফ্লজিষ্টিগেটেড্ এয়ার।'

ক্যাভেণ্ডিস—তাঁহার আবিষ্কার—(১) পরিমাণমূলক পরীক্ষা, (২) উজান, (Hydrogen), (৩) বায়ু ও জলের মৌলিকত্ব-ধ্বংস

প্রিষ্টলির পর ক্যাভেণ্ডিশ (Cavendish) দেখা দিলেন। তাঁহার সমস্ত পরীক্ষাই পরিমাণমূলক ছিল। তিনি পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, দস্তা অথবা লৌহের সহিত পাতলা দ্রাবক মিশাইলে এক রকম দাহ্য অনিল (উজান) উৎপন্ন হয়, এবং যদি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পদার্থ সমপরিমাণ ব্যবহার করা যায়, তবে ইহা হইতে সম পরিমাণ অনিল পাওয়া যায়। এদিকে প্রিষ্টলির অম্লান-আবিষ্কারের পর চারিদিকের বৈজ্ঞানিকগণ বায়ুমণ্ডলের উপাদানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং ভিন্ন-ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া ভিন্ন-ভিন্ন স্থানের ভিন্ন-ভিন্ন বৈজ্ঞানিকগণ ভিন্ন-ভিন্ন তথ্যে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যখন সকলের মনে ধারণা হইল যে, সকল স্থানের বায়ু এক নহে, তখন ক্যাভেণ্ডিসের গভীর গবেষণা প্রচার করিল যে, সকল স্থানেরই বায়ুর উপাদান এক, এবং এই বায়ু ডিফ্লজিষ্টিগেটেড্ এয়ার দ্বারা গঠিত। ১০০ ভাগ বায়ুতে প্রথমটী ২০·৮ ভাগ এবং দ্বিতীয়টী ৭৯·২ ভাগ বর্ত্তমান।

ইহার পরে ক্যাভেণ্ডিস পুনরায় জল লইয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। তিনি অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, ১০০০ ভাগ সাধারণ বায়ুকে জলে পরিণত করিতে ৪২৩ ভাগ উজান (Hydrogen) আবশ্যক। কিন্তু সমগ্র বায়ুর $\frac{১}{৫}$ ভাগ জলে পরিণত হয়, আর $\frac{৪}{৫}$ ভাগ অবশিষ্ট থাকে। পুনরায় উজান সংযুক্ত করিয়াও আর জল পাওয়া গেল না। তিনি তারপর ২ ভাগ উজান এবং ১ ভাগ অম্লান একটী বায়ুশূন্য কাচের নলের মধ্যে রাখিয়া উহাতে তড়িৎস্ফুলিঙ্গ প্রয়োগ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, একটা ভীষণ শব্দসহ ওই কাচ-নলের গায়ে শিশির-বিন্দুর মত জলকণা আবির্ভূত হইয়াছে।

তবেই দেখা গেল যে, বায়ু এবং জল মৌলিক পদার্থ নয়। তাহারা মিশ্র পদার্থ।—এইরূপে যুগ-যুগান্তরের তমিস্র কাটিয়া উষার আলোকে বিজ্ঞানাকাশ লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

যখন প্রিষ্টলি ইংলণ্ডে বসিয়া অম্লান অনিল আবিষ্কার করেন, তখন সুদূর সুইডেনবাসী সিলে (Scheele), ১৭৪২-১৭৮৬,—স্বকীয় প্রতিভাবলে উক্ত অনিল আবিষ্কার করেন। তিনি বায়ু লইয়া নানারূপ পরীক্ষা করিতে করিতে এই অনিল প্রাপ্ত হন।

সিলে, তাঁহার আবিষ্কার—(১) অম্লান, (২) হরিতীন, (৩) গ্লিস্‌রিন

১৭৭৪ খ্রিঃ অব্দে সিলে হরিতীন অনিল (Chlorine gas) আবিষ্কার করেন। তিনি জৈব রসায়নে বিশেষরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়া অনেক পদার্থ আবিষ্কার করেন। কিছুদিন পরে 'গ্লিস্‌রিন' আবিষ্কার করিয়া তিনি রসায়ন ভাণ্ডারে একটী অমূল্য রত্ন উপহার দিলেন। এই প্রতিভাবান্ ব্যক্তির সকল পরীক্ষাই পরিমাণমূলক ছিল।

(গ) রাসায়নিক তত্ত্ব ও বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠা

এই সময় ফরাসী বৈজ্ঞানিক ল্যাভোয়াসিয়ার, ১৭৪৩-১৭৯৪,—বিজ্ঞান জগতে প্রবেশ করিয়া স্বকীয় অসামান্য প্রতিভাবলে বিজ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ় করিলেন।

তিনি প্রথমে তুলাদণ্ডের আবিষ্কার করিয়া তাহার সাহায্যে আপনার পরীক্ষাগুলি পরিমাণ-মূলক করিয়া তোলেন। তাহার প্রধান মতবাদ "পদার্থসমূহ অবিনশ্বর"। তারপর তিনি গন্ধক এবং প্রস্ফুরক (Phosphorous) পোড়াইয়া দেখিলেন যে, ইহাতে পদার্থদ্বয়ের ওজন কম না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইল। ইহার পর তিনি একটি আবদ্ধ পাত্রের বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া তাহাতে উক্ত-রূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ ঐ পাত্রটি উত্তপ্ত করিয়া তাহার গলদেশ ভগ্ন করিবামাত্র দেখা গেল যে, বাতাস সজোরে উহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু সমস্ত বাতাস মিশ্রিত না হইয়া খানিকটা পড়িয়া আছে, এবং এই অবশিষ্ট অংশে সাধারণ বায়ুর গুণ বর্ত্তমান নাই। তখন তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, বাতাস যে দুই উপাদানে গঠিত, পদার্থ সকলকে ভস্ম করিবার সময় ঐ দুইটির একটি আসিয়া উক্ত ভস্মের সহিত যুক্ত হয়, এবং তাহাতেই ভস্মের ভার মূল পদার্থ হইতে অধিক হইয়া থাকে। ১৭৭৮ সনের ৮ই আগষ্ট তারিখে তিনি উক্ত উপাদান 'অম্লান' নামে প্রচার করেন। সঙ্গে-সঙ্গে ফ্লজিষ্টনবাদ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। তাঁহার উক্ত মতবাদ কিছু দিনের জন্য জনসমাজে আদৃত হয় নাই। কিন্তু সত্যের নিকট সকলেরই মস্তক অবনত করিতে হয়। তাই কিছুদিন পরে সকলেই এই মতবাদ গ্রহণ করিলেন।

ল্যাভোয়াসিয়ার, তাঁহার আবিষ্কার এবং তত্ত্ব—(১) তুলাদণ্ড, (২) পদার্থের অবিনশ্বরত্ব, (৩) ভস্মের প্রকৃত স্বরূপ নিরূপণ এবং ফ্লজিষ্টনবাদধ্বংস

প্রসিদ্ধ জন ডালটন (John Dalton ১৭৬৬-১৮৮৪) এই সময় কর্ম্মক্ষেত্রে যোগ দিলেন। তিনি ১৮০৪ খৃঃ অব্দে পরমাণুবাদ প্রচার করেন। কিন্তু এই পরমাণুতত্ত্ব কণাদমুনি সেই মহাকাব্য-যুগেই প্রচার করিয়াছিলেন।

পরমাণু তত্ত্বে কণাদ

প্রতীচ্য জগৎ ডালটনের আসন উচ্চে রাখিবার জন্য কণাদমুনির কথা শ্রবণ করিতে অনেক সময়ই নারাজ হইয়া থাকেন। যাহা হউক, ডালটনের জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ভাণ্ডারও নূতন নূতন তত্ত্বে পূর্ণ হইতে লাগিল। তিনি প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন যে, যখন কোন মূল পদার্থের ১ ভাগ অন্য কোন মূল পদার্থের ১ ভাগের সহিত মিলিত হইয়া ২ ভাগ অন্য একটি পদার্থে পরিণত হয়, তখন প্রত্যেক সময়ই তাহাদের এই ভাবে মিলন কার্য্য সম্পন্ন হইবে। ইহাই বর্ত্তমান "নির্দ্দিষ্ট অনুপাতের" নিয়ম। তারপর তিনি "গুণিত অনুপাতের" নিয়ম আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন যে কখনও একটি পদার্থ অন্য একটি পদার্থের সহিত ভগ্নাংশে মিলিত হইবে না; অর্থাৎ পরিমাণুসমূহ অবিভাজ্য, এবং সকল সময়েই তাহাদের স্বকীয়গুণ বর্ত্তমান থাকিবে। তাহাদের সকলেরই একটি নির্দ্দিষ্ট ওজন আছে, এবং এক পরমাণু হইতে অন্য পরমাণুর জন্ম হইতে পারে না।

ডালটন, তাঁহার তত্ত্ব—(১) পরমাণুতত্ত্ব, (২) নির্দ্দিষ্ট অনুপাতের নিয়ম, (৩) গুণিত অনুপাতের নিয়ম, (৪) পরিমাণিক গুরুত্ব

এতদূর অগ্রসর হইয়াও ডালটন পরিমাণুবাদ সম্যগ্‌ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না। সুইডেনবাসী বারজিলিয়স (Berzelius ১৭৭৯-১৮৪৮) এই পরমাণুবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

বারজিলিয়স্ তাঁহার তত্ত্ব—পরমাণুতত্ত্বের সুপ্রতিষ্ঠা

জৈব রসায়নে অনেক স্থানেই দেখা যায় যে, কতকগুলি এমন মিশ্র পদার্থ আছে যাহাদের অণুগুলির সংখ্যা সমান এবং একই, কিন্তু গুণ বিভিন্ন।

এই সমস্যা উদ্ধার করিতে বারজিলিয়স চেষ্টা করেন, এবং ১৮৩২ খৃঃ অব্দে তিনি নানা পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন যে, দুই প্রকার অণুর মধ্যে পরমাণু সমূহ বিভিন্ন ভাবে সজ্জিত। তিনি ইহাদিগকে ভূতবিকার (Isomer) আখ্যা দিলেন। কিন্তু তিনি সম্যক্ ভাবে এই বিষয় ধরিতে পারেন নাই। জর্ম্মাণ পণ্ডিত কেকুলে এই সমস্যার উদ্ধার করেন। তিনি বিভিন্ন প্রকার চিত্র এবং বলয় অঙ্কিত করিয়া পরমাণু সমূহকে সাজাইয়া বারজিলিয়সের মতবাদকে দৃঢ় করিয়া তুলিলেন।

১৮১১ খৃঃ অব্দে ইতালীয় পণ্ডিত এভোগাড্রো (Avogadro) অণু ও পরমাণুর পার্থক্য বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার মতে, মূল হউক আর মিশ্র হউক, প্রত্যেক পদার্থই কতকগুলি ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি। ইহাদিগকে অণু বলে, এবং দুই বা ততোধিক পরমাণুর সমন্বয়ে এক একটি অণু গঠিত।

এভোগ্যাড্রো, তাঁহার তত্ত্ব —(১) অণু ও পরমাণুর পার্থক্য, (২) অণুর স্বরূপ নিরূপণ

ডালটন যেমন "নির্দ্দিষ্ট অনুপাতের" নিয়ম আবিষ্কার করিলেন, গেলুসাক তেমনি ১৮০৫ খৃঃ অব্দে অনিল পদার্থের মধ্যে একটি সুন্দর সামঞ্জস্যের আবিষ্কার করিয়া প্রচার করিলেন, যে ১ ভাগ আয়তনের অম্লান ঠিক ২ ভাগ আয়তনের উজানের সহিত মিলিত হইবে।

গেলুসাক, তাঁহার তত্ত্ব —() অনিল পদার্থের বিশেষ লক্ষণ

এভোগ্যাড্রো উক্ত আয়তনের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, বিভিন্ন অনিল পদার্থের এক আয়তনের মধ্যে সমান-সংখ্যক পরমাণু বর্ত্তমান।

তৃতীয় অধ্যায়

নবযুগের সূচনা

শত বৎসর ধরিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত মতবাদসমূহ চলিয়া আসিতেছে। ল্যাভোয়াসিয়ার, ডালটন, বারজিলিয়স, এভোগ্যাড্রো-প্রভৃতি মনস্বিগণ যে ভিত্তির উপর বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেই ভাবেই ইহা চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু অনুসন্ধানপ্রিয় মানবের অনুসন্ধিৎসা চিরদিনই থাকিবে। তাই বর্ত্তমানে বিভিন্ন স্থানের বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন পথে ভ্রমণ করিয়া নূতন একটা সত্যের আভাস পাইয়াছেন যে, জাগতিক যাবতীয় পদার্থের মূলে একজাতীয় পদার্থ বর্ত্তমান, এবং সেই সূক্ষ্মাণুরদ্বারা সমস্ত পদার্থ গঠিত। ৩০ বৎসর হইতে চলিল এই ধারণা কল্পনারাজ্য হইতে বাস্তব-মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। জে, জে, টমসন (Corpuscular Theory of J. J. Thomson) নানারকম পরীক্ষা করিয়া এই ধারণায় উপস্থিত হইয়াছেন যে পরমাণু সকল অবিভাজ্য নয়, ইহারা সব সময় ভাঙ্গিতেছে; প্রত্যেক পরমাণু কতকগুলি সূক্ষ্মাণুর সমষ্টি। সূক্ষ্মাণুসমূহ বিভিন্ন ভাবে সজ্জিত এবং তড়িৎ-শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট ও বিকৃষ্ট হইতেছে, এই সূক্ষ্মাণুর পরিমাণসম্বন্ধে তিনি বলেন যে, একটি সূক্ষ্মাণু এক পরমাণু উজানের $\frac{১}{১৭০০}$ ভাগ, এবং পরমাণুগুলির ওজনের অনুপাতে সূক্ষ্মাণুগুলি অবস্থিত। অর্থাৎ ১ পরমাণু উজানে যদি ১৭০০ সূক্ষ্মাণু থাকে, তবে ১ পরমাণু অম্লজানে ১৭০০ × ১৬ সূক্ষ্মাণু থাকিবে।

জে, জে, টমসন, তাঁহার তত্ত্ব —(১) পরমাণুর বিভাজ্যতা, (২) সূক্ষ্মাণু

এইখানেই পরমাণুবাদের শেষ উপস্থিতি। এতদিনে বুঝি তাহার লীলা ফুরাইয়া আসিল।

এদিকে আবার অধ্যাপক রামজে (Ramsay) ও সডি (Soddy) ১৯০৩ খৃঃ অব্দে প্রচার করিয়াছেন যে, নবাবিষ্কৃত রেডিয়ম ধাতু হইতে হিলিয়ম-নামক একটি অনিল পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং আবার যে মানব সাধারণ লোহাকে সোনা করিবার প্রয়াস পাইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু এত শীঘ্র বিষয়টাকে এত লোভনীয় করা অনুচিত। সম্ভবতঃ কোন অজ্ঞাত কারণে রেডিয়ম হইতে হিলিয়মের পরমাণু ছুটিয়া বাহির হইতেছে। কোন স্পর্শমণির সংস্পর্শে উক্ত কার্য্য হইতেছে না।

রামজে ও সডি, তাঁদের আবিষ্কার (১) হিলিয়ম

উপসংহারে বিজ্ঞানের জন্মস্থান-সম্বন্ধে দুই-একটী কথা না বলিয়া প্রবন্ধের শেষ করিতে পারিতেছি না। যে হিন্দুস্থান বিজ্ঞানের জন্মস্থান, সেখানে বিজ্ঞানচর্চ্চার আজ কি শোচনীয় অবস্থা! বর্ত্তমান জগৎ বিজ্ঞানদ্বারা চালিত ও প্রত্যেক কার্য্যই বিজ্ঞানসাপেক্ষ, এ সকল জানিয়া শুনিয়াও ভারতবাসী নিশ্চেষ্ট এবং জাতীয় উন্নতির মূল কারণ বিজ্ঞান-উপাসনা ত্যাগ করিয়া ঘোর তিমিরে নিমগ্ন! যে হিন্দুস্থানে জগতের অন্ধযুগে বিজ্ঞানপ্রবাহ খরবেগে প্রবাহিত ছিল, প্রতিরুদ্ধ না হইলে সেই প্রবাহ যে আজ বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া সমস্ত জগৎ প্লাবিত করিত তাহাতে কি সন্দেহ করিবার কোন কারণ আছে, সহৃদয় পাঠকবর্গ একবার অনন্যমনা হইয়া এ বিষয়টি চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

উপসংহার

৺ ত্রৈলোক্যনাথ সেন গুপ্ত।

অন্ন-সংস্থান*

আমাদের শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতি বিধান করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় উদ্ভাবনের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমাদের বৈষয়িক জীবনধারা ক্রমশঃ ক্ষীণ, মন্দগতি ও অবরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। আমরা যে জীবনসংগ্রামের আবর্ত্তের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি তাহাতে জয়লাভ করিবার উপযোগী সামর্থ্য আমাদের একেবারেই নাই; এবং পাশ্চাত্য জগতের সহিত শিল্প-ও-বাণিজ্য-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র। প্রথমতঃ, আমাদের সমাজের যে শ্রেণীর লোক প্রধানতঃ কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অশিক্ষিত। আর যাহাদেরইবা কিঞ্চিৎ বুদ্ধিশক্তি ও শিল্পনৈপুণ্য আছে তাহারাও সাধারণতঃ নূতন অবস্থার উপযোগী নূতন উপায় উদ্ভাবন অথবা নবাবিষ্কৃত উন্নত যন্ত্রাদির সাহায্য গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতে অসমর্থ। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ধনিসম্প্রদায় এবং মহাজনগণ অতিশয় স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, তাঁহারা শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধে একেবারেই অনুৎসাহী এবং এক প্রকার উদাসীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আবার, যে পরিমাণ মূলধনের সাহায্যে আমাদের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য চলিতেছে তাহাও ব্যক্তিগত এবং পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। ফলতঃ, সমবেতব্যবসায়, যৌথকারবার, মহাজনসঙ্ঘ প্রভৃতির অভাবে আমাদের জাতীয় ধনভাণ্ডার নিজের শক্তি

শিল্প ও ব্যবসায় বিষয়ে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা

---

* ময়মনসিংহ সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত।

প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। তৃতীয়তঃ, যে উৎসাহ, পরিচালনাশক্তি ও নায়কোচিত দায়িত্ববোধের ফলে জগতে অসম্ভবও সম্ভব হয়, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিচিত্র শক্তি একস্থানে এবং এক উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভুত হইয়া বিরাট শক্তিসমুচ্চয়ের সংঘটন করে, সেই কর্ম্মকৌশল, ব্যবসায়বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ও ঐক্যবিধায়িনী ক্ষমতা আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থায় বিকশিত হইতে পায় না। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে বিজ্ঞান, শিল্প ও ব্যবসায়কে অপসারিত করিয়া সাহিত্যশিক্ষাই একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিয়াছে। কাজেই আমাদের শিক্ষিত সমাজ প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক জগতের তথ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এরূপ অবস্থায় আমাদের বৈষয়িক উন্নতি সম্বন্ধে আমরা যে সন্দিহান হইব, এবং শিল্প-সংগ্রামে জয়ী হইবার আশা দুরাশা হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

কিন্তু রণে ভঙ্গ দিলে চলিবে না ; উপায় উদ্ভাবন করিতেই হইবে। এই জীবনসংগ্রামে সফলতা লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে যে প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সম্মুখে যে কয়টী পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে তাহাও নির্দ্দিষ্ট করা হইবে।

ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়, এবং গ্রামগত ও পরিবার-বদ্ধ শিল্প পদ্ধতিই প্রচলিত। এখানে পাশ্চাত্য জগতের বিপুল আয়োজন, বিরাট কারখানা-সংঘটন ও বিশাল ব্যবসায়-কলেবরের সৃষ্টি হয় নাই। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির প্রয়োগ, মূলধনের সমবায়সাধন, বিচিত্র বিজ্ঞাপনপ্রণালী, পণ্যসরবরাহের শৃঙ্খলা এবং শ্রমবিভাগনীতির প্রবর্ত্তন প্রভৃতির ফলে ইউরোপীয়েরা সমগ্র পৃথিবীর দেশ-প্রদেশগুলিকে যে ভাবে করতলগত করিয়া বিশাল বিশ্ব-বাজারের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ফলে তাহাদের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণি-

সমস্যা—পাশ্চাত্য ও ভারতীয় বৈষয়িক পদ্ধতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা

জ্যের প্রতাপে অন্যান্য জাতির বৈষয়িক সাধনা যে ফলবতী হইতে পারিবে তাহার আশা করা সুকঠিন। এই শক্তির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগত বৈষয়িক জীবন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে কি না তাহাই প্রধান ভাবিবার বিষয়। আমাদের যে সামান্য ধনশক্তি, ব্যবসায়বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতা আছে তাহারই সদ্ব্যবহার করিয়া আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারিব কি না—ইহাই আমাদের প্রথম সমস্যা।

বৈষয়িক জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের স্থান

শিল্পের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে সকল দেশেই বৃহৎ আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গেই কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়-পদ্ধতিও আনুষঙ্গিকভাবে অথবা স্বাধীনরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে। এই জন্য আধুনিক পাশ্চাত্যজগতে কলকারখানাগুলি গৃহশিল্প, গ্রাম্যব্যবসায় ও হস্তনির্ম্মিত কাজের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারবার এইরূপে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া বহুলোকের স্বাধীন অন্নের সংস্থান করিয়াছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রভাবে শিল্প ও ব্যবসায়ের বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলিই শিল্পজগতে সম্পূর্ণ স্থান অধিকার করে নাই।

জীবজগতের সর্ব্বত্রই এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কার্য্য চলিতেছে; এবং প্রকৃতিদেবী অসমর্থ ও অনুপযুক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সমাজকে অপসারিত করিয়া উপযুক্ত ও সামর্থ্যবান্ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সমাজকেই অঙ্কে স্থান দিতেছেন। যে ব্যক্তি, সমাজ বা প্রতিষ্ঠান নিজের প্রয়োজন মত পারিপার্শ্বিক শক্তিপুঞ্জ ব্যবহার করিয়া নিজের অঙ্গ পুষ্ট করিতে পারে, সেই ব্যক্তি, সমাজ ও প্রতিষ্ঠানই প্রকৃতির নিয়মে জীবনসংগ্রামে পুষ্টি ও বিকাশলাভের অধিকারী। কলেবরের আয়তন, আকার ও বিস্তৃতিই এই উপযোগিতালাভের একমাত্র অঙ্গ নহে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইয়া

স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইলে পারিপার্শ্বিকের অনুবর্ত্তন এবং জগতের বিবিধ ভাব ও শক্তিসমুচ্চয়ের ব্যবহার করিতে হইবে।

জীবনবিকাশের এই নিয়ম শিল্পজগতেও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। ইহার ফলে আমরা দেখিতে পাই, অনেক সময়ে ক্ষুদ্র কারবারই বৃহৎ অনুষ্ঠান অপেক্ষা প্রতিষ্ঠালাভ করিবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এমন অনেক অবস্থা আছে, যে স্থলে বিরাট আয়োজন করিলে লাভবান্ হইবার আশা অপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কাই বেশী। সেই অবস্থায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের স্থান কোনরূপেই বিনষ্ট হইতে পারে না। মানবের অভাব-বৈচিত্র্য এবং অভাবপূরণ করিবার ক্ষমতা, শ্রমবিভাগনীতির প্রবর্ত্তন, বস্তুর আদানপ্রদানের সুবিধা, রাষ্ট্রীয় সুব্যবস্থা প্রভৃতির উপরেই বৃহৎ অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব নির্ভর করে। কিন্তু এই সমুদয় সকল সমাজে সকল সময়েই থাকে না; সুতরাং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির প্রয়োগ করিয়া বৃহৎ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন সকল সময়েই উপস্থিত হয় না।

এতদ্ব্যতীত সুকুমার শিল্প, চিত্রকলা, রঞ্জনশিল্প প্রভৃতি এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যে সমুদয় যন্ত্রাদিপ্রয়োগে সুসম্পন্ন হইতেই পারে না। তাহাদের উৎকর্ষ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র শিল্প-নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এসকল স্থলেও ক্ষুদ্র ব্যবসায়-পদ্ধতিই বৃহত্তর অনুষ্ঠানগুলিকে পরাজিত করিয়া শিল্প-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

বৃহৎ কারবারের স্বাভাবিক অসম্পূর্ণতা

আবার, বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলির অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে; ইহাদের সাহায্যে অল্প সময়ে বহুদ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে বটে; কিন্তু এই সমুদয় দ্রব্য যথাস্থানে বিতরণ করিতে বহুকালব্যাপী বহুলোকের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। অধিকন্তু, কেবলমাত্র বৃহৎ কারবারের দ্বারাই মানবের সর্ব্ববিধ অভাব পূরণ হইতে পারে না। প্রত্যেক জনপদের মধ্যে

সামাজিক ও প্রাকৃতিক শক্তি ও সুযোগসমূহ এমন বিচিত্রভাবে পড়িয়া থাকে, যে সেইগুলিকে মানবের অভাবমোচনের জন্য প্রয়োগ করিতে হইলে বিবিধ পরস্পরসম্বদ্ধ, আনুষঙ্গিক অথবা সম্পূর্ণ স্বাধীন শিল্প ও ব্যবসায়ের আয়োজন করা অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিক কলকারখানার প্রসার যতই বৃদ্ধি পাউক না কেন, এবং শ্রম-বিভাগ-নীতি প্রয়োগ করিয়া বিরাট ব্যবসায়-পদ্ধতি যতই প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকুক না কেন, মানবের বিচিত্র অভাবমোচনের জন্য বিচিত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন কোন দিনই সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হইবে না।

কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ

আমাদিগকে শিল্প-জগতের এই নিয়মানুসারেই কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের মধ্যে যে অসংখ্য সুযোগ রহিয়াছে তাহারই যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করিয়া বিচিত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়-ও-শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। এইজন্য আমাদের শ্রমজীবিগণের কায়িক পরিশ্রম, ব্যবসায়িগণের উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি এবং মহাজনগণের ব্যবসায়-প্রযুক্ত মূলধন যে ভাবে পরিচালিত করিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফললাভ হইতে পারে আমাদিগকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১)
আমাদের শিল্পিকুল ও ব্যবসায়ী জাতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বিস্তার

প্রথমতঃ, দেখা যাউক আমরা কি উপায়ে আমাদের শ্রম-জীবিগণের পরিশ্রম সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালীতে পরিচালিত করিতে পারি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার অভাবে আমাদের সমাজে, বিশেষতঃ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে শিল্পনৈপুণ্য, উদ্ভাবনী শক্তি, কলা-চাতুর্য্য, এবং হস্ত বা চক্ষুরিন্দ্রিয়গত কৌশল একেবারেই জন্মিতে পায় না। এ অবস্থায় জাতিভেদের ফলে যাহারা পুরুষানুক্রমে কোন শিল্প বা

ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বংশগত নৈপুণ্যের অধিকারী হইয়া রহিয়াছে, আমাদের প্রাচীন সামাজিক ও বৈষয়িক সভ্যতার নিদর্শন সেই শিল্পী ও ব্যবসায়ী জাতির বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বভাব ও অভ্যাসের সাহায্য গ্রহণ না করিলে আমাদের আর সম্বল কোথায়? এই সুযোগগুলি ব্যবহার করিবার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে আমাদের শিল্পী ও ব্যবসায়ী জাতি নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, এবং উন্নত প্রক্রিয়া ও প্রণালীগুলি ক্রমশঃ আয়ত্ত করিয়া জাতিগত বিদ্যার পরিপুষ্টি ও উন্নতি সাধন করিতে পারে তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

নৈসগিক জাতীয় শিল্প-চাতুর্য্য ও ব্যবসায়-পাণ্ডিত্য

বাস্তবিকই কি আমাদের শিল্পিকুল এবং ব্যবসায়ী জাতির শিল্প ও ব্যবসায়-পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত নহে? যাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে আমাদের শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা উচ্চ অঙ্গের বুদ্ধি এবং বিবেচনাশক্তিরই পরিচয় প্রদান করিয়াছে; এবং এখনও বর্ত্তমান যুগের সর্ব্ববিধ বৈষয়িক অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা করিয়া স্বকীয় কার্য্যদক্ষতা ও শিল্পপটুত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমাদের শিক্ষার যতই অভাব থাকুক না কেন, আমাদের এখনও ভাবিবার প্রয়োজন নাই, যে আমাদের শিল্পী ও ব্যবসায়িগণের উন্নতি একেবারে অসম্ভব। বাস্তবিক পক্ষে, যাঁহারা প্রচার করিতে চেষ্টা করেন, যে ভারতবর্ষের শ্রমজীবিগণ যুগে যুগে একই অবস্থায় থাকিয়া একই জাতিগত নৈপুণ্যের অধিকারী হইয়া রহিয়াছে, এবং কখনও কোন বিষয়ে অবস্থোচিত নূতন ব্যবস্থা করিয়া উদ্ভাবনী শক্তি এবং পরিবর্ত্তনশীলতার পরিচয় প্রদান করে নাই, তাঁহারা বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যদি আমাদের শিল্পী ও ব্যবসায়ী জাতি একই অবস্থার নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়া জগতের নিত্যনব ভাব ও শক্তিপুঞ্জ

সম্বন্ধে একেবারে নিস্পন্দ ও উদাসীন হইয়া থাকিত, তাহা হইলে কি ভারতীয় চিত্রকলা, রঞ্জনশিল্প, হস্তনির্ম্মিত কারুকার্য্য এবং বিবিধ পরিবারবদ্ধ ব্যবসায়-প্রসূত বিলাসদ্রব্য বহুকাল ধরিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইত? কৃষিক্ষেত্রেও ভারতীয় কৃষকসম্প্রদায় আমেরিকাখণ্ডের আবিষ্কারকাল হইতে যে সকল নূতন নূতন উদ্ভিজ্জ পদার্থ এদেশের জল-বায়ু ও ভূমির উপযোগী করিয়া চাষ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহারই ফলে আমাদের আধুনিক কৃষিজাত-দ্রব্যের অর্দ্ধভাগেরও অধিক পাইয়া থাকি।

অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, আমাদের শিল্পিকুল স্বকীয় শিল্প ও ব্যবসায়েই নবাবিষ্কৃত যন্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াদি অবলম্বন করিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে। স্বকীয় জাতিগত ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অন্য কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইলে যেরূপ পরিবর্ত্তনসাধন ও নূতন পারিপার্শ্বিকের অনুবর্ত্তন করিতে হয় সেরূপ ক্ষমতা তাহাদের নাই।

যাহা হউক, এই জাতিগত শিল্প-ব্যবসায়ী ব্যতিরেকে বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের অন্য কোন গতি নাই। যাঁহারা আমাদের শিল্প ও বাণিজ্য পরিচালনা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে একথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। আমাদের শিল্পের অধ্যক্ষগণ এবং ব্যবসায়ের ধুরন্ধরেরা যেন একথা ভুলিয়া গিয়া কারখানাসমূহে সমাজস্থ যে কোন শ্রেণীর লোক নিযুক্ত না করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে মসীজীবী বাঙ্গালী সন্তানকে হঠাৎ বিচিত্র শিল্পী জাতিতে পরিণত করিবার চেষ্টায় বৈষয়িক জগতের এই সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করা হইয়াছে, ইহার ফলে বয়ন এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য যে কয়েকটী প্রয়াস হইয়াছে সমস্তগুলিই পণ্ডশ্রমে পরিণত হইয়া সমাজে ঘোরতর নৈরাশ্য ও অবসাদের সৃষ্টি করিয়াছে।

শিল্পিগণের বিদ্যা, বুদ্ধি ও নৈপুণ্যের উন্নতি বিধান করিবার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, কি উপায়ে আমাদের সমাজে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত পরিচালক এবং ব্যবসায়ের অধ্যক্ষ ও ধুরন্ধরের সৃষ্টি হইতে পারে। আধুনিক কালে পাশ্চাত্য জগতের ব্যবসায়ক্ষেত্রে ধুরন্ধর এবং অধ্যক্ষেরাই সমাজের বৈষয়িক জীবনের প্রকৃত নিয়ন্তা; মহাজনগণ এবং ধনিসম্প্রদায় নহে! ইহাঁরাই সমাজের প্রয়োজন ও অভাবানুসারে উপযুক্ত আয়োজন করিয়া বৈষয়িক সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধান করেন। ইহাঁদেরই ব্যবসায়বুদ্ধি, ধনবিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি, সর্ব্ববিধ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার শক্তি এবং কর্ম্মতৎপরতার প্রভাবে বিভিন্ন স্থান হইতে মহাজনগণ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমজীবীরা আকৃষ্ট হইয়া স্বকীয় শক্তিপ্রয়োগের ক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়েন। ইহাঁরাই সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া অন্নসংস্থানের নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবন এবং মূলধনপ্রয়োগের অভিনব কারবার আবিষ্কার করেন। ইহাঁদেরই চিন্তা ও কার্য্যপ্রণালী এবং ব্যবসায়-পাণ্ডিত্য ধনী মহাজনদিগের গন্তব্যপথ এবং কর্ম্মক্ষেত্র স্থির করিয়া দিয়া তাঁহাদের ভাগ্যগঠন করিয়া দেয়। ইহারই ফলে ধনী সম্প্রদায়ের মূলধন সর্ব্বত্র ধুরন্ধরের পরিচালনা-শক্তি এবং ব্যবসায়বুদ্ধি অনুসরণ করিয়া পরাধীনভাবে কার্য্য করে! বাস্তবিক পক্ষে কেবলমাত্র মূলধনের সাহায্যে মহাজনগণ কখনও নূতন শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি অথবা নূতন কারবার আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়েন না। ধনী সম্প্রদায় সাধারণতঃ গতানুগতিকভাবে কার্য্য করিয়া অভ্যস্ত কারবার এবং পুরাতন ব্যবসায়েই সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করেন। লাভবান্ হইবার নূতন নূতন ব্যবসায়ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া দিলে এই লাভজনক কারবারের প্রতি ধনবান্ মহাজনগণ আকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

(২) ধুরন্ধর ও পরিচালক সৃষ্টি

এইরূপ ধুরন্ধর আমাদের দেশে এখনও আবির্ভূত হয়েন নাই। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত আমরা এরূপ ব্যবসায়বুদ্ধিবিশিষ্ট কর্ম্মবীরের সাক্ষাৎ না পাই, ততদিন আমাদের শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতির পথ রুদ্ধ থাকিবে। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে অন্নসংস্থানের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার এবং অভিনব শিল্প ও ব্যবসায়ের উদ্ভাবন দ্বারা ধনী মহাজনগণের মূলধন আকৃষ্ট করিতে সমর্থ উপযুক্ত ধুরন্ধর ও পরিচালকের সৃষ্টি হয়।

আমাদের সমাজে এরূপ কর্ম্মবীর এবং ব্যবসায়ের ধুরন্ধর নাই কেন? ব্যবসায় এবং শিল্পশিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। আমাদের দেশে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহার ফলে শাসনকার্য্যনির্ব্বাহোপযোগী কেরাণী, হাকিম, উকিলের সৃষ্টি হইতে পারে মাত্র। শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রের ভার বহন করিবার সামর্থ্য, এবং নানা উপায়ে সমাজের বৈষয়িক উন্নতি বিধান করিবার ক্ষমতা বিকাশ করিতে হইলে আমাদের এমন শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, যাহাতে শিক্ষার্থিগণ প্রথমাবস্থায় সাধারণ সাহিত্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই উপযুক্ত বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষা করিতে পারে; এবং ক্রমশঃ কেবলমাত্র ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি ধনাগম সম্পর্কীয় বিদ্যা সমূহেই সমগ্র শক্তি ও সময় প্রয়োগ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। যতদিন পর্য্যন্ত শিক্ষা পদ্ধতির নিয়মে বৈজ্ঞানিক কলকারখানা, ভারতীয় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অবস্থা, এবং আমাদের সমাজের বিচিত্র অভাব পূরণ করিবার প্রথা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভের সুবিধা সহজেই উপস্থিত না হয়; এবং বিভিন্ন কারখানা পরিদর্শন, বিবিধ যন্ত্র ব্যবহার, বিচিত্র স্থানে পরিভ্রমণ ও প্রদর্শনী পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতির

(ক) এজন্য ছাত্রাবস্থায় প্রথম হইতেই শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার ব্যবস্থা প্রয়োজন

সাহায্যে সমাজের কার্য্যকারিণী বৃত্তিসমূহের উন্মেষ, হস্ত চক্ষুরিন্দ্রিয়াদির পরিচালন এবং বৈষয়িক জগতের বিবিধ ঘটনা পর্য্যালোচনার সুযোগ সৃষ্টি না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের সমাজে আবিষ্ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন, উদ্ভাবনী ক্ষমতাবান্ ধুরন্ধর ও কর্ম্মবীরের আবির্ভাব হইবে না।

(খ) অনুসন্ধান ও পরীক্ষা সমিতি গঠন

এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার সঙ্গে সঙ্গে, যাহাতে উপযুক্ত অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞদিগের তত্ত্বাবধানে আমাদের উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ দেশের বিবিধ কৃষিজাত দ্রব্যের এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক পদার্থের বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক পরীক্ষা এবং নূতন নূতন শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আলোচনা, অনুসন্ধান এবং গবেষণা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত যাহাতে কেবলমাত্র আদান প্রদান, বিতরণ, সরবরাহ, বাজারপরীক্ষা, অভাব ও প্রয়োজন অনুসন্ধান এবং আমদানি রপ্তানি প্রভৃতি প্রকৃত ব্যবসায় ও বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষালাভ হইতে পারে, সেইরূপ উচ্চঅঙ্গের ব্যবসায় শিক্ষারও আয়োজন করিতে হইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক, বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের মূলধন কোন্ প্রণালীতে প্রয়োগ করিলে আমরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফললাভ করিতে পারি।

(গ) ব্যক্তিগতভাবে মূলধনের প্রয়োগ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আমাদের ধনিসম্প্রদায় মূলধনের সমবায়সাধন করিয়া যৌথ-কারবার, সমবেত-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিতে অপারগ। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বকীয় ব্যবসায়-প্রযুক্ত ধন যে একীকৃত হইয়া জাতীয় মূলধন-ভাণ্ডারের আয়তন ও প্রভাব বৃদ্ধি করিতে পারিবে তাহার আশা অতি অল্প। বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা ইহার উপর নির্ভর করিতে পারি না; প্রত্যেক মহাজন ও ব্যবসায়ী ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষণের চেষ্টায় এবং লাভবান্

হইবার আশায় নিজ নিজ মূলধন প্রয়োগ করিতে উৎসাহী হইবেন, আমাদিগকে এইরূপ ভাবিয়াই কার্য্য করিতে হইবে।

যদি অল্প মূলধন লইয়াই শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিতে হয় তাহা হইলে যে সকল কারবারে শীঘ্র শীঘ্র ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় সেই সকল কারবারই অবলম্বন করিতে হইবে। এই মূলধন যাহাতে ব্যবসায়ে অনেক কাল আবদ্ধ না থাকে এবং যাহাতে ইহা বৎসরে বহুবার কার্য্য করিতে পারে তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে অল্পধনবিশিষ্ট মহাজনেরা কখনও লাভবান্ হইতে পারেন না।

স্বল্প মূলধন প্রয়োগের কৌশল

(ক) পুনঃপুনঃ ব্যবহার রীতি

একই মূলধনের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিলে যে ফললাভ হয় প্রচুর মূলধনের এককালীন ব্যবহারেও সেইরূপ ফললাভ হয়; কারণ ইহার ফলে মূলধন প্রকৃত প্রস্তাবে বহুগুণিত হইয়া যায়, সুতরাং প্রতিবারে অতি সামান্য লাভ রাখিলেও মোটের উপর বৎসরান্তে লাভের পরিমাণ অতি সন্তোষজনক হয়। অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, যে সকল ব্যবসায়ী এককালে প্রচুর পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিয়া বিক্রয় করেন, অথবা যাঁহারা তাঁহাদের কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া একই মূলধন বহুবার প্রয়োগ করিতে পারেন তাঁহারা প্রতি কারবারে শতকরা একটাকা হিসাবেও লাভ রাখিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কিন্তু অল্প মূলধন লইয়া কার্য্য করিতে হইলে ব্যবসায়ীকে অতি বিচক্ষণতার সহিত অগ্রসর হইতে হয়। যে সমুদয় জিনিষের কাট্‌তি খুব বেশী এবং যাহার অভাব হইলে সমাজের বাস্তবিক কষ্ট হইবে, সুতরাং সামান্য কারণে যে সমুদয় প্রয়োজনের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, গভীর ভাবে অনুসন্ধান করিয়া কেবলমাত্র সেই সমস্ত জিনিষই প্রস্তুত ও

(খ) সার্ব্বজনীন অভাব-মোচনোপযোগী দ্রব্য যোগান

সরবরাহ করিবার আয়োজন করিতে হইবে। দ্রব্য সমূহের বিশিষ্ট উৎকর্ষ বিধানের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তাহাদের অভাব মোচনোপযোগিতা এবং মূল্যের অল্পতার প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে। যাহাতে ব্যবসায়ী অল্প মূল্যে বহু জিনিষ বিক্রয় এবং সমাজের প্রধানতম সার্ব্বজনীন অভাব-গুলি পূরণ করিতে পারেন কেবলমাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে তাঁহার মূলধন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

(গ) ব্যবসা ও বাণিজ্য

আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলধনগুলি বর্দ্ধিত করিবার আর একটি উপায় আছে। বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের দ্বারা এই কার্য্য সুসাধিত হইয়া থাকে; কোনও দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণ না করিয়াও কেবলমাত্র বিবিধ উৎপন্ন দ্রব্যের আমদানি রপ্তানি, এবং বিবিধ সমাজের প্রয়োজনানুসারে স্থান হইতে স্থানান্তরে তাহা প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট ধনাগম হইতে পারে। আর বাস্তবিক, এইরূপ ব্যবসায়প্রথা অবলম্বন না করিলে ধনভাণ্ডার কখনও পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে পারে না। শিল্পপ্রতিষ্ঠার দ্বারা প্রয়োজনো-পযোগী দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া যে পরিমাণ লাভের আশা থাকে, কেবলমাত্র সরবরাহ ও কাট্‌তির অনুরূপ যোগানের আয়োজন করিয়াই তদপেক্ষা অধিক লাভ হইয়া থাকে। ইহার ফলে দ্রব্যউৎপাদনকারী শিল্পিগণের লভ্যাংশ হইতে নিজ পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া এইরূপ ব্যবসায়ী এবং যোগানদারেরা প্রচুর ধনলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। ব্যবসায়ের ফলে মূলধন এইরূপে সংগৃহীত হইলে পর, বৃহৎ বৈষয়িক অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইতে পারে।

উপসংহার

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া বৈষয়িক উন্নতি বিধানের যে কয়টি নিয়ম ও প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হইলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে হইবে। এই জন্য দুই প্রকার বৈষয়িক প্রতিষ্ঠান গঠন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, অল্পায়তন কারখানার ব্যবস্থা; দ্বিতীয়তঃ, কোন রূপ কারখানা প্রতিষ্ঠা না করিয়া গৃহে গৃহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের দায়িত্ব প্রদান এবং এই উপায়ে পরিবারবদ্ধ ব্যবসায়ের ব্যবস্থা।

এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষদ্র ব্যবসায়গুলিতে ত্রিবিধ কার্য্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, হস্তনির্ম্মিত কার্য্য; দ্বিতীয়তঃ যন্ত্রাদি ব্যবহৃত দ্রব্য; তৃতীয়তঃ রাসায়নিক প্রণালী অবলম্বিত শিল্প।

এই সমুদয় কার্য্যের জন্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে হইবে। প্রথমতঃ; জাতিগত নৈপুণ্যবিশিষ্ট কারিগরদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানার ভিতর সমবেত করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, মানবচালিত কল-অথবা বাষ্প-নিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এঞ্জীনের সাহায্যে উন্নত যন্ত্রাদি প্রয়োজন মত ব্যবহার করিতে হইবে; তৃতীয়তঃ, উদ্ভিজ্জ, ও খনিজ উপকরণ গুলির রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া উন্নত শিল্পের আয়োজন করিতে হইবে। চতুর্থতঃ, উৎকৃষ্ট কৃষিজাত দ্রব্যের ও অন্যান্য প্রাকৃতিক পদার্থের ব্যবহার করিতে হইবে। এই জন্য বিজ্ঞানসিদ্ধ কৃষিবিদ্যাবিশিষ্ট তত্ত্বাবধায়কগণের অধীনে কৃষকদিগকে কার্য্য করাইয়া ভূমির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে।

নিম্নে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে, বর্ত্তমান অবস্থায় এইগুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে—

১—বিভিন্ন ধাতুর মিশ্রণ—তৈজস পত্র নির্ম্মাণ, তার প্রস্তুতকরণ, বোতাম, ঘণ্টা ও অলঙ্কার গঠন, সোনা বা রূপার ছাঁচ প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি।

২—বিভিন্ন রকমের কালী প্রস্তুত করণ, জুতার কালী, ঘোড়ার সাজের কালী, ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যের উপর ব্যবহারের কালী, নিয়ুবিয়ন কালী, ছাতার কালী, ইত্যাদি।

৩—বারনীস ও মসৃণ করিবার বিভিন্ন দ্রব্য—ঘোড়ার সাজ, কাঁসা, পিতল, কাঁচের জিনিষ, দস্তার কাজ, ছুরি, কাঁচি, পাথর পালীশ, হাড় ও সিংএর কাজ, কাঠের কাজ।

৪—জল হইতে রক্ষা করিবার পদার্থ—চামড়ার কাজ রক্ষা, কাপড়ের জিনিষ, কাগজ রক্ষা করিবার উপায়, অয়েলক্লথ, ছাতার কাপড়, ইত্যাদি।

৫—পরিষ্কার করিবার জিনিষ—তেল ও চর্ব্বী, তুলা ও রেশমের কাপড় ধোয়া, রং পরিষ্কার করা।

৬—পিতল—রং করণ, পালীশ করণ, জল ও বায়ু হইতে রক্ষাকরণ।

৭—সংযুক্ত করিবার বিভিন্ন দ্রব্য—কাঠের কার্য্য যোড়া লাগাইবার আঠা, স্বর্ণকার ও কর্ম্মকারের কার্য্য-উপযোগী সংযোজন দ্রব্য, সিমেণ্ট।

৮—বিভিন্ন দ্রব্য পরিষ্কার ও রক্ষা করিরার উপায়—অয়েলক্লথ পরিষ্কার করণ, দড়ি রক্ষা করণ, ছবি বাঁধাইবার কাঠ রক্ষা করণ, চিত্র পরিষ্কার করণ, দাগ নিবারণ, জুতা, কাঁচ, রেশমের জিনিষ, সোণা, রূপা ও কাঠের কাজ প্রভৃতি পরিষ্কার করণ।

৯—বিভিন্ন সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করণ, দুর্গন্ধ নিবারণ।

১০—এনামেলের কাজ, গিল্টি করণ, তড়িৎ শক্তি ব্যবহার করিয়া অন্যান্য ধাতু লাগান।

১১—ফল ও ফুল প্রভৃতি হইতে নির্য্যাস প্রস্তুত করণ, সুগন্ধি, খাদ্য, সরবৎ, প্রভৃতি প্রস্তুত করণ।

১২—ফল, ফুল, দুগ্ধ, মাছ, মাংস চামড়া, পালখ্, লোম প্রভৃতির রক্ষা করণ।

১৩—উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে—দড়ি প্রস্তুত করণ।

১৪—বাঁশের কাজ, বেতের কাজ, মাদুর, আসবাব, প্রভৃতি প্রস্তুত করণ।

১৫—মোজা, গেঞ্জী, টুপী, প্রভৃতি।

১৬—পুস্তক শেলাই, বাঁধাই।

নিম্নে কতকগুলি সস্তা যন্ত্রের নাম করা যাইতেছে—এইগুলি হাতে চালান যাইতে পারে, অথবা ছোট ছোট এঞ্জীনের সাহায্যে চলিতে পারে।

১—মোমবাতীর পলিতা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

২—বিভিন্ন রকমের ফিতা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

৩—মোমবাতী প্রস্তুত করিবার ছাঁচ।

৪—বিভিন্ন আকারের খাম বা এন্‌ভেলাপ প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

৫—মোটা কাগজের বাক্স প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

৬—জুতার ফিতা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

৭—ঝিণুকের বোতাম করিবার যন্ত্র।

৮—ছোট টিনের কৌটা তৈয়ারী করিবার ছাঁচ ও যন্ত্র।

পূর্ব্বে পরিবারবদ্ধ গৃহগত শিল্পের কথা বলা হইয়াছে। এই জন্য উপযুক্ত স্থান বাছিয়া লইতে হইবে। আমাদের দেশের কৃষিজীবীরা কার্য্যাভাবে অনেক সময় বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। সেই সময় তাহাদিগের দ্বারা অল্পশ্রম এবং অল্পকালসাধ্য অনেক কাজ করাইয়া লওয়া যাইতে পারে। কাদা মাটীর কাজ, খেলনা তৈয়ারী, বেত ও বাঁশের কাজ, মাদুর, দড়ি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র-ব্যবহৃত শিল্প প্রভৃতি বিচিত্র কার্য্য এই সুযোগে তাহারা অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে। মহাজন এবং ধুরন্ধরেরা একবার এদিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের শ্রমজীবিগণের উদ্বৃত্ত

সময় প্রয়োজনীয় কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া, সমাজের বৈষয়িক উন্নতি বিধানের বিশেষ সহায়তা করিতে পারে।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারবদ্ধ ব্যবসায় ব্যতিরেকে বর্ত্তমান অবস্থায়ই কতকগুলি বৃহৎ কারবারের প্রতিও আমাদের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। অবশ্য এ সকল কাজের কয়েকটী অংশ মাত্রই আমরা অবলম্বন করিতে সমর্থ। লোহার কাজের মধ্যে বিশেষ উৎকর্ষবিশিষ্ট শিল্পের জন্য চেষ্টা না করিয়া যদি সাধারণ প্রয়োজনোপযোগী ছুরি, কাঁচি, পেরেক, কব্জা, বালতি, ছাঁচ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হই; কাচের কার্য্যের মধ্যে সামান্য রকমের শিশি বোতল অথবা মেরামতী কাজ প্রভৃতি গ্রহণ করি; বয়নকার্য্যের মধ্যে যদি উন্নত হাতের তাঁত, সুতা প্রস্তুত করণ প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগী হই; অথবা রঞ্জনকার্য্যের মধ্যে ছিট্ রংকরা, সাধারণ কাপড়ে রং লাগান, দেশীয় রং প্রস্তুত করণ, অথবা বিচিত্র মৃত্তিকা ব্যবহার করিয়া সোডা, ক্ষার প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলেও আমাদের অনেক অভাবই স্বদেশীয় শিল্প এবং ব্যবসায়ের সাহায্যে পূরণ হইতে পারে; এবং বহু শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের পন্থা উন্মুক্ত হয়।

যে কয়টী সুযোগ ও পন্থার কথা উল্লিখিত হইল, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তদ্ব্যতীত আরও অনেক স্বাধীন অন্নসংস্থানের উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে। এইরূপ কতকগুলি পন্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য কতিপয় উপযুক্ত শিল্প-ও-বিজ্ঞানবিৎ-কর্ম্মী নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহারা দেশের বিভিন্নস্থানে ভ্রমণ করিয়া বিচিত্র সুযোগগুলির সহিত পরিচিত হইবেন; এবং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সামান্য ধনশক্তি ও অশিক্ষিত পটুত্বের উপরেই নির্ভর করিয়া, অথবা সামান্য

শিল্প ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রচারক সৃষ্টির আবশ্যকতা

রকমের শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার সাহায্যে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির প্রয়োগে কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনা করিবেন। এইরূপ অনুসন্ধান, আলোচনা ও পরীক্ষা কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য কোন্ মহাত্মা অগ্রসর হইবেন—তাহারই জন্য আমাদের সমাজ উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্যসেবী*

মালদহেও একটা সম্মিলন হইয়া গেল। এইরূপে শিল্পে, সাহিত্যে ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদগুলি সুবিস্তৃত সমাজের সমগ্রতা ও ঐক্যের উপলব্ধি করিতেছে। ইহাতে প্রাচীন পল্লীগত জীবনের পরিবর্ত্তে অভিনব জাতীয় জীবনের বিকাশ হইতেছে।

আধুনিক ভারতে ইউরোপের দান
(১)
একরাষ্ট্রীয়তা

আমরা ক্রমশঃ এই যে বিচিত্র ঐক্যের সন্ধান পাইতেছি, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে একেবারে নূতন জিনিষ। ধর্ম্মে, সমাজে, আচার-ব্যবহারে আমাদের অনৈক্য ও বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্যের কোন দিনই অভাব ছিল না। কিন্তু পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষার প্রভাবে আমরা ক্রমশঃ যে অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি, তাহা রাষ্ট্রীয় জীবনের ঐক্য—একরাষ্ট্রীয়তা।

ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা আমাদের স্বকীয় সভ্যতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। ইংরাজজাতি আমাদের ভারতবর্ষ গঠন করিয়াছেন—সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ভারতবাসীর স্থান খুঁজিয়া লইবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপীয়েরা যখন ব্যবসায়নীতির বশবর্ত্তী হইয়া ভারতবর্ষে আগমনের পথ আবিষ্কার করে, তখন তাহাদের এই কার্য্য একটী ভৌগোলিক আবিষ্ক্রিয়ামাত্ররূপে বিবেচিত হইত। তাহার পর সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ-রাজ্য লইয়া ইউরোপে রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব

---

* উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনের মালদহ অধিবেশনে পঠিত, পৌষ ১৩১৭।

উপস্থিত হয়, তাহাতে ভারতবর্ষ আসিয়া ক্রমশঃ ইউরোপীয় জীবন-সংগ্রামের আবর্ত্তে পতিত হইল। তাহার ফলে এক বিচিত্র রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার সংঘটন——ইংলণ্ডের ভারতসাম্রাজ্য ও ভারতবাসীর অধীনতা।

(২)
জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠা

ঐতিহাসিক ভাবে আলোচনা করিলে, এই অধীনতাই সম্পূর্ণরূপে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার বিষয়। কারণ এই রূপে পরের বশে থাকিয়াই ভারতবর্ষ নিজের আত্মাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছে। আজ দেখিতে পাইতেছি সুদূর অতীতের আকস্মিক এক ভৌগোলিক আবিষ্করণ মানবসমাজের এক বিচিত্র জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার সূচনামাত্র।

গভীর ভাবে এবং দূরদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমাদের সমাজে কোন অনিষ্টই সাধিত হয় নাই। বরং যাহা কিছু আজকাল আমরা আমাদের অভিনব জাতীয়তার গৌরবের সামগ্রী, আমাদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির বিষয় বিবেচনা করি সমস্তই আমরা ইউ-রোপের সহিত সংঘর্ষণে লাভ করিয়াছি।

(৩)
চিন্তা ও কর্ম্মের বিবিধ কেন্দ্রগঠন

ইংরাজী শিক্ষা আমাদের দেশে যে উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকুক এবং আমাদের সমাজ পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রথমে যেরূপ ভাবেই গ্রহণ করুক না কেন,—যখন হইতে আমরা একটুকু স্বাধীনতার সহিত বিজ্ঞান, স্বায়ত্তশাসন, রাষ্ট্রীয় ঐক্য প্রভৃতি বিষয়ক বিদেশীয় ভাবগুলিকে স্বকীয় জাতীয় বিশেষত্বের অঙ্গীভূত করিতে কিয়ৎ পরিমাণে উপ-যুক্ত হইয়াছি, তখন হইতেই আমাদের বিচিত্র সমাজ সকল বিষয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। আমরা একে একে স্বাধীন ভাবে জাতীয় মহাসমিতি, কংগ্রেস, সাহিত্যপরিষৎ, শিক্ষাপরিষৎ, বিজ্ঞানপরিষৎ,

বিদেশপ্রেরণ-পরিষৎ' প্রভৃতি বিচিত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে উপযোগিতা লাভ করিয়াছি। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম আমাদের চিন্তা ও কর্ম্মের আন্দোলনে তরঙ্গায়িত হইতেছে। সকল দিকে আমাদের স্বতন্ত্র জীবনীশক্তি বিকাশ লাভ করিতেছে।

(৪)
ভাবুকতা

এমন, কি সম্প্রতি আমাদের সমাজে, ত্যাগ, বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, পরোপকার, লোকহিত, মানবসেবা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সত্যগুলিকে জীবনে উপলব্ধি করিবার যে সকল প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তাহাও প্রকৃত প্রস্তাবে পাশ্চাত্য-শিক্ষাপ্রসূত। আমাদের প্রাচীন উপনিষদ্ ও বেদান্তের উপদেশ আমরা নূতনভাবে ইউরোপের নিকট প্রাপ্ত হইয়া গীতা-প্রচারে, দর্শনালোচনায় এবং নিষ্কাম কর্ম্মে জীবন উৎসর্গীকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের আধুনিক সন্ন্যাসী ও কর্ম্মযোগিগণ গেটে, কার্লাইল, এমার্সন, রাস্কিন্, টলষ্টয় প্রভৃতি ইউরোপীয় ঋষিগণের শিষ্য।

ফরাসীবিপ্লবের সময় হইতে ইউরোপ নানা কারণে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের পরে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনচিন্তা, ব্যক্তিত্ববিকাশ, আত্মার পরিপূর্ণতা, নিম্নজাতির অধিকার, ডিমক্রেসি, সোশ্যালিজ্‌ম্ প্রভৃতি সম্যক্ অবধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার ফলে ইউরোপের সাহিত্যক্ষেত্রে, ব্যবসায়ে, ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবনে যে ব্যাপক ও সর্ব্বতোমুখী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার প্রভাবে সমাজে ভাবুকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং অতিপ্রাকৃত ও অতিমানবীয় ভাব প্রবিষ্ট হইয়া ইউরোপে এক "অফ্‌ক্লেরাঙ্গ" বা নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। ইউরোপের এই "রোমান্টিক্" আধ্যাত্মিক বিপ্লবই আমাদের আধুনিক বৈদান্তিক আন্দোলনের মূল প্রস্রবণ।

ভারতবর্ষ ইউরোপের নিকট ঋণী—এ কথা স্বীকার করিলে ভারতবর্ষের কোন গৌরবহানির আশঙ্কা নাই। মানবজাতির সভ্যতা এইরূপ পরস্পর আদান-প্রদানেই পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে কতকগুলি সত্য আবিষ্কার করিয়া মানবের সভ্যতা-ভাণ্ডারে দান করিয়াছিল। আজকাল কতকগুলি নূতন সত্যের উপহার লইয়া আধুনিক ইউরোপ মানবজাতির দ্বারে দণ্ডায়মান। মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, গ্রীক প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচীন সমাজ নিজ নিজ দাতব্য দান করিতে করিতেই অতীতের গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। তাহারা স্বতন্ত্র উপায়ে এই আধুনিক সভ্যতা গ্রহণ করিয়া নূতন সত্য দান করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারত এক বিচিত্র অমরতা লাভ করিয়া আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আধুনিক সত্যগুলিকে নিজ বিশেষত্বের দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়া মানবজাতির ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত করিবার আয়োজন করিতেছে। আধুনিক গ্রীস, আধুনিক মিশর প্রাচীন জীবনের কোন সাক্ষ্যই বহন করে না, কিন্তু আধুনিক ভারত ইউরোপীয় জলে ধৌত হইয়াও প্রাচীনের পারম্পর্য্য রক্ষা করিতেছে। ভারতবর্ষই যথার্থ ভাবে প্রাচীন ও নবীন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনস্থল। এই সঙ্গমক্ষেত্রে যে অপূর্ব্ব সমন্বয়ের সংঘটন হইতেছে, তাহা কেবলমাত্র ইউরোপেরই অভিনয় বা প্রাচীন ভারতবর্ষেরই পুনরাবৃত্তি নহে, ইহা নূতন মূর্ত্তিতে ভারতবর্ষের অভিনব শক্তির প্রকাশ—নবযুগোপযোগী নবরূপপরিগ্রহ।

নব্য ভারতের চিত্র

নব-শক্তি

আমাদের সমাজ যে জীবনীশক্তি হারাইয়া বিশ্বসভ্যতার এক অতি নিম্নস্তর-প্রোথিত অস্থিকঙ্কালের ন্যায় নিস্পন্দ ও অসার হইয়া পড়িয়া নাই, তাহার প্রধান পরিচয় এই যে, নূতন পারিপার্শ্বিকের অনুবর্ত্তন এবং

নূতন নূতন সুযোগসমূহ ব্যবহার করিতে যাইয়াও আমাদের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হয় নাই। আমরা বেষ্টনীকে নিজের স্বতন্ত্র পুষ্টিসাধনের উপযোগি-রূপে ব্যবহার করিতে সমর্থ হইতেছি; ইহার ফলে আমরা যে এক নূতন জীবনে পদার্পণ করিতেছি তাহার অভিব্যক্তিস্বরূপ এক অভিনব সাহিত্যের গঠন আরম্ভ হইয়াছে। যে ভাষাসম্পদের অধিকারী হইয়া মানব স্বকীয় বিশেষত্বের উপলব্ধি করে, এবং যে সাহিত্যশক্তির প্রভাবে মানবের জাতিগত বৈষম্য পরিপুষ্ট হয়, যে ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের ফলে আধুনিক ইউরোপের বিভিন্ন জাতিসকল মধ্যযুগে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে-ছিল, যাহার বিক্ষোভে আন্দোলিত হইয়া ফ্রান্সের রাষ্ট্র বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং যাহার ঐশ্বর্য্য ত্রিধাবিভক্ত গতপ্রাণ পোলাণ্ড প্রদেশেরও অধিবাসিবৃন্দকে আলোকিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে, আমরা নূতন ভাব ও কর্ম্মশক্তিসমূহের সংস্পর্শে আসিয়া জীবন্ত জাতির বিশেষ লক্ষণ সেই ভাষাসম্পদ ও সাহিত্য-ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছি। আমা-দের নূতন স্বভাব, নূতন জীবন, নূতন আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিবার শক্তি ছিল বলিয়া আমাদের ভাষা ক্রমশঃ বৈচিত্র্য লাভ করিতেছে এবং সাহিত্যভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইতেছে।

স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় ভাষা ও সাহিত্য

প্রকৃত জীবন্ত জাতির লক্ষণ এই যে, উহার বিকাশ স্বকীয় ইতিহাস-গত বিশেষত্ব এবং চরিত্রস্বাতন্ত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের অভ্যন্তরে প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র স্বভাব এবং নৈসর্গিক চরিত্রই পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ জন্য প্রকৃতিগত ভাষার অস্তিত্ব ও ক্রমিক বিকাশই জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তির পরিচয়। যে স্থলে স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্ব নাই সেই স্থলে জাতীয় জীবনেরও অস্তিত্ব নাই বুঝিতে হইবে।

সাহিত্য ও জাতীয় জীবন

এই জন্যই আধুনিক জগতের সর্ব্বত্র শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে প্রকৃতিগত স্বাভাবিক ভাষার স্থান অতি উচ্চ। সকল দেশেই জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থায় জাতীয় সভ্যতার বিবিধ অঙ্গের সহিত সুপরিচিত হইবার সুযোগ আছে, এবং উচ্চতম শিক্ষার আয়োজনেও জাতীয় ভাষা ব্যবহারের বিধান আছে। জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার মূল উপাদান।

সুতরাং যাঁহারা এ দেশের নূতন পারিপার্শ্বিকের অনুরূপ নূতন শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন এবং সমগ্র সমাজকে স্বাভাবিক রূপে আধুনিক জগতের সকল প্রকার সমস্যা-মীমাংসার উপযোগিতা প্রদান করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে একদিকে যেমন বিজ্ঞান, শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া আধুনিক উপায়ে জাতীয় অভাব মোচনের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তেমনি অপর দিকে নিম্নশ্রেণীর এবং নৈশবিদ্যালয়ের শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বোচ্চ বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের শিক্ষা পর্য্যন্ত সকল স্তরেই জাতীয় ভাষা ব্যবহারের আয়োজন করিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের বিদ্যালয়সমূহের সকল পর্য্যায়ে মাতৃভাষা প্রচলিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত শিক্ষাপদ্ধতি প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে না। জাতীয় বিদ্যালয়ের উন্নতি জাতীয় সাহিত্যের বিকাশের উপর নির্ভর করিতেছে। কেবল মাত্র গৃহপ্রতিষ্ঠা বা নূতন পরিষদ্‌গঠন করিলেই জাতীয় শিক্ষা দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে না। যাঁহারা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই যথার্থভাবে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন। যে সকল সাহিত্যসেবী ও শিক্ষাপ্রচারক আমাদের সাহিত্যকে নানা উপায়ে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে ভবিষ্যৎ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রদূত।

জাতীয় শিক্ষায় জাতীয় সাহিত্যের স্থান

আমাদের সাহিত্য এখনও অতি নগণ্য শৈশবাবস্থায় রহিয়াছে। অত্যল্পকালের মধ্যেই আমাদের ভাষা বিচিত্র ভাবপ্রকাশক হইয়া উঠিয়াছে বটে; কিন্তু এখনও আমাদের সাহিত্য উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে নাই। এই জন্য আমাদের মাতৃভাষা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাপদ্ধতির ব্যবস্থায় দ্বিতীয় ভাষার মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র, প্রধান ভাষার গৌরবের অধিকারী হয় নাই; এবং এই জন্যই "জাতীয় শিক্ষাপরিষদের" সঙ্কল্প ও চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া কেবল মাত্র আকাঙ্ক্ষাতেই পর্য্যবসিত রহিয়াছে।

বাঙ্গলা সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা

কাব্য, উপন্যাস ও কথাসাহিত্য পরিত্যাগ করিলে সাহিত্যপদবাচ্য রচনা অতি অল্পই আমাদের ভাণ্ডারে পড়িয়া থাকে। ইতিবৃত্তের অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। তুলনামূলক ঐতিহাসিক আলোচনা-প্রণালী কাহাকে বলে আমাদের জাতীয় সাহিত্যে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সমালোচনা-বিজ্ঞানের সূত্রপাতই হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সম্প্রতি মাসিক সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, এবং বিদেশীয় সাহিত্য হইতে কাব্যাদির অনুবাদ মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হয়। আমরা সাধারণতঃ দার্শনিক জাতি বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকি, কিন্তু উচ্চ অঙ্গের দর্শনচর্চ্চা আমাদের সাহিত্যে অতি সামান্য স্থানই অধিকার করিয়াছে। যে সকল দেশের শিক্ষাপদ্ধতিতে জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য মুখ্য স্থান অধিকার করে, তাহাদের সহিত তুলনা করিলে আমাদের সাহিত্যের দারিদ্র্য ও অপ্রাচুর্য্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু চারিদিকে আশার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। লোকশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষার গণ্ডিবিস্তারের প্রতি কর্ম্মীদিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সাহিত্যচর্চ্চায়, ইতিহাসের তথ্য

সঙ্কলনে, পুরাকাহিনীসংগ্রহে, ধনীনির্ধন, বিদ্বান্‌মূর্খ, সকলেই আগ্রহান্বিত হইতেছেন। পাঠকসমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সাধারণের মধ্যে জ্ঞানপিপাসার উদ্রেক হইয়াছে। আমরা এক বিরাট্ সাহিত্যবিপ্লব ও চিন্তার আন্দোলনের পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাইতেছি।

অনতিদূর ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় সাহিত্য পল্লবিত হইয়া আমাদের সমাজে যে বিচিত্র ফলদান করিবে, তাহাতে সহায়তা করিবার জন্য বর্ত্তমানে সকল সাহিত্যিকের একটীমাত্র কর্ত্তব্য রহিয়াছে। তাঁহাদিগকে এখন ভাবিতে হইবে—**কি উপায়ে এবং কত দিনে আমাদের সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি গভীর শিক্ষণীয় বিষয়সমূহে ফরাসী, জার্ম্মান, ও ইংরাজী সাহিত্যের স্থান অধিকার করিতে পারিবে।** যাহাতে আমাদের সাহিত্যসেবা এখন হইতে এই একমাত্র লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত হইতে পারে, সাহিত্যিকগণের সাধনা ও আদর্শ সেইরূপ নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

বাঙ্গলাসাহিত্যের লক্ষ্য

কিন্তু সাহিত্য এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে গড়িয়া তুলিতে পারা যায় কি না, এই বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। অনেকে মনে করিতে পারেন ভাষা ও সাহিত্য নৈসর্গিক পদার্থ—ইহাদের বিকাশ বৃক্ষলতাদি প্রাকৃতিক পদার্থের বিকাশের অনুরূপ, মানুষের ইচ্ছাধীন নহে। ইহারা স্বাভাবিক ভাবে স্বতই সৃষ্ট হইয়া থাকে।

সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি ব্যাপারে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন

বাস্তবিক পক্ষে, ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সামাজিক রীতি, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি মানবীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশ মানবের চরিত্রের বিকাশের উপর

নির্ভর করে। মানবের সাধারণ সভ্যতা অতিক্রম করিয়া এই সমুদয় বিষয় উৎকর্ষলাভ করিতে পারে না। উন্নত ধর্ম্ম, রাষ্ট্র অথবা সামাজিক ব্যবস্থার উপযোগী হইতে হইলে মানবকে স্বয়ং উন্নত হইতে হইবে। জাতীয় জীবনের সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়াই এই সমুদয় বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে হয়। স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীন চিন্তা, অবাধ বাণিজ্য, মূর্ত্তি-পূজা, নিরাকার-আরাধনা প্রভৃতি বিষয়ক বিধিনিষেধ ইতিহাসগত জাতীয় চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছি যে চেষ্টা করিয়া, সাধনা করিয়া অভাব সৃষ্টি করিয়া দেওয়া যায়। কি প্রাকৃতিক, কি আধ্যাত্মিক, কি সাংসারিক, কি রাষ্ট্রীয় সকল জগতেই আয়োজন-প্রয়োজনের এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। উৎকট ভাবে প্রয়োজন বোধ করিলেই, এবং এই প্রয়োজন অধ্যবসায়ের সহিত সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রচারিত করিতে পারিলেই, আকাঙ্ক্ষা সকল শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া জাতীয় ও সমাজগত হইয়া পড়ে। অভাবের কথা ভাবিতে ভাবিতেই অভাবের সৃষ্টি হয়। এই উপায়ে অনেক উন্নত জাতি অবনত হইয়াছে এবং অর্দ্ধ-শিক্ষিত ও অসভ্যজাতি সভ্যজাতির প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করিবার উপযোগিতা লাভ করিয়াছে। যে ব্যক্তি অথবা যে সমাজকে কোন রাষ্ট্রীয়, শিল্প অথবা ধর্ম্মবিষয়ক ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বিবেচনা করিতেছি, অত্যল্পকালের মধ্যেই তাহার হৃদয়ে এই বিষয়ে বাসনা জাগরিত ও বদ্ধমূল হইয়া তাহাকে ইহার অধিকারী করিয়া তুলিতে পারে। আবার যে ব্যক্তি অথবা যে জাতি উন্নত, বিদ্যাবান্, শিল্পনিপুণ ও ধর্ম্মভীরু, অল্প কালের মধ্যেই বিচিত্র ঘটনাচক্রের মধ্যে পতিত হইয়া একেবারে অধঃপতিত ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িতে পারে। জগতের ইতিহাসে শিল্পবাণিজ্যের বিনাশ ও বিকাশসাধন, ধর্ম্মের লোপ ও প্রচার, রাষ্ট্রীয় উন্নতি ও অবনতি এবং

সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও অধোগতির বিবরণে এইরূপ সচেষ্ট অভাবসৃষ্টি ও বশীকরণনীতির যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রকৃত কথা এই যে—মানব অনুকূল চেষ্টার দ্বারা উন্নত হইতে পারে এবং প্রতিকূল শক্তির প্রভাবে অবনত হইতে পারে। স্পেনের শিল্প-বাণিজ্য এইরূপেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের বৈষয়িক অবস্থার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার শিল্প ও ব্যবসায় সংরক্ষণশীল ও স্ব-সমাজের উন্নতিকামী নরপতি এবং কর্ম্মীদিগের প্রয়াসেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। রোমীয় সম্রাটেরা এইরূপ সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করিয়াই রোমনগরীকে অতি অজ্ঞ অবস্থা হইতে বিদ্যার রাজধানীর পদে উন্নীত করিয়াছিলেন এবং সাম্রাজ্যনীতি অবলম্বন করিয়া প্রাচীন গ্রীসের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে হতবীর্য্য ও লুপ্তকীর্ত্তি করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ড্রিয়ার সর্ব্ববিধ সমৃদ্ধি এই রূপ প্রয়াসেই সাধিত হইয়াছিল। রুশিয়ার শিল্পবাণিজ্য এবং শিক্ষাবিস্তার এইরূপ অভাব-সৃষ্টিকরণনীতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক ধর্ম্মের অভ্যন্তর হইতে কালে কালে কুসংস্কার ও আবর্জ্জনাবর্জ্জনের যত আন্দোলন হইয়াছে, সকলগুলিই এইরূপ নূতন আকাঙ্ক্ষা ও নূতন অভাব সৃষ্টির ফল। এইরূপ প্রচারের প্রভাবেই সভ্যজগৎ হইতে দাসত্বপ্রথা দূরীভূত হইয়াছে। উন্নত রাষ্ট্রের লক্ষণগুলি স্বীয়সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই প্রুসিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমাজে উন্নত স্থান লাভ করিয়াছে। ধর্ম্মপ্রচারক এবং সমাজ-সংস্কারকেরা স্বকীয় আদর্শগুলি বিভিন্ন সমাজে বিস্তার করিতে যাইয়া অনেক নিরক্ষর, অর্দ্ধসভ্য এবং কুশিক্ষিত জাতিকে সুসভ্য, সুশিক্ষিত এবং সাহিত্যবান্ করিয়া তুলিয়াছেন।

সংরক্ষণ-নীতির দৃষ্টান্ত

ভাষা ভাবপ্রকাশের উপায়মাত্র। যত উপায়ে এবং যে যে প্রণালীতে মানব আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিতে পারে, সেই সমুদয় উপায় ও প্রণালীর সম্যক্ ব্যবহার করিলেই ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মনোভাব ব্যক্ত করিবার প্রণালীর বৈচিত্র্যে ভাষার বৈচিত্র্য। আবার, ভাবই সাহিত্যের প্রাণ। যত উপায়ে মানবের ধারণা ও চিন্তার গণ্ডি বিস্তৃত ও গভীর হয়, যে উপায় অবলম্বন করিলে ভাবনার বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়, যাহাতে মানবচিত্ত বিবিধ আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার ক্ষেত্র হয়, সেই সকল উপায়েই সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও জটিলতা সৃষ্টি হয়, সাহিত্য-সম্পদ্ বৃদ্ধি পায়।

সাহিত্য-পরিপুষ্টির উপায়

মানবের কর্ম্মক্ষেত্রই সকল প্রকার ভাব ও ধারণার কারণ। জীবনের বৈচিত্র্যে ও গভীরতায়ই চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্য জন্মে। সুতরাং ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশ্বর্য্যশালী করিতে হইলে, বিবিধ উপায়ে প্রকৃত জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রকে বিচিত্র সমস্যাপূর্ণ ও ঘটনাবহুল করিয়া তুলিতে হইবে। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সমগ্রতা, সর্ব্বগ্রাহিতা এবং সচেষ্ট কর্ম্মপ্রবণতা প্রবিষ্ট না হইলে ভাষা নিজের সামর্থ্য প্রকটিত করিবার সুযোগ পায় না; সাহিত্যও নিজকে সর্ব্বত্র প্রসারিত করিয়া বিপুল ও বেগবান্ হইতে পারে না।

জাতীয় জীবনে বৈচিত্র্যের আবশ্যকতা

ভারতবর্ষের আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যগুলিকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে হইলে আমাদের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণের জীবন যাহাতে বিচিত্র কর্ত্তব্যময় এবং ঘটনাবহুল হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। বাঙ্গালাদেশ এবং মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব ও মাদ্রাজ যাহাতে পরস্পর পরস্পরকে বিশেষভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিনিতে পারে, তাহার আয়োজন

জীবনে বৈচিত্র্য-সৃষ্টির জন্য শিক্ষা-পদ্ধতির বহুমুখীনতা আবশ্যক

করিতে হইবে। এক প্রদেশের লোক অন্য প্রদেশে যাইয়া যাহাতে কর্ম্ম-ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে, তাহার সহায়তা করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাসমূহ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙ্গালা, মারহাটি ও তামিল অন্ততঃ এই তিনটী ভাষা যাহাতে ভারতবর্ষের সকল স্থানে উচ্চ শিক্ষার বিষয় হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপে আমাদের প্রত্যেক প্রদেশকে অন্যান্য প্রদেশের সহিত বিচিত্র উপায়ে কুটুম্বিতা স্থাপন করিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ করিতে হইবে। ভারতবাসীরা যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের সমাজে, বিদ্যায়, বাণিজ্যে এবং অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে কর্ম্মচারীর পদে নিয়োজিত হইয়া যাহাতে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা বিদেশেই জীবন যাপন করিতে পারেন, বিভিন্ন দেশে যাহাতে আমাদের প্রচারকেরা ভারতবর্ষের সমাজ, ধর্ম্ম ও সাহিত্য আলোচনা করিয়া শিক্ষিত জাতির সহানুভূতি আকৃষ্ট করিতে পারেন, এবং যাহাতে বিভিন্ন সভ্যজাতির রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সমাজের অবস্থা, সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, ব্যবসায় এবং ধর্ম্মজীবন আমাদের প্রদেশসমূহে সুবিস্তৃতরূপে আলোচিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ফরাসী ও জার্ম্মাণ অন্ততঃ এই দুইটী ইউরোপীয় ভাষা ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষাপদ্ধতিতে সুপ্রচলিত করিতে হইবে।

জাতীয়সাহিত্যে বৈচিত্র্যময় জীবনের প্রভাব

এইরূপে আমাদের চিন্তা ও কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হইলে, আমাদের ভাবনারাশি ক্রমশঃ বিচিত্র ও জটিল হইতে পারিবে। জীবনকে বৈচিত্র্যময় এবং কর্ম্মবহুল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে যে কেবল এক বিচিত্র সাহিত্যের উপাদানমাত্র সৃষ্ট হইবে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে এক অভিনব সাহিত্যই

গঠিত হইতে থাকিবে। বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়া এবং বহুবিধ রীতিনীতির পরিচয় পাইয়া আমাদের দেশবাসীরা স্বতই পরস্পরের মধ্যে তুলনা-সাধন, তারতম্য-অন্বেষণ ও সামঞ্জস্য-বিধানে চেষ্টিত হইতে থাকিবে। ইহার ফলে তুলনামূলক আলোচনা আরব্ধ হইয়া প্রকৃত সমালোচনাবিজ্ঞানের সৃষ্টি করিবে। ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি মানবীয় বিষয়গুলি ক্রমশঃ তুলনাসিদ্ধ বিজ্ঞানের আকার ধারণ করিবে। রাগ, দ্বেষ ও অন্ধবিশ্বাস-বর্জ্জন, চিন্তাপ্রণালীর নূতন পন্থা আবিষ্কার এবং যুক্তি, তর্ক প্রভৃতির ফলে এক প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুগের আরম্ভ হইবে। সাহিত্য নূতন গতিতে নূতন পথে ধাবিত হইতে থাকিবে। এতদ্ব্যতীত, বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে সখ্য স্থাপিত হইলে এবং পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে মিশ্রিত হইলে, আমরা অজ্ঞাতসারেই ভাবপ্রকাশের বিবিধ প্রণালী অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিব, ইহাতে শব্দসম্পদ বৃদ্ধি পাইয়া ভাষার সৌষ্ঠব সাধন করিবে। নানা শ্রেণীর নানা বিষয়ক পারিভাষিক শব্দ আসিয়া ভাষার অভাব মোচন করিবে। ভাষা নূতনরূপ ধারণ করিয়া বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি গূঢ় বিষয়গুলি অবাধে বহন করিতে পারিবে। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সাহিত্যের উৎকৃষ্ট ভাবগুলির সারাংশ সঙ্কলন এবং বিশিষ্ট গ্রন্থনিচয়ের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া স্বদেশবাসীদিগকে উপহার প্রদানের আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। ইহার ফলে সাহিত্যের কলেবর বর্দ্ধিত ও সুশ্রী হইতে থাকিবে।

নানা দেশে নানা যুগে মহাপুরুষেরা অভিনব জগতের বার্ত্তা লইয়া পৃথিবীতে যেরূপ নূতন অভাব সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, আমাদের দেশের বর্ত্তমান যুগে সাহিত্যক্ষেত্রে সেইরূপ আকাঙ্ক্ষা জাগরিত করিবার সময় আসিয়াছে। জীবনকে পরিপুষ্ট ও বৈচিত্র্যময় এবং সাহিত্যকে বিপুলবিস্তৃত করিয়া তুলিবার বাসনা-সৃষ্টির প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রয়োজন
(১) শিক্ষা ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে
আকাঙ্ক্ষা জাগরণ

উচ্চশিক্ষা, নিম্নশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি সর্ব্বত্র মহৎ অভাব উপলব্ধি করিয়া একমাত্র শিক্ষার জন্যই সমাজে এখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আন্দোলনের সময় উপস্থিত হইয়াছে। সাহিত্যপুষ্টি, শিক্ষাবিস্তার এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য বৃত্তিভুক্ প্রচারক ও ধুরন্ধর নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। বিজ্ঞানচর্চ্চা, ইতিহাসালোচনা, শিল্পবিস্তার প্রভৃতি কর্ম্মক্ষেত্রে উপযুক্ত, বিচক্ষণ অধ্যাপক ও শিক্ষাতত্ত্ববিদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া কতিপয় বিদ্যানুরাগী, কর্ম্মোপাসক ছাত্রদিগের দ্বারা বিশ্লেষণ, সমালোচনা, এক্‌সপেরিমেণ্ট, অনুবাদ প্রভৃতি কার্য্য সমাধা করিবার জন্য "এণ্ডাউমেণ্ট" বা ভূসম্পত্তিদানের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র য়্যাকাডেমী বা আলোচনা-সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছে।

(২)
অনন্যচিত্ত ও অনন্যকর্ম্মা সাহিত্য-সেবী

বাঙ্গলাদেশে যে সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাকে এই অভাবানুরূপ কার্য্যের উপযোগী করিবার জন্য কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে হইবে। এই জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে **সম্পূর্ণ শক্তি ও সম্পূর্ণ সময় প্রদান করিতে পারেন এরূপ সাহিত্যসেবী বিদ্বান্ ব্যক্তিকে উপযুক্ত মাসিক অর্থসাহায্য করিয়া তাঁহার সাহিত্যসাধনা সহজ ও নিরুদ্বেগ** করিয়া দিতে হইবে। যদি বাঙ্গলা-সাহিত্য সৌভাগ্যক্রমে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বৈজ্ঞানিক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং এই সম্মিলনের সভাপতি ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়গণের সমগ্র চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি আকৃষ্ট করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় এবং ইঁহাদের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে কতিপয় উচ্চশিক্ষিত, সাহিত্যানুরাগী যুবক নিশ্চিন্ত হইয়া

সমবেতভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে অগ্রসর হয়েন, তাহা হইলে দশ বৎসরের মধ্যেই বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থগুলি আমাদের জাতীয়সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে; প্লেটো, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, গীজো, হেগেল প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের গবেষণা আমাদের স্বকীয় ভাষার ভিতর দিয়াই লাভ করিতে পারি; এবং অল্পকালের মধ্যেই বাঙ্গলাদেশের শিক্ষাপদ্ধতি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন ও জাতীয় হইয়া উঠিতে পারে।

(৩)
আন্তরিক ভাবুকতা ও প্রকৃত বৈরাগ্য

আমাদের সমাজে এখন ভাবুকতার অভাব হইয়াছে। যে ভাবুকতায় লোকে বর্ত্তমান ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতের মহতী সিদ্ধি উপলব্ধি করিতে পারে, সামান্য আরম্ভের মধ্যে অন্তর্নিহিত সমগ্রতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহাতেই সম্পূর্ণ জীবন উৎসর্গ করিতে উৎসাহিত হয়; যে ভাবুকতায় অনুপ্রাণিত হইয়া বিদ্যাবান্ ব্যক্তি সমাজে কীর্ত্তি বা প্রতিষ্ঠা-লাভের অপেক্ষা না করিয়া বিদ্যাদান ও শিক্ষাবিস্তারেই আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন, স্বয়ং বিদ্যালাভের আকাঙ্ক্ষা খর্ব্ব করিয়া দশের জন্য শিক্ষালাভের সুবিধা সৃষ্টি করিতেই জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন; যে ভাবুকতায় ধনবান্ সমগ্র সমাজকে বিদ্যায়, ধনে, ধর্ম্মে উন্নীত করিবার নিমিত্ত স্বয়ং উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া জলদান, অন্নদান, ঔষধদান ও বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত রাখিয়া ঐশ্বর্য্যের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন; যে ভাবুকতায় ভগবান্ যাহাকে যে শক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী করিয়া জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি পরোপকারে এবং সকল প্রকার দারিদ্র্যমোচনে সেই শক্তির প্রয়োগকেই জীবনের ধর্ম্ম মনে করেন; সেইরূপ বৈরাগ্যপ্রসূতি ভাবুকতার বন্যা না আসিলে কোন দিন কোন সমাজে নূতন অবস্থার সংঘটন হয় না। যে ভাবুকতায় চিত্তের উন্মাদনা না হইয়া উৎপ্রেরণা হয়, যাহার ফলে শক্তি

বিক্ষিপ্ত না হইয়া সংহত ও সংক্ষিপ্ত হয়, যাহার বশে মানব গৃহত্যাগ করিয়া স্থির ও সংযতভাবে সমাজ ও সংসারের উন্নতিকামনা প্রচার করিতে সমর্থ হয়, আমাদের এখন সেইরূপ ভাবপ্রবণ বৈরাগী ও সন্ন্যাসীর প্রয়োজন হইয়াছে।

একথা মনে রাখিতে হইবে যে, স্বাধীন চিন্তার প্রবৃত্তিই হউক, অথবা ব্যবসায়ে লাভবান্ হইবার আশাই হউক, সাহিত্যচর্চ্চাই হউক অথবা শিক্ষাপ্রচারই হউক, কোন সমাজেই কখনও অতি সত্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। অন্য সকল বিষয়ের ন্যায় এই সকল বিষয়ও ক্রমে ক্রমে গণ্ডি বিস্তার করে। নূতন কোন দিকে চিন্তার গতি পরিবর্ত্তন করিতে সমধিক কষ্ট পাইতে হয়। নূতন পন্থার অনিশ্চয়তা ও সফলতার সংশয় সাধারণতঃ মনে ভয় সঞ্চার করে। দুই চারি জনের অকৃতকার্য্যতায় পরবর্ত্তী লোকেরা বিঘ্ন, ভ্রম প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সফলকাম হইতে পারিলে, ক্রমশঃ সমাজে নূতন চিন্তাপদ্ধতি ও কর্ম্মপ্রণালীর প্রতি বিশ্বাস জন্মে। তখন কৃতকার্য্য বক্তিদিগের পন্থানুসরণ করিয়া, তাঁহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া দলে দলে লোক আসিয়া চিন্তা ও কর্ম্মের কেন্দ্র পূর্ণ করিয়া তোলে। তাহার পরে এই নূতন প্রবৃত্তি লোকের চরিত্রগত এবং মজ্জাগত হইয়া বংশগত ভাবে সমাজের লক্ষণ হইয়া পড়ে।

(৪)
ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যবোধ ও সাধনা

সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত সাহিত্যালোচনা, বিজ্ঞানচর্চ্চা অথবা শিক্ষাপ্রচার সফলতার অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত না হয়; যতদিন পর্য্যন্ত এই সমুদয় কার্য্যে যোগদানের ফলে নিজের স্বার্থ, নিজের গৌরব, নিজ পরিবারের উপকার বিশেষভাবে সাধিত না হয়; যতদিন পর্য্যন্ত লোকে এই সকল পন্থা অবলম্বন করিয়া লাভবান্ না হয়; ততদিন পর্য্যন্ত

অকৃতকার্য্যতা সহ্য করিয়া, ক্ষতি স্বীকার করিয়া অগ্রগামী কর্ম্মীদিগকে ভবিষ্যতের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য একাকী নীরবে তপস্যা করিতে হইবে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

মালদহ-জাতীয়শিক্ষাসমিতির
সাহিত্যালোচনা বিভাগের
বিজ্ঞাপনী

—:০:—

মালদহ-জাতীয়শিক্ষাসমিতি বঙ্গদেশস্থ জাতীয়শিক্ষাপরিষদের নিয়মানুসারে শিক্ষাবিস্তারের জন্য ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মালদহ-জাতীয়শিক্ষাসমিতির উদ্দেশ্য—

ক। বিবিধ উপায়ে সমাজে শিক্ষা বিস্তার করা,—

(১) নিম্নশিক্ষাকে যথা সম্ভব অবৈতনিক করা,—

(২) স্থানে স্থানে নৈশ-বিদ্যালয় পুস্তাকাগার, লাইব্রেরী, গ্রন্থশালা প্রভৃতি স্থাপন করা,

(৩) বালিকাদিগের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা,

(৪) সাহিত্য, বিজ্ঞান, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ, পত্রিকা বা পুস্তকাদি প্রকাশ করা, এবং

(৫) শিক্ষাসম্বন্ধী বিষয়ে প্রবন্ধপ্রতিযোগিতার দ্বারা সাধারণকে উৎসাহিত করিয়া বিদ্যাচর্চ্চা ও জ্ঞানানুশীলন বিস্তৃত করা।

খ। শিক্ষকদিগের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা, এবং এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা—

(১) ইহাঁদিগকে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত বা সুধীমণ্ডলী-প্রভৃতি বিদ্যার জীবন্ত উৎস ও কেন্দ্রস্থলে প্রেরণ,

(২) ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কার্য্যের জন্য উপযুক্ত ধুরন্ধরগণের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ,

(৩) বিভিন্ন স্থানের বিদ্যালয়াদির শিক্ষাপ্রণালী ও কার্য্যনির্ব্বাহ প্রভৃতি পরিদর্শনের দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভের ব্যবস্থা,

(৪) বিদ্যালয়ের পুস্তকাগার ও বিজ্ঞানালয়ে উন্নতি সাধন করিয়া স্বক্ষেত্রে উন্নত চিন্তা ও গবেষণার সহায়তাবিধান, এবং

(৫) দেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিত ব্যক্তিগণের শুভাগমনের বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাদের উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ।

গ। শিক্ষকদিগের দ্বারা নিজ নিজ আলোচ্য বিষয়ে মাতৃভাষায় পুস্তক রচনা করাইয়া অধ্যাপনাকার্য্যের সুবিধান এবং জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করা।

ঘ। অভিভাবক ও শিক্ষকদিগের তত্ত্বাবধানে বিদ্যাদান, শিক্ষাবিস্তার, পরোপকার ও লোকহিতবিধায়ক বিবিধ সৎকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া শিক্ষার্থিগণের প্রকৃত নৈতিক চরিত্রগঠন ও মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়তা করা।

উপরি উদ্ধৃত বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে জেলার মধ্যে বিদ্যালয়াদি প্রতিষ্ঠা দ্বারা শিক্ষাপ্রদানের সঙ্গে সঙ্গে এই সমিতি সাহিত্যালোচনা, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধান এবং প্রাচীন মূর্ত্তি, মুদ্রা, তাম্রশাসন, শিল্পের নিদর্শন ও হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এজন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহার উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে—

(১) আমাদের দেশের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, প্রভৃতির উদ্ধার ও উন্নতির জন্য বিশেষ বিশেষ ছাত্র নিযুক্ত করিয়া অর্থসাহায্য দ্বারা স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিকত্বায় উৎসাহ প্রদান করা, এবং

(২) মালদহ জেলার বিশেষ ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া তাহার গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করা—গম্ভীরার গান, বিষহরির

গান, প্রাচীন পদ ও কবিতাপ্রভৃতি স্থানীয় লোকসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করা।

স্মুতরাং মালদহ-জাতীয়শিক্ষাসমিতিকে একদিক হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের মালদহস্থ শাখাসমিতিরূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

সাহিত্যালোচনা বিভাগ

১৯১১ সালের জানুয়ারী মাসে ইহার অধীনে সাহিত্যালোচনা বিভাগ নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই সমিতির বিশেষ সভ্য রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—

৺রাধেশচন্দ্র শেঠ বি. এল্. (মৃত্যু পর্য্যন্ত সভ্য ছিলেন)
শ্রীআদিত্য নাথ মৈত্র, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্.এ., বি.এল্.
শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীকুমুদনাথ লাহিড়া
শ্রীহরিদাস পালিত শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু বি. এ.
শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম্. এ.
শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্. এ.

রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার

শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ বি. এল্.
(সম্পাদক)

মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির সাহিত্যালোচনাবিষয়ক প্রথম পাঁচ বৎসরের সম্পন্ন কার্য্য (১৯০৭ জুন—১৯১২ ফেব্রুয়ারি)—

(১) স্থানীয় গম্ভীরা উৎসবোপলক্ষে রচিত গীতের জন্য মুকদুমপুর "বোলবাই সম্প্রদায়কে" একটি রৌপ্য পদক প্রদত্ত হইয়াছে (১৯০৯ সাল)

(২) গম্ভীরার বিবরণ ও ইতিহাস সঙ্কলনের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল। তাহার ফলে "আদ্যের গম্ভীরা" নামক একটি প্রবন্ধ পাওয়া যায়। সেই প্রবন্ধ বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া তাঁহাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩) প্রায় ১০০০ প্রাচীন হস্তলিখিত বাঙ্গালা পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ভাগলপুর সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত হইয়াছিল (১৯০৯)। কোন কোন পুঁথি অবলম্বন করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ 'সাহিত্য', 'আর্য্যাবর্ত্ত', 'বাণী' ও 'সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায়' প্রকাশিত হইয়াছে।

(৪) ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সম্পাদক কর্ত্তৃক ভাগলপুর-সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত হইয়া মুদ্রিতাকারে বিতরিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ 'সাহিত্য' পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সাহিত্য-সম্মিলনের বিবরণীতে মুদ্রিত হইয়াছে।

(৫) সম্প্রতি আমেরিকার হার্ভার্ড (Harvard) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সরকার প্রণীত কয়েকটি প্রবন্ধ 'ঐতিহাসিক চিত্র', 'সুপ্রভাত' এবং 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

(৬) বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি. এ., বি. এস্. সি., বিদ্যাভূষণ রচিত The Economic Botany of India নামক ইংরাজী গ্রন্থ প্রকাশিত করা হইয়াছে। প্রায় ২০০০ কাপি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট বিদ্বান্ ও ধনবান্ ব্যক্তিগণকে উপহার প্রদত্ত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের ভূমিকা এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত "ভারতীয় ষষ্ঠ শিল্প-সম্মিলনে" পঠিত হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের মুদ্রিত বার্ষিক বিবরণীতে

প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা Modern Review পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

(৭) মালদহ-আদর্শজাতীয়বিদ্যালয়ের শিক্ষক (সম্প্রতি আমেরিকার উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র) শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাস-গুপ্ত-লিখিত "প্রাচীন গ্রীসে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানচর্চ্চা" নামক একটি প্রবন্ধ "ঐতিহাসিক চিত্র" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

(৮) সানিহাটী (ঢাকা) জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক (সম্প্রতি আমেরিকার উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী লিখিত "মালদহের ভৌগোলিক বিবরণ" নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা মালদহের বিভিন্ন জাতীয় বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইতেছে।

(৯) উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের মালদহ-অধিবেশনের কার্য্য নির্ব্বাহকল্পে মালদহ-জাতীয়শিক্ষাসমিতির সভ্য, শিক্ষক এবং ছাত্রগণকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই সম্মিলনের বিবরণ প্রকাশের ভার ইঁহাদেরই হস্তে রহিয়াছে।

এতদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত গম্ভীরা উৎসবে বহরমপুরের ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন্স জজ কবিবর শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র এম্. এ., সি. এস্. মহাশয়ের প্রশংসাপ্রাপ্ত গীতরচনাকারীকে একটি রৌপ্য পদক প্রদত্ত হইয়াছিল।

(১০) শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লিখিত "অন্নসংস্থান" নামক একটি প্রবন্ধ ময়মনসিংহসাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত এবং বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তিকা স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইয়াছে।

(১১) শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাঙ্গালা গ্রন্থ "অর্থকরী উদ্ভিদ বিদ্যার" ভূমিকা ময়মনসিংহসাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত হইয়াছিল।

(১২) শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার প্রণীত "The Hindu University—what it means" নামক হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়-বিষয়ক প্রবন্ধ "The Collegian" নামক শিক্ষাবিষয়ক ইংরাজী মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়া স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে বিতরিত হইয়াছে।

(১৩) ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক কার্য্যে প্রকৃত অনুসন্ধিৎসা এবং অনুরাগ সৃষ্টি করিবার জন্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবিগণের তত্ত্বাবধানে কতিপয় ছাত্রকে শিক্ষিত করা হইতেছে।

(১৪) শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় লিখিত "আদ্যের গম্ভীরা" নামক সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত এবং প্রায় চতুর্গুণিত আকারে স্বতন্ত্র গ্রন্থভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে বঙ্গদেশের ধর্ম্ম ও সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ প্রদত্ত হইয়াছে। নিম্নে এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ সূচী প্রদত্ত হইল—

প্রথম খণ্ড

গম্ভীরার বিবরণ

প্রথম বিভাগ

আধুনিক গম্ভীরা

প্রথম অধ্যায়—গম্ভীরা শব্দের ব্যুৎপত্তি

দ্বিতীয় অধ্যায়—গম্ভীরোৎসবের কেন্দ্রসমূহ

তৃতীয় অধ্যায়—মালদহের গম্ভীরা

প্রথম পরিচ্ছেদ—পরিচালনা ও শাসন পদ্ধতি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—গম্ভীরা উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—গম্ভীরার নৃত্য গীতাদির বিবরণ

চতুর্থ অধ্যায়—বাঙ্গালদের গম্ভীরা
পঞ্চম অধ্যায়—বর্ত্তমান রাঢ়ীয় গম্ভীরা
ষষ্ঠ অধ্যায়—শিবের গাজন
সপ্তম অধ্যায়—ধর্ম্মের গাজন
অষ্টম অধ্যায়—উৎকলীয় গম্ভীরা
নবম অধ্যায়—উপসংহার
গম্ভীরা জেলাগত বা ব্যক্তিগত নহে
গম্ভীরায় সামাজিকতা
" ধর্ম্ম
" সাহিত্য
" কলাবিদ্যা

দ্বিতীয় বিভাগ

প্রাচীন সাহিত্যে গম্ভীরার পরিচয়

প্রথম অধ্যায়—গাজনের প্রাচীনত্ব
প্রথম পরিচ্ছেদ—বৈদিক সাহিত্যে গম্ভীরা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—মহাভারতে "
তৃতীয় পরিচ্ছেদ—চীনদেশীয় পর্য্যটকগণের বিবরণে "
চতুর্থ পরিচ্ছেদে—রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে "
পঞ্চম পরিচ্ছেদ—ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি নামক পুঁথিতে "
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—বৈষ্ণব সাহিত্যে "
সপ্তম পরিচ্ছেদ—মঙ্গলচণ্ডীতে "
অষ্টম পরিচ্ছেদ—মনসার গীতে "
নবম পরিচ্ছেদ—ধর্ম্মমঙ্গলে "
দশম পরিচ্ছেদ—সিংহলী সাহিত্যে "
একাদশ পরিচ্ছেদ—তিব্বতী সাহিত্যে "

দ্বিতীয় অধ্যায়—গাজনের শাস্ত্রীয় প্রমাণ

প্রথম পরিচ্ছেদ—শিবপুরাণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—হরিবংশ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—ধর্ম্মসংহিতা

তৃতীয় অধ্যায়—উপসংহার

১। অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান

২। গম্ভীরার বিবিধ অঙ্গের সহিত হিন্দু সমাজ বহুকাল হইতে পরিচিত।

দ্বিতীয় খণ্ড

গাম্ভীরার ধারাবাহিক ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়—আলোচনা পদ্ধতি

দ্বিতীয় অধ্যায়—বৌদ্ধ প্রচারের পূর্ব্বপর্য্যন্ত হিন্দুসমাজের প্রথম অবস্থা —গম্ভীরা পূজার কয়েকটি উপকরণ

তৃতীয় অধ্যায়—বৌদ্ধ প্রভাব কাল—গম্ভীরা উৎসবের অঙ্কুর

প্রথম পরিচ্ছেদ—হীনযান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জৈন উৎসব

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—মহাযান

চতুর্থ অধ্যায়—বিক্রমাদিত্যের যুগ—বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতি—গম্ভীরার ক্রমবিকাশ

পঞ্চম অধ্যায়—ধর্ম্মসমন্বয়ের যুগ, তান্ত্রিকতার প্রাদুর্ভাব—গম্ভীরার ক্রমবিকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ—বৰ্দ্ধন রাজগণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—উৎসব বর্ণনা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—বৌদ্ধ তান্ত্রিক প্রভাব কাল

ষষ্ঠ অধ্যায়—বাঙ্গলার পালরাজগণ—গম্ভীরার আধুনিক রূপগ্রহণ

প্রথম পরিচ্ছেদ—বৌদ্ধধর্ম্মের অবসান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—বাঙ্গালায় শৈব ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—শৈব ধর্ম্মের ইতিহাস

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—পরবর্ত্তী পালরাজগণ ও রামাই পণ্ডিত—আধুনিক গম্ভীরা

সপ্তম অধ্যায়—সেনবংশ—আধুনিক সমাজ প্রতিষ্ঠা

অষ্টম অধ্যায়—উপসংহার

প্রথম পরিচ্ছেদ—প্রত্যেক যুগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—গম্ভীরার বিভিন্ন অঙ্গের ইতিহাস

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—আধুনিক হিন্দুত্বের ক্রমবিকাশ

(১৫) মালদহ জেলার বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ পল্লীতে ভ্রমণ, অনুসন্ধান এবং কাহিনীসংগ্রহ করা হইয়াছে। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের মালদহ-অধিবেশনে নিমন্ত্রিত সভ্যগণকে গৌড় ও পাণ্ডুয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাহাতে ৺রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়কে বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করিবার জন্য মালদহ-জাতীয়শিক্ষা-সমিতির কর্ম্ম করিতে হইয়াছিল।

"গৌড়-পাণ্ডুয়া প্রদর্শক" নামক একখানি গ্রন্থ শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়-কর্ত্তৃক এই জন্য লিখিত হইয়াছিল। তাহা মুদ্রিত হইতেছে।

(১৬) শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত লিখিত প্রবন্ধগুলি এই কয় বৎসরের মধ্যে নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে; এই সমুদয়ের

মধ্যে কোন কোনটি তাঁহার প্রণীত "মালদহের পল্লী-কথা" নামক গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায়—

১। গৌড়ীয় নৌশিল্প—সাহিত্য, ভাদ্র, ১৩১৭

২। গৌড়ীয় এনামেল ইষ্টক—ঐতিহাসিক চিত্র—

৩। আদ্যের গম্ভীরা—সাহিত্যপরিষৎপত্রিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩১৬

৪। গৌড়ীয় মঙ্গলচণ্ডীতে বৌদ্ধ ভাব—„ ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৭

৫। মালদহের পল্লীভাষা—„ ৩য় সংখ্যা, ১৩১৮

৬। পালনগরী রামাবতী—আর্য্যাবর্ত্ত, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ, ১৩১৮

৭। মালদহে রূপ-সনাতন—বাণী, শ্রাবণ, ভাদ্র, ১৩১৭

(১৭) পরলোকগত রাধেশচন্দ্র শেঠের জীবনী শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন। গ্রন্থ এবং ভূমিকা দুইই সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে (৩১শে ভাদ্র ১৩১৮) পঠিত হইয়াছিল। ভূমিকা 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

(১৮) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর ও রাধাকুমুদ, ঐতিহাসিক রাধেশচন্দ্র ও হরিদাস, সাহিত্যসমালোচক কুমুদনাথ প্রভৃতি কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণের পূর্ব্বপ্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়া 'অনুসন্ধান' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েকটি প্রবন্ধের নাম—

১। ভারতীয় নাস্তিক দর্শনের ইতিবৃত্ত (বঙ্গদর্শন)

২। ঈশ্বরবাদে পূর্ব্বমীমাংসা

৩। প্রাচীন গ্রীসে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানচর্চ্চা (ঐতিহাসিক চিত্র)

৪। কপাল কুণ্ডলার উদ্দেশ্য (নব্যভারত)

৫। মালদহের শিল্প-ইতিহাসের উপাদান (উত্তর বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের বগুড়া অধিবেশনে পঠিত)

৬। কার্য্যকরী শিক্ষা (ভারতী)

৭। গৌড়ীয় নৌশিল্প (সাহিত্য)

যন্ত্রস্থ গ্রন্থের তালিকা

(১) শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম. এ. লিখিত 'জগৎকথা'।

(২) শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি. এ., বি. এস্-সি. লিখিত 'অর্থকরী উদ্ভিদবিদ্যা'।

(৩) শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্. এ. লিখিত গ্রন্থদ্বয় বিলাতে Longmans Green and Co. কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইতেছে—

(ক) Educational Institutions in Ancient India.

(খ) The Fundamental Geographical Unity of India.

(৪) ৺রাধেশচন্দ্র শেঠ বি. এল.—ঐতিহাসিক প্রবন্ধ।

(৫) শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী—

(ক) শতপথ ব্রাহ্মণ—তৃতীয়ভাগ (প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক দিঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎ-কুমার রায় মহোদয়ের ব্যয়ে প্রকাশিত হইয়াছে)

(খ) মিলিন্দ পঞ্‌হ—দ্বিতীয় ভাগ (প্রথম ভাগ কলিকাতার শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহোদয়ের ব্যয়ে মুদ্রিত ও সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত)।

নূতন আরব্ধ কার্য্য—প্রত্যেক বিভাগের জন্য অধ্যাপক ও ছাত্র নিযুক্ত আছেন।

১। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের সম্পূর্ণতর ইতিহাস-প্রণয়নোপযোগী উপকরণ সংগ্রহ

(ক) মালদহে প্রাপ্ত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ

(খ) এই সমুদয় অবলম্বনের দ্বারা মালদহী বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন।

২। English Men of Letters Series এর অনুরূপ বাঙ্গালী সাহিত্যবীরগণের জীবনী প্রকাশ। এই বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীকে Bengalee Men of Letters Series বলা যাইতে পারে।

৩। প্রাচীন-হিন্দুসাহিত্য-প্রচার

(ক) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন। বাঙ্গালা ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিত হইতেছে। ইংরাজী ভাষায় লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থের সার এই পুস্তকে সঙ্কলিত হইবে। এতদ্ব্যতীত, অনেক নূতন হিন্দু সাহিত্য-গ্রন্থের বিবরণ থাকিবে। যাহাতে প্রাচীন ভারতের সাধারণ জীবনপ্রবাহের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ পরিস্ফুট হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই গ্রন্থের আলোচনা-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে।

(খ) প্রাচীন ভারতের সাহিত্যরথিগণ যে যে গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন সেই সমুদয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সমালোচনা এবং গ্রন্থকারগণের জীবনী অবলম্বন করিয়া এক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করা হইতেছে। ইহাতে গ্রন্থকারের জীবন বৃত্তান্ত, প্রত্যেক গ্রন্থের সারমর্ম্ম, এবং তাঁহার দোষগুণের আলোচনা থাকিবে। এই গ্রন্থাবলী Ancient Classics for English Readers নামক ইংরাজী গ্রন্থাবলীর অনুকরণে আরব্ধ হইয়াছে। এই বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীকে Hindu Classics for Bengalee Readers বলা যাইতে পারে।

৪। পাশ্চাত্য সাহিত্যে সমালোচনাবিষয়ক গ্রন্থাদির সারমর্ম্ম বাঙ্গালী পাঠকগণের উপযোগী করিয়া বঙ্গভাষায় প্রকাশ। সম্প্রতি Dowden প্রণীত Studies in Literature গ্রন্থের বাঙ্গালা সংস্করণের প্রয়াস চলিতেছে।

৫। বাঙ্গালা ভাষায় ভারতীয় নৌ-শিল্প ও সমুদ্র-বাণিজ্যের ইতিহাস সঙ্কলন।

৬। "আদ্যের গম্ভীরা" গ্রন্থ অবলম্বনে The Socio-Religious History of Bengal নামক ইংরাজী গ্রন্থ প্রকাশ।

৭। উত্তরবঙ্গসাহিত্য সম্মিলন হইতে ভার প্রাপ্ত হইয়া মালদহের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীর

গ্রন্থাবলী

১। শতপথ ব্রাহ্মণ—প্রথম খণ্ড ৩৲, দ্বিতীয় খণ্ড ২॥০

২। উপনিষৎসংগ্রহ—প্রথম খণ্ড ।০, দ্বিতীয় খণ্ড ।৵০

৩। পালিপ্রকাশ—২৸৹, বাঁধান ৩৲

৪। মিলিন্দপ্রশ্ন—প্রথম খণ্ড ১॥০, দ্বিতীয় খণ্ড ৸০ (যন্ত্রস্থ)

৫। বিবাহমঙ্গল—প্রথম ভাগ, ।৵০

BOOKS ALREADY PUBLISHED.

"THE SACRED BOOKS

OF THE

HINDUS"

Vol. I.—Upanisads—The Isa, Kena, Katha, Prasna, Mundaka, and Manduka Upanisads with Madhva's commentary translated into English, with copious explanatory notes by Srish Chandra Vasu. Cloth bound, silver letters, Second Edition Price Rs. 5.

Vol. II.—Yajnavalkaya Smriti with the commentary Mitaksara and notes from the gloss, Balambhatti, translated into English with copious explanatory notes by Srish Chandra Vasu. This work is indispensable to Indian lawyers of those parts of India where Hindu Law, according to the Mitaksara School is administered.

Part I.—Mitaksara with Balambhatti, two Chapters.

Price—One Rupee and eight annas. Ditto Sanskrit Text Rs. 2.

Vol. III.—The Chhandogya Upanisad with Madhva's Bhasya, translated into English with copious explanatory notes by Srish Chandra Vasu. Cloth bound, gilt letters, Price Rs. 11.

Vol. IV.—Aphorism of Yoga by Patanjali, with the commentary of Vyasa and the gloss of Vachaspati Misra: by Rama Prasad, M.A., cloth bound, silver letters—Rs. 5.

Vol. V.—The Vedanta Sutras with Baladeva's Commentary translated into English with copious explanatory notes by Srish Chandra Vasu. Parts 1 to 6 Price Rs. 9.

Vol. VI.—The Vaisesika Sutras of Kanada with the Commentary of Sankara Misra and extracts from the gloss of Jayanarayana. Translated by Nanda Lal Sinha, M.A., B.L. Price Rs. 7.

Vol. VII.—The Vakti Sutras of Narada and Sandilya parts 1 and 2. Translated into English. Price Rs. 3.

Vol. VIII.—The Nyaya Sutras of Gotama, translated into English. Part I, Price Re. 1-8.

Vol. IX.—The Garuda Purana translated into English Cloth, Silver letters. Price Rs. 3-8.

Vol. X.—The Mimamsa Sutras of Jaimini, translated into English with an original commentary, by Mahamahopadhyaya Dr. Ganga Nath Jha, M.A., D. Litt. Parts 1 and 2. Price Rs. 3.

N. B.—All these publications have been very favorably spoken of by the press and competent Sanskrit Scholars of India and Europe.

"THE INDIAN MEDICINAL PLANTS"

BY

1. **Lieutenant Colonel K. R. KIRTIKAR** F.L.S., I.M.S., (*Retired*)
2. **Major B. D. BASU** I.M.S., (*Retired.*)
3. **BHIM CHANDRA CHATTERJI.**
4. **AN I. C. S.**

A systematic study, along modern scientific lines, of the most important medicinal plants of India, specially those mentioned in the original Sanskrit works of Ancient Hindu sages, and also of several useful plants hitherto unstudied by Scholars, Indian or European.

A contribution to the world's Botanical and scientific Literature.

It combines **Pharmaceutical and Industrial with General Botany** and thus furnishes information neglected in the works of **the existing Botanical Research Societies.**